অপরাধ বিজ্ঞান

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

অপরাধ-বিজ্ঞান

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল এম, এস,-সি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

ছয় টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ—১৩৬৬

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠভ্রাত

৺কালিসদয় ঘোষাল

রায়সাহেব, মহোদয়কে

শ্রদ্ধার সহিত

—পঞ্চানন

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

অন্যান্য বই

অপরাধ-বিজ্ঞান	১ম খণ্ড	৬৲
ঐ	২য় খণ্ড	৪৲
ঐ	৩য় খণ্ড	৪৲
ঐ	৪র্থ খণ্ড	৪৲
ঐ	৬ষ্ঠ খণ্ড	৪৲
ঐ	৭ম খণ্ড	৪৲
ঐ	৮ম খণ্ড	৪৲
দুই পক্ষ	(উপন্যাস)	২·৫০
মুণ্ডহীন দেহ		৩৲
অন্ধকারের দেশে		৩·৫০

অপরাধ-বিজ্ঞান

পঞ্চম খণ্ড

অপরাধ—অশ্লীলতা

কোনও এক মামলার বিচারের পর রায় দান কালে কলিকাতার ফৌজদারী আদালতের কোনও এক প্রাক্তন প্রধানতম বিচারপতি মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, "প্রস্টিটিউসন্ অব্ পেন ইজ্ ওয়ার্স্ট দ্যান দি প্রস্টিটিউসন্ অব্ বডি" অর্থাৎ কি'না "দেহের বেশ্যাবৃত্তি অপেক্ষা কলমের বেশ্যাবৃত্তি অধিকতর জঘন্য।" কথাটী অতীব সত্য। "কলম তরবারি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী" প্রবাদটী সর্ব্বজনবিদিত। সাহিত্যের শক্তি যে অসামান্য তা' জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেছেন। সাহিত্য ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। সৎ সাহিত্য সমাজকে সৎ এবং অসৎ সাহিত্য সমগ্র ভাবে উহাকে অসৎ করে দিতে সক্ষম—এই সত্যটী আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। বস্তুতঃপক্ষে সাহিত্য, চলচ্চিত্র, কথকতা প্রভৃতি বাক্-প্রয়োগ (Suggestion) দ্বারা মনুষ্য চরিত্র গঠন করে। এই কারণে রাজসরকার নাগরিকদের কলম তথা লিখন-শক্তিকে সংযত রাখবার জন্য আইন প্রণয়ন করেছেন। এই লিখন-শক্তি কখনও মানুষের স্থূল বৃত্তিসমূহ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত হবে না। উহা

যাতে মানুষের স্থূল বৃত্তিসমূহ উদ্বেলিত করবার জন্য ব্যবহৃত না হয় তা' সভ্য মানুষ মাত্রেরই দেখা উচিত।

যাহা কিছু মুখে বলা যায় তা'র সবটুকুই লেখা যায় না। তার কারণ, মুখে আমরা যা বলি তা' সমান ভাবে সকল মানুষের সম্মুখে বলতে পারি না। এক স্তরের মানুষের নিকট যা বলা যায় তা অন্য স্তরের মানুষের নিকট বলা সম্ভব হয় না। বন্ধুবান্ধবদের সহিত যেরূপ ভাষায় আমরা আলোচনা করি—সেরূপ ভাষায় অপরিচিত ব্যক্তি, গুরুজনবর্গ এবং ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত আলোচনা করি না। এমন কি, আমরা এক শ্রেণীর বন্ধুবান্ধবদের সহিত যে ভাষায় কথা বলি, অপর আর এক শ্রেণীর বন্ধুবান্ধবদের সহিত সেইরূপ ভাষায় কথোপকথন করতে দ্বিধা বোধ করি। কিন্তু আমরা কথা-সাহিত্য রচনা করি পৃথিবীর সর্ব্ব যুগের মানুষদের পঠনের জন্য। এজন্য যা কিছু মুখে বলা যায় তা' কলমের মুখে লেখা উচিত নয়, এমন কি ব্যক্তিগত পত্রাদির মধ্যেও আমাদের সংযত ভাবে আলাপ আলোচনা * করা উচিত।

তবে নীতিবাগীশ ব্যক্তিদের অশ্লীলতা, বৈজ্ঞানিক অশ্লীলতা রূপে সকল ক্ষেত্রে বিবেচিত হয় না। অশ্লীলতার রূপ যুগে যুগে মানুষের রুচি অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এই সত্য প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য তুলনামূলক ভাবে পাঠ করলে সম্যকরূপে বুঝা যাবে। তবে এই প্রাচীন সাহিত্যের সবগুলিই যে অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট ছিল তা নয়। ঐ যুগের বহু সাহিত্য উৎসাহ সহকারে এ যুগেও পঠিত হয়। কারণ ঐগুলি সর্ব্বজন-পাঠ্যরূপে রচিত হয়েছিল, কিন্তু ঐ যুগে এমন সব সাহিত্যও রচিত হয়েছিল যেগুলি কেবল মাত্র প্রৌঢ়

* আমার মতে স্বামী-স্ত্রীর চিঠি-পত্রাদিও সর্ব্বজন-পাঠ্য রূপে লিখিত হওয়া ভালো।

এবং বৃদ্ধদের সভাতে আবৃত্তি করার রীতি ছিল।—ঐ সকল সভা বা জল্সায় যুবক এবং নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল; এমন কি, কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ বা গুরুজন ব্যক্তি ঐ স্থলে উপস্থিত থাক্‌লে বহু প্রৌঢ় ব্যক্তিও ঐ সভায় প্রবেশ করতে পারতেন না। বার্দ্ধক্যের কারণে ঐরূপ বিকৃত উপায়ে যৌন-তৃপ্তি লাভ করবার জন্যই হয়তো ঐ সকল জল্সা, সভা বা আসরে বৃদ্ধদেরই সমাগম হ'ত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহু সেকেলে তর্জ্জা-গানের কথা বলা যেতে পারে। অনেক সাহেব-সুবোও ঐ সময় ঐ তর্জ্জা-গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কলিকাতা নগরীতে ঐ যুগে এণ্টনী সাহেব এবং ভোলা ময়রা তর্জ্জার লড়াইতে বিশেষরূপে নাম করেছিলেন। কোন তর্জ্জার আসরে এণ্টনী সাহেব হিন্দু-শাস্ত্র হ'তে দেবাদিদেব মহাদেব সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য উদ্ধৃত ক'রে ভোলা ময়রাকে ঐ সকল বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন কবিতায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যদি ভোলানাথ (মহাদেব) হও, তা'হলে এই সকল প্রশ্নের যথারীতি উত্তর দাও দেখি!" ভোলা ময়রার সংস্কৃত শাস্ত্র-জ্ঞান তো ছিলই না, এমন কি বাংলা লেখাপড়াও তিনি কম জানতেন। বিপদে প'ড়ে তিনি নিম্নোক্তরূপ অশ্লীল বাক্যযুক্ত কবিতায় তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। অশ্লীলতা বিধায় এই কবিতার কয়েকটি বাক্য ইচ্ছা পূর্ব্বক বাদ দেওয়া হয়েছে।

"ওরে—

আমি সে ভোলানাথ নই।
যদি সে ভোলানাথ হই,
তবে ভোলার······পূজে সবাই।
আমার······পূজে ক'ই।"

কবিতাটী শিবলিঙ্গের সহিত তুলনা ক'রে লিখিত। কিন্তু অশ্লীলতা-

দোষে দুষ্ট থাকায় এই ধরণের গান বা কবিতার সৎ সাহিত্যে স্থান হয় নি।

অশ্লীলতার সহিত রুচি-দোষ-অপরাধের প্রভেদ আছে। রুচি-দোষ-অপরাধ অশ্লীলতা-অপরাধের ন্যায় অসহনীয় নয়। এজন্য কাদেরও মধ্যে রুচি-দোষ দেখলে আমরা তাদের নিন্দা করি। কিন্তু এজন্য তাদের আমরা কোনওরূপ শাস্তি বিধান করি না। পূর্ব্বকালীন কোনও কোনও সাহিত্যের মধ্যে আমরা রুচি-দোষের আধিক্য দেখি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "স্বর্পনখা দুস্ব ড়াঁড়ী, ভাত খেতো হাঁড়ী হাঁড়ী" এইরূপ বাক্য সমষ্টির কথা বলা যেতে পারে। কোনও এক স্থূলকায় কথক-ঠাকুরকে সভাস্থলে প্রবেশ করতে দেখে ঐ স্থানে উপস্থিত অপর এক জন এক-চক্ষুহীন কথক-ঠাকুর বলে উঠেছিলেন, "আসুন পাঁচ পনে ঠাকুর।" স্থূলকায় কথক-ঠাকুর একবার তাঁর অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্ষুর দিকে ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টিপাত ক'রে চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন, "থামরে বেটা এক চোখো।" এরপর এই শটকে পুনকে প্রভৃতি নামতার সাহায্যে উভয়ের মধ্যে সুরু হয় এক অপূর্ব্ব তর্জ্জার লড়াই, কিন্তু এর মধ্যে বাপান্ত চোদ্দপুরুষান্ত প্রভৃতি এতো বেশী করা হয়েছিল যে ঐ অপূর্ব্ব কথা সমষ্টিও রুচি-দোষের কারণে কথা-সাহিত্যের মধ্যে স্থায়ী স্থান করে নিতে পারে নি।

এইরূপ রুচি-দোষের কারণে এই যুগেরও বহু কথা সমষ্টি সাহিত্যে স্থায়ী স্থান করে নিতে অপারক হয়েছে। এ সম্বন্ধে তরুণ সাহিত্যিক মাত্রেরই অবহিত হওয়া উচিত।

অশ্লীলতা এবং রুচি-দোষের প্রভেদ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। এবার কোন্‌টী অশ্লীলতা এবং কোন্‌টী বা তা নয়, সে সম্বন্ধে বলা যাক্।

অপরাধমাত্রেরই মধ্যে একটা অসৎ উদ্দেশ্য থাকা চাই। অর্থাৎ যে অপকার্য্যটী অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয়, তা'কেই আইনতঃ আমরা

বলি, অপরাধ। এই উদ্দেশ্য বা 'মোটিভ্' প্রমাণ করতে না পারলে কোনও অপরাধই আদালতে প্রমাণিত হয় না।

যদি কেহ বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে যৌন সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ দেন, তা'হলে তাঁর সেই কার্য্যকে অপকার্য্য বলা হবে না, কারণ তিনি বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি তথা সমাজের উপকারের জন্য এরূপ আলোচনা করেছেন। কিন্তু অপর দিকে যদি কেহ অপরিণীত বালক-বালিকা বা যুবক-যুবতীদের সহজাত যৌন-বৃত্তি উদ্বেলিত করবার উদ্দেশ্যে অশ্লীল পুস্তকাদি রচনা করেন তা'হলে তাঁর ঐ কার্য্যকে আমরা অপকার্য্য বা অপরাধ বলে অভিহিত করবো। কিন্তু এমন লোকও আছেন যাঁরা বিজ্ঞানের নামে অশ্লীলতা প্রচার করতে প্রয়াস পেয়েছেন। আমি কোনও একটী যৌনজ-দুর্ব্বৃত্তকে বলতে শুনেছিলাম, "আমি একটীর পর একটী কন্যার সহিত প্রেমাভিনয় করেছি, এ কথা সত্য; কিন্তু তা' আমি করেছি আত্ম-তৃপ্তির জন্য নয়, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি তথা জগতের কল্যাণের জন্য, কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল, নারীর দুর্জ্ঞেয় মন, যা নারীরা নিজেরাই অবহিত নয়—সেই সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে অবহিত হওয়া।"

এইরূপ আত্ম সমর্থনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপর আর একটী বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত কর্‌লাম।

"আমি কোনও এক কবিরাজের গৃহ তল্লাস করে বহু কদর্য্য ও অশ্লীল যৌন-ক্রিয়া সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি উদ্ধার করেছিলাম। এই পুস্তক-গুলি অসৎ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত করার জন্যে আমরা তাঁর নামে একটী ফৌজদারী মামলাও আদালতে দায়ের করতে মনস্থ করি। এই সময় ঐ কবিরাজ দশ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণের জন্য মামলা দায়ের করার ভয় দেখিয়ে একটী পত্রাঘাত করলেন। তাঁর মতে

তিনি একজন যৌন-শক্তিহীনতার চিকিৎসক। ঐ সকল পুস্তকাদি তিনি ঐরূপ রোগীদের পড়তে দিয়ে তাঁদের এই দুরূহ রোগসমূহের চিকিৎসা করে থাকেন, অর্থাৎ কি'না তিনি সমাজের কল্যাণের জন্যই ঐ পুস্তক সকল সংগ্রহ করেছেন। এর পর কবিরাজের নামে মামলা আমরা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হই।"

শহর অঞ্চলে হটযোগ প্রভৃতি নামে বহু মুদ্রিত বা হস্তলিখিত পুস্তকাদি যুবক সমাজে গোপনে প্রচারিত হ'তে দেখা গিয়েছে—এই সকল পুস্তকের কাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য যুবকদের যৌনবৃত্তি উদ্বেলিত করে তাদের বিপথে নিয়ে যেতে সাহায্য করা। এই সকল পুস্তক পড়ে যুবকদের ধারণা হয় যে, যে কোনও কন্যার সহিতই পুস্তকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী অসৎ ব্যবহার করা সম্ভব। কেহ কেহ কার্য্য-ক্ষেত্রে উহা পরীক্ষা করতে গিয়ে অপমানিত, প্রহৃত, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে ফৌজদারীতেও সোপার্দ্দ হয়েছেন। বহু লোভী ব্যবসায়ী আছেন যাঁরা গোপনে এই সকল পুস্তক বিক্রয় ক'রে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। দেশের আইনানুযায়ী এরূপ ক্রয়-বিক্রয় এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এই পুস্তিকার কাহিনীসমূহ দ্বারা যৌনবৃত্তি উদ্বেলিত করতে হ'লে শক্তিশালী কলমের সাহায্যে ঐগুলি রচনা করার প্রয়োজন হয়। এই কারণে দুর্ব্বৃত্ত-পুস্তক-প্রচারকরা বহু নামকরা সাহিত্যিকদের প্রচুর অর্থ প্রদান করে এই জঘন্য কাহিনীগুলি লিখিয়ে নেন। লোভের কারণে দরিদ্র সাহিত্যিকগণ তাঁদের এ বিষয়ে গোপনে সাহায্য করেছেন, কিন্তু এই পুস্তকসমূহে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে তাঁরা কখনও সাহসী হন নি। তবে শক্তিশালী কলমের এরূপ অপব্যবহার এ দেশের কম সাহিত্যিকই ক'রে থাকেন। এঁদের সংখ্যা দুই তিন জনের বেশী হবে বলে আমি মনে করি না।

অনেক সাহিত্যিক আছেন যাঁরা আইন বাঁচিয়ে রুচি-বিগর্হিত রূপে নর-নারীর যৌন দিকটা চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে অত্যধিকরূপে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্বন্ধ যে কি, এবং তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের যৌনজ দিকটা যে কিরূপ তা' সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিরাই অবহিত আছেন। এই বিশেষ দিকটা সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এই বিশেষ দিকটার জন্য কলমের অপব্যবহার না ক'রে সাহিত্যিকদের উচিত নর-নারীর আচার ব্যবহার, সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ এবং উহাদের যথার্থ কারণ নির্ণয় ক'রে দেওয়া, সামাজিক চিত্র সঠিক ভাবে ফুটিয়ে তুলা এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা। কোনও শ্রেণীবিশেষের সত্যকার সমাজচিত্র ফুটিয়ে তুলবার জন্য ঐ সমাজ বিশেষে প্রচলিত আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বর্ণনা দিবার সময় যদি কিছু কিছু রুচি-দোষ বা অশ্লীলতা কলমের মুখে এসে যায় তা'হলে উহাকে কেহ অশ্লীলতারূপে অভিহিত করবে না। তবে ঐরূপ কোনও বর্ণনা সংযত ভাবে এবং সৎউদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ঐ কার্য্য একমাত্র শক্তিশালী কলমের সাহায্যে চাতুর্য্যের সহিত করা যেতে পারে।

শ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রকৃত স্বরূপ না বুঝতে পারার জন্য বহু ভদ্র-ব্যক্তি ও পরিবার বৈজ্ঞানিক পুস্তকসমূহ পর্য্যন্ত বর্জ্জন ক'রে থাকেন। এই জন্য বহু বিবাহিত দম্পতির বিবাহিত জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু যৌন সম্পর্কীয় জ্ঞানের অভাবে তাদের এই প্রতিকারের জন্য কেহ কোনও ঔষধের সন্ধান পর্য্যন্ত দিতে পারেন নি।

[যৌন-শক্তিহীনতা বা ইম্‌পোটেন্সি প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে মনের, দৈহিক যৌন-শক্তিহীনতা রোগ প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই দেখা

যায় না। কোনও এক ব্যক্তি একজন বা ততোধিক কন্যার পক্ষে হয়তো ইম্‌পোটেণ্ট বা যৌন-শক্তিহীনরূপে প্রমাণিত হবেন, কিন্তু অপর কোনও এক মেয়ের পক্ষে তিনি হয়তো একেবারেই যৌন-শক্তিহীন বা ইম্‌পোটেণ্ট রূপে প্রমাণিত হবেন না। বহুক্ষেত্রে শিরার বিকৃতির কারণে ব্যক্তি-বিশেষ যৌন-সঙ্গমে অপারক হয়েছেন, এইরূপ ক্ষেত্রে সামান্যরূপ অস্ত্রোপচার দ্বারা তিনি নিরাময় হতে পারতেন, কিন্তু অহেতুক লজ্জার কারণে তিনি একথা কারও কাছে প্রকাশ না ক'রে জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তুলেছেন।]

ইংরাজীতে এক প্রবাদ আছে, 'টু কিল এ বুক, ইজ ওয়ার্স্ট দ্যান্ কিলিঙ এ ম্যান্'। এই কারণে অশ্লীলতা বা রাজদ্রোহের অজুহাতে পুস্তকের প্রকাশ নিষিদ্ধ করতে হ'লে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। এই সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্ব্বে দেশের পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করা উচিত। নিম্নের গল্পটী হ'তে এই বিষয়ে বিশেষরূপে শিক্ষা লাভ করা যাবে।

"এক সময় রোম সাম্রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এক প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত হয়েছিল। দেশ বিদেশের বহু শিল্পী তাদের শিল্পসম্ভার এখানে জড় করেছিল। সহস্র সহস্র নর-নারী এই প্রদর্শনী সাগ্রহে দর্শন করছে। একদিন রোমক সম্রাট শুনতে পেলেন যে, কোনও এক তরুণ চিত্রশিল্পী ঐ স্থানে একটী নগ্ন স্ত্রী-মূর্ত্তি প্রদর্শন করছেন। এই তৈলচিত্রটী দর্শন করবার জন্য ঐখানে সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ হচ্ছে এবং এতে ক'রে প্রজাসাধারণের চরিত্রের হানি হ'তে পারে—দূত মুখে এই সংবাদ পেয়ে রোমক সম্রাট ঐ অশ্লীল চিত্রসহ চিত্রকরকে বন্দী ক'রে রাজসভায় আনবার হুকুম দিলেন।

পরদিন ঐ যুবক চিত্রকর এবং তার সৃষ্ট ঐ চিত্রটীকে রাজসভায়

হাজির করা মাত্র পাত্রমিত্রগণ সমস্বরে বলে উঠলেন—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কিন্তু সকলেই মনযোগ সহকারে চিত্রটী অবলোকন করতে লাগলেন। কখনও দূর হ'তে কখনও বা নিকট হ'তে রোমক সম্রাট বারে বারে চিত্রটী পরিদর্শন করলেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন মন্ত্রীসহ সভাশুদ্ধ সকলেই। দেখা যেন আর তাদের শেষই হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে চলেছে কিন্তু দেখার বিরাম নেই। কখনও পার্শ্ব, কখনও বা সম্মুখ থেকে এই চিত্রটী তাঁরা দেখছিলেন। কিন্তু এঁদের কেহই ঐ চিত্রটী হ'তে চোখ ফিরাতে পার্চ্ছিলেন না। এইভাবে বহুক্ষণ ধরে পরিদর্শন করার পর সম্রাট এবং সভাসদগণ পুনরায় নিন্দা-মুখর হয়ে উঠলেন। ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে রোমক সম্রাট আদেশ করলেন, 'এ কে আছিস্, একে নিয়ে যা। এর আমি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম।' যুবক চিত্রকর ধীর চিত্তে এই আদেশ শুনে সম্রাটকে জানালো, 'মহামহিম সম্রাট! এ আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমি বলবো। আপনি এক অবিচার করলেন। আপনি আমাকে শাস্তি দিলেন বিচার না ক'রে।' ক্রুদ্ধ হয়ে রোমক সম্রাট বললেন, 'কেন? আমি কি তোমার বিচার করি নি?'—'আজ্ঞে, হাঁ,' যুবক চিত্রকর বললে, 'এ হচ্ছে, চিত্রের ব্যাপার। আপনি তো চিত্রকর নন। শাস্তিদান করার পূর্ব্বে আপনার উচিত এ বিষয়ে চিত্র-সম্বন্ধে-বিশেষজ্ঞ গুণী চিত্রকরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা। আজ যদি আমার কোনও দৈহিক ব্যাধি হয় তা'হলে আপনি কি বিধান দিতে সক্ষম? আপনি কি বলতে পারেন আমার রোগ হয়েছে, কিংবা হয় নি? তেমনি এই চিত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনও বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য গ্রহণ না ক'রে আপনারা কেউই বলতে পারেন না, সত্যই এই চিত্র অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট বা তা নয়।'

চিত্রকরের এই সওয়াল বা জবানবন্দী ধীর ভাবে শুনে রোমক সম্রাট আদেশ জানালেন, 'তা' বেশ! তা'হলে রাজ-চিত্রকরকে এইখানে ডাকা হোক।' সম্রাটের আদেশে দূতগণ তৎক্ষণাৎ রাজ-চিত্রকর, অতি বৃদ্ধ অমুককে সভাস্থলে এনে হাজির করলে রোমক সম্রাট বললেন, 'দেখুন তো এই চিত্রটীকে অশ্লীল বলা যায় কি'না ?' অতি বৃদ্ধ রাজ-চিত্রকর চিত্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন, চোখ যেন তিনি আর ফিরাতে পারেন না। অস্ফুট স্বরে রাজ-চিত্রকর বলে উঠলেন, 'মহারাজ, এই চিত্রের চিত্রকর কে ? এ সাম্রাজ্যের এক অদ্ভুত ও শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি।' হত-বিহ্বল হয়ে রোমক সম্রাট বললেন, 'এ কি বলছেন আপনি ? অশ্লীলতা সৃষ্টির জন্য তাকে যে আমি প্রাণদণ্ড দিয়েছি।'—'এঁ্যা করেছেন কি ?' রাজ-চিত্রকর ত্রস্তভাবে উত্তর করলেন, 'এ আদেশ ত্বরায় প্রত্যাহার করুন সম্রাট। আমার মৃত্যুর পর একেই আপনাকে রাজ-চিত্রকরের পদ দিতে হবে। এর চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি আপনি পাবেন না। এ ছবি অশ্লীল নয়, তবে একে আমি এক্ষুণি অশ্লীল ক'রে আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি, অশ্লীলতা কি ? দিন একটী তুলি ও কিছু কালো রঙ্।' এর পর রাজ-চিত্রকর রঙ্, তুলি ও এই চিত্রটী নিয়ে পার্শ্বের এক কক্ষে চলে গেলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পর রাজ-চিত্রকর যখন এই চিত্র পুনরায় সভাস্থলে রেখে দিলেন তখন সভার কেউই আর ঐ চিত্রের দিকে তাকাকে পারে না। সকলেই চোখ বুজে তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'নিয়ে যান, নিয়ে যান। ঘৃণা আসছে।' মৃদু হেসে রাজ-চিত্রকর বললেন, 'এইবার বুঝতে পারলেন আপনারা, অশ্লীলতা কি ? সত্যই এই ছবি এখন জঘন্যরূপ অশ্লীল।"

রাজ-চিত্রকর চিত্রের নগ্ন নারী-মূর্ত্তির নগ্ন পা দুটীতে মাত্র এক জোড়া মোজা পরিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে সেই নগ্ন মূর্ত্তিটি তার সকল সৌষ্ঠব

হারিয়ে বীভৎসরূপে ফুটে উঠেছিল। তাই একত্রে সকলে এই ছবিটীকে দেখে আর আনন্দ পায় নি। 'Sense of undress' বা বিবসনা-বোধ না থাকলে উহাকে অশ্লীল বলা হয় না। ইচ্ছাকৃত নগ্নকরণ যদি কোনও নগ্ন নারীর চিত্রে প্রকাশ পায় তা'হলে উহাকে অশ্লীল বলা হয়। কোনও এক নগ্ন নারী-মূর্ত্তির দেহে যদি অলঙ্কার থাকে অথচ বস্ত্র না থাকে তা'হলে তা' নিশ্চয়ই বীভৎসরূপে প্রকট হবে। উহাকে তখন শিল্পকলা বা Art বলা হবে না। অর্দ্ধ-বিবসনা নারী-মূর্ত্তি অশ্লীল কিন্তু নগ্ন নারীমূর্ত্তি অশ্লীল নয়। আসলে প্রতিটী বিষয় শিল্পীর উদ্দেশ্য বা ভাব স্থষ্টির উপর নির্ভর করে, তবে আলো এবং ছায়া (Light and Shed) নগ্ন দেহের অংশ বিশেষের উপর সাবধানে ব্যবহার করা উচিত, যাতে কি'না চিত্রটী রুচি বিগর্হিত না হয়।

কথা এবং রূপ শিল্পিগণ যে উদ্দেশ্যেই কাহিনী বা চিত্রের স্থষ্টি করুন না কেন, রাজ-পুরুষদের বিবেচনা করতে হবে ঐ চিত্র বা কাহিনী জনসাধারণ কি ভাবে গ্রহণ করছে বা উহা তাদের মনের উপর কিরূপ পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করছে। যদি প্রতীত হয় যে জনসাধারণ উহাকে অসৎরূপে গ্রহণ করছে, তা'হলে শিল্পীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মহৎ হলেও ঐ চিত্র বা কাহিনীর বহুল প্রচার নিষিদ্ধ করা উচিত। তবে উহাদের বহুল প্রচার নিষিদ্ধ করা হ'লেও বিনষ্ট করা উচিত হবে না। এইগুলিকে পুস্তকাগারসমূহে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা ভুক্ত ক'রে সিল-মোহর যুক্ত বাক্সে রক্ষা করা উচিত, যাতে করে সুস্থিরমনা সুধী ও গবেষক ছাত্ররা প্রয়োজন বোধে উহা পাঠ করতে পারে।

বহু ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা এবং অভ্যাসের উপর শিল্পের অশ্লীলতা নির্ভর ক'রে থাকে। কোন কোন মন্দির গাত্রে এখনও বহু অশ্লীল মূর্ত্তি দেখা যায়। কিন্তু ধর্ম্মীয় ব্যাখ্যার কারণে ঐগুলি অশ্লীলরূপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়

নি। কিন্তুমন্দিরের বহির্দ্দেশে অশ্লীল মূর্ত্তিসমূহ খোদিত থাকলেও মন্দিরের ভিতরে ঐরূপ যৌনমূর্ত্তি দেখা যায় না। এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে, যা কিছু অশুচি তা' বাহিরের, ভিতরের নয়। উহাদের পরিহার ক'রে যারা ভিতরে আসবে তারাই সত্যকার পূজারী ও ভক্ত। কেহ কেহ এইরূপও বলেন যে, ঐগুলি জীবনের স্পন্দন ও সৃষ্টির প্রতীক। সত্যকে সত্যরূপে স্বীকার করা অশ্লীলতা নয়। পুনঃপুনঃ এই মূর্ত্তিগুলি সন্দর্শন করার পর কলুষতার কোনও মোহ বা আগ্রহ পূজারীদের মনে স্থান পাবে না। এবং এরা চাঞ্চল্যবিহীন অভ্যস্ত মনসহ মূল মন্দিরে প্রবেশ করবে; এই উদ্দেশ্যেই না'কি ঐমূর্ত্তিগুলি মন্দিরের বহির্গাত্রেস্থান পেয়েছে।

দেশ বিদেশে এমন অনেক মানুষ আছে যারা আজও নগ্ন ভাবে বা মাত্র নেঙট্ পরে বসবাস করে। কোনও কোনও সভ্য মানুষের নিকট এইরূপ ব্যবহার অশ্লীল, কিন্তু সংশ্লিষ্ট মনুষ্য সমাজে উহা অশ্লীল নয়। ভারতীয়গণ কাপড় ও ইজের ব্যবহার করায় য়ুরোপীয়গণ উহাকে নগ্নতার আখ্যায় ভূষিত করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। অপরপক্ষে এদেশের লোকেরা য়ুরোপীয় নারীদের স্কার্টস পরিধান করাকে নগ্নতার সামিল বিবেচনা করেন।

কোনও কোনও সুসভ্য হিন্দু লুঙ্গী এবং প্যাণ্টকে সমভাবে অশ্লীল মনে করেন; বিশেষ করে প্যাণ্টুলেন এদের নিকট অত্যন্ত অরুচিকর। পায়ের সহিত লেপ্টে থাকায় উহা নগ্নতার পরিচয় দেয়। কেহ কেহ ঘরে লুঙ্গী পরলেও উহা পরিধান ক'রে বাইরে বার হওয়া অসভ্যতা মনে করেন। অপর দিকে য়ুরোপীয়গণের নিকট ইজের পরে বার হওয়া এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। উহা তাদের নিকট আণ্ডার-ওয়ার মাত্র; বা অর্দ্ধনগ্নতার সামিল। ঐ পরিচ্ছদ পরে মেয়েদের সম্মুখে গৃহের মধ্যেও বার হওয়া চলে না।

এই ভারতবর্ষে বহু জাতির ও কৃষ্টির লোকের বাস। তারা পরস্পর পরস্পরের বসন ভূষণ পছন্দ না করলেও তা' তারা সহ্য করে। ইহার একমাত্র কারণ সহঅবস্থানের অভ্যাস। এই সহনশীলতা তারা অভ্যাস দ্বারা অর্জ্জন করেছে। তাই সহনশীলতাকে অবলম্বন ক'রে বর্ত্তমান ভারতীয় কৃষ্টি গ'ড়ে উঠেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত জাপানে নরনারীরা একত্রে নগ্ন হয়ে স্নান করতো। য়ুরোপীয়গণের চক্ষে এই আচরণ বীভৎস রূপে প্রতীত হয়েছে, কিন্তু জাপানীদের চক্ষে উহা বহুদিন পর্য্যন্ত অশ্লীল ছিল না। পরে জাপানীদের নিকটও উহা অশ্লীলরূপে ধরা পড়ে। বর্ত্তমানে আইন দ্বারা এই প্রথা জাপানে রহিত করা হয়েছে।

একমাত্র সমাজ ও মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতরাই অশ্লীল এবং শ্লীলের প্রভেদ সম্বন্ধে অবহিত হতে সক্ষম। সাধারণ ব্যক্তির হাতে এর বিচারের ভার রাখা অনুচিত, বিপজ্জনকও বটে; বিশেষ ক'রে এই দেশে। এদেশে এমন একদিন ছিল, যে সময় বর বধূর সর্ব্বসমক্ষে কথোপকথন পর্য্যন্ত অন্যায়রূপে বিবেচিত হয়েছে; পাশাপাশি বসে থাকা তো দূরের কথা। এখন হাতে হাত রেখে পাশাপাশি বসলেও দোষ হয় না। কিন্তু এরা যদি সর্ব্বসমক্ষে পরস্পরকে চুম্বন করে তা'হলে উহাতে দোষ হবে। কিন্তু য়ুরোপীয়গণের নিকট চুম্বন একটী নির্দ্দোষ আচরণ। একদিন ভারতীয়রাও এই প্রকাশ্য চুম্বনকে নির্দ্দোষ আচরণ মনে করবে। এই ভাবে দেখতে পাবো যে, অশ্লীলতা বলতে প্রকৃত অশ্লীলতার সহিত কদর্য্যতা, রুচি বহির্গত এবং অসামাজিক আচরণ সমূহকেও যুক্ত করা হয়, কিন্তু তা অনুচিত।

অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তিদের উপর অশ্লীলতার পরিমাপ করতে দেওয়া যে কিরূপ বিপজ্জনক তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমরা তিনজন অফিসার কোনও একটী নাটক পৃথক পৃথক ভাবে পরিদর্শন ক'রে রিপোর্ট দেবার জন্যে আদিষ্ট হই। অনেকের মতে না'কি নাটকটী অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট ছিল। নাটকের এক জায়গায় একজন স্থূলকায় মহিলা ছুটে আসছিলেন। এই ভাবে ছুটে আসায় তার সঙ্গে জনৈক ভদ্রলোকের সংঘর্ষ ঘটে। ভদ্রলোকটী বিরক্ত হয়ে বলে উঠেছিলেন, 'বাবারে বাবা, যেন ডবল-ডেকার বাস।' আমার রিপোর্টে এই উক্তিকে আমি নির্দ্দোষরূপে ব্যাখ্যা করলেও অন্যান্য অফিসারগণ এর বহু প্রকার কদর্য্য ব্যাখ্যা করেন। মহিলাটীকে বাসের সহিত তুলনা করার অর্থ ছিল যে তিনি বাসের মতন বেপরোয়া ও স্থূলকায়; কিন্তু অন্য অফিসারগণ তাদের ব্যাখ্যায় বলেন যে লেখক ঐ উক্তি দ্বারা বলেছেন যে ডবল-ডেকার বাস যেমন বহু ব্যক্তিকে বহন করে তেমনি ঐ মহিলাটীরও বহু উপপতি আছে, অতএব এই উক্তি অশ্লীল। আমি এঁদের এবম্বিধ ব্যাখ্যায় হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলাম। তবে এও ছিল ভালো, পরে শুনেছি অপর একজন এই উক্তির আরও কদর্য্যতর ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর মতে ডবল-ডেকার বাসে যেমন উপরে ও নিম্নে দুইটী কক্ষ আছে, তেমনি এই মহিলাটী স্বাভাবিক এবং বিকৃত এই উভয়বিধ ভাবে যৌনবোধে অভ্যস্ত। এই কথাই না'কি লেখক এই কদর্য্য উক্তির দ্বারা জনসাধারণকে বুঝাতে চেয়েছেন, ইত্যাদি।"

যে সকল অফিসারগণের মন আধুনিক ভাবাপন্ন নন, যাঁদের মধ্যে কুসংস্কার এখনও বদ্ধমূল আছে বা যাঁদের সমাজ এবং মনোবিজ্ঞান এবং দেশ বিদেশের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান নেই তাঁদের উপর অশ্লীলতার বিচার করার ভার দেওয়া আদপেই নিরাপদ নয়।

এদেশে এমন অনেক গোঁড়া লোক আছে যারা প্রেমের সঙ্গীতকে অশ্লীল মনে করেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাহিনীকে অশ্লীল মনে করেন না। এমন কি ইংরাজী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে যা অশ্লীল নয়, তা বাঙ্গলা সাহিত্যে স্থান পেলে অশ্লীল হয়ে উঠে। এর একমাত্র কারণ পারিবারিক এবং সামাজিক সংস্কার। এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রেই মনকে সংস্কার-মুক্ত রেখে থাকেন।

বিকৃত যৌনবোধের কারণেও মানুষ অশ্লীলতার আশ্রয় নেয়, এতদ্বারা এরা যৌনজ শিহরণ ও পুলক লাভ করে। কারো কারো অবচেতন মনও এতদ্বারা তৃপ্ত হয়েছে। এমন অনেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আছেন যাঁরা অশ্লীল ঠাট্টা তামাসা পছন্দ করেন। অনেকের মতে, পরোক্ষ যৌন-তৃপ্তির কারণে তা' তাঁরা ক'রে থাকেন।

য়ুরোপে বহু গোপন থিয়েটার আছে। এইখানে পাত্র পাত্রীদের দ্বারা সর্ব্ব সমক্ষে যৌন সঙ্গম দেখানো হয়। এই নিষিদ্ধ থিয়েটারের দর্শকদের মধ্যে কদাচারী বৃদ্ধা ও বৃদ্ধদের সংখ্যাই অধিক দেখা গিয়েছে। যৌন অক্ষমতার কারণে এরা এই ভাবে যৌন তৃপ্তি লাভ করেন। আমাদের দেশের অশ্লীল তর্জ্জা লড়াইও ধনী বৃদ্ধদের দ্বারা এই একই কারণে পোষকতা লাভ করতো।

কেউ কেউ বলে থাকে, ভদ্রঘরের কন্যাদের অবচেতন মন অশ্লীল বাক্য শুনতে ভালোবাসে। এই কারণে অট্টালিকাসমূহের পার্শ্বে অবস্থিত বস্তিসমূহে অশ্লীল গালিগালাজ সুরু হ'লে এঁরা গোপন কক্ষের খড়খড়ি খুলে তা উপভোগ করেন। এর কারণ, নিরুদ্ধতা বা 'সাপ্রেসন্' কোনও একটী বৃত্তি জোর করে অবনমিত করে রাখলে আখেরে মনের মধ্যে উহা প্রতিক্রিয়া আনে। এই অবনমনের কারণে ভদ্র ঘরের কন্যাদের মধ্যে বহু বিসদৃশ ব্যবহারের স্বষ্টি হয়। অতিরিক্ত শ্লীলতা-

জ্ঞান বহুস্থলে সমাজের ক্ষতি সাধন করেছে। এইরূপ মনোবিকারের কারণে আমরা শিক্ষিতা কৃষ্টিসম্পন্না কন্যাকগণকেও পানওলার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখেছি। তবে এই রোগ একান্তরূপেই সাময়িক থাকে।

[এদেশে বহু উলঙ্গ সাধু ও সন্ন্যাসী দেখা গিয়াছে, এদের কেউ কেউ যৌনদেশে শলাকা বিদ্ধ করে রাখেন, কিন্তু এত সত্ত্বেও ভক্তরা এঁদের অশ্লীল মনে করেন নি।

নির্ব্বিকার চিত্তে উলঙ্গ থাকলে সমাজ তা' সহ্য করে, কিন্তু কেউ যদি উহা হস্তদ্বারা স্পর্শ বা উত্তোলন করেন তা'হলে তা' ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হয়। অর্থাৎ সব কিছু নির্ভর করে উদ্দেশের উপর।]

এদেশে হটযোগ নামক বহু খণ্ড যুক্ত এক পুস্তক গোপনে ভদ্র যুবকদের পাঠ করতে দেখা গিয়েছে। পূর্ব্বে ইহা হস্ত লিখিত পুঁথিরূপে হাতে হাতে প্রচারিত হতো এক্ষণে বহুল প্রচারের জন্য ইহা গোপনে মুদ্রিতও হয়েছে। একটি যুবক বা যুবতীর নিকট হ'তে অপর যুবক-যুবতীগণ গোপনে ইহা সংগ্রহ করে। বহু অপরিণত বালক-বালিকারাও ইহা গোপনে পাঠ ক'রে অকালপক্কতা লাভ করেছে। যৌনবৃত্তি কৃত্রিম উপায়ে উদ্বেলিত করবার জন্যে এই পুস্তক সকল লেখা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার যৌন সঙ্গমের বিষয় তো এতে লিপিবদ্ধ আছেই, তা' ছাড়া ভাই, ভগ্নি, ভ্রাতৃজায়া, কাকিমাতা, বন্ধু-পত্নী প্রভৃতিও ইহাতে জঘন্য ভাবে চিত্রিত হয়েছে। শেষোক্ত বিষয়টাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর, কারণ ইহা বালিকা ও বালকদের মন পঙ্কিল ক'রে তুলে এবং সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে দেয়। কেউ কেউ পুস্তক-বর্ণিত পন্থানুযায়ী বাস্তব জগতে পরীক্ষা ক'রে প্রহৃত ও আদালতে সোপর্দ্দীকৃত হয়েছে।

এই পুস্তক পঠনকালে স্বভাবতঃ ভাবেই রেতঃ পাত হয়। এতে

বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ে, কারো কারো মুখ বিবর্ণরূপ ধারণ করে এবং চক্ষের কোণে কালি পড়ে যায়। এছাড়া উহা পাঠের সময় অহেতুক উত্তেজনা তাদের শরীরে তাপ বর্দ্ধিত ক'রে তাদের অসুস্থ করেও তুলে থাকে।

এইরূপ বাঙালা পুস্তকের ন্যায় মুদ্রিত এবং টাইপ করা ইংরাজী পুস্তকও আছে, বহু অর্থ ব্যয়ে অসৎ প্রকৃতির বালক-বালিকারা এই-গুলি সংগ্রহ ক'রে থাকে।

যৌন বিষয় বিকৃতভাবে পরিজ্ঞাত হওয়ায় নারী এদের অবচেতন মনে ঘৃণার উদ্রেক করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ এদের বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি। বহুক্ষেত্রে এদের মনে হয়েছে নারী মাত্রেই বুঝিবা কুলটা বা অবিশ্বাসী। এই কারণে তারা আপন স্ত্রীকেও বিশ্বাস করতে পারে না। এছাড়া অজানা দ্রব্যের প্রতি মানুষ মাত্রেরই একটা মোহ থাকে, কিন্তু পূর্ব্বাহ্নেই যৌন বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ায় বিবাহের প্রাথমিক আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, যুবক-যুবতীদের পূর্ব্বাহ্নেই যৌন-শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিন্তু আমার মতে এই শিক্ষা তাদের বিবাহের সময় বা পরে দেওয়া ভালো। স্বাভাবিক ভাবে যৌন-জ্ঞানই শ্রেয়স্কর জ্ঞান ; প্রকৃতিরাণীর বরে স্বাভাবিক ভাবে এই জ্ঞান এরা পেয়ে থাকে—এইজন্য এই ব্যাপারে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নেই। বহুক্ষেত্রে যৌন-শিক্ষার নামে অশিক্ষাই এরা পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে যৌন-জ্ঞান লাভ না ক'রে বন্ধু-বান্ধবের নিকট পুঁথিগত ভাবে এরা এই শিক্ষা লাভ করে। ফলে নানারূপ ভুল ভ্রান্তি এদের মনে শিকড় গাড়ে। একমাত্র এইজন্য বিবাহের পূর্ব্বে এদের প্রকৃত যৌন-জ্ঞান প্রদান করা ভালো।

অত্যধিক শ্লীলতাবোধ বহুক্ষেত্রে মানুষের ক্ষতির কারণ হয়েছে।

"আমি অশ্লীলতা পছন্দ করি না, আমি ভালো, আমি শ্লীল,"—বারে বারে এইরূপ এরা চিন্তা করে এবং সর্ব্বসমক্ষে তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়। ক্ষেত্র-বিশেষে ইহা "বাই" (Mania) রূপে এদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। এরা "পোনদে লেগো না" বলা পছন্দ করবে না। এই ক্ষেত্রে এরা বলবে "পিছনে লেগো না।"

নারী সম্বন্ধে কোনও আলোচনা এরা পছন্দ করে না। অথচ প্রাকৃতিক কারণে এদের অবচেতন মন নারী সম্বন্ধে আলোচনা সর্ব্বদাই পছন্দ করেছে। এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ভয় বা আঘাত পেলে এরা মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই সময় এদের মনের আধার-ভূত সূক্ষ্ম স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় এদের প্রতিরোধ শক্তির হানি ঘটে। এইজন্য মনের মধ্যে কোনও অহেতুক ইচ্ছা উপস্থিত হলে এরা সহজে তা তাড়াতে পারে না। প্রায়শঃক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, অশ্লীল বাক্য বা কার্য্যদ্বারা এদের এই মনোবিকৃতির উপশম ঘটেছে। কোনও অবিশ্বাস্য কিছু বিশ্বাস্যরূপে প্রতীত হলে বহুক্ষেত্রে উহা মানুষের মনের মধ্যে এক আলোড়ন আনে। এই আলোড়নের ফলে ঐ বিশ্বাস্য বা অবিশ্বাস্য বস্তু তাদের মনে চিন্তা রোগের সৃষ্টি করে। অনেকে বলেন, জোর করে যৌন সম্বন্ধীয় বিষয় হতে বিরত থাকলে এই রোগ হতে সহজে মুক্ত হওয়া যায় না। বহুক্ষেত্রে যৌন-সঙ্গম, অশ্লীল বাক্য ও কার্য্য দ্বারা এরা নিরাময় হতে পেরেছে।

বিকৃত যৌনবোধও এইরূপ বহু মানসিক রোগের সৃষ্টি করে। নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"অমুক রাজ পরিবারের ছোট তরফের অমুকবাবু মধ্যে মধ্যে বিকৃতমনা হয়ে উঠতেন। এই সময় কোনও এক কর্ম্মচারী এঁকে তাঁদের উদ্যান বাটীকায় নিয়ে যেতেন এবং চোখের জল ফেলতে ফেলতে

ইনি ঐ রাজার সমক্ষে এক কুলটা নারীর সহিত যৌন-সঙ্গম করতেন। এই যৌন-সঙ্গম পরিদর্শন মাত্র তিনি পুনরায় সুস্থতা লাভ করেছেন। ভীষণরূপে বিকৃত-মনা হওয়ামাত্র বাধ্য হয়ে এঁর স্ত্রী ও মাতা নিজেরাই কর্ম্মচারীদের তাঁকে উদ্যান বাটীতে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

অশ্লীলতা বিকৃত যৌনবোধের নামান্তর মাত্র। নিম্নে এই সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি দেওয়া হলো।

"উড়িষ্যার কোনও এক রাজা অদ্ভুত উপায়ে তাঁর যৌনবোধের উপশম ঘটাতেন। তিনি উপরে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। এবং এঁর পরিদর্শনের জন্য এক নারীকে উলঙ্গ অবস্থায় নিম্নে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। বহু মুদ্রা ব্যয়ে নারীদের এইজন্য সংগ্রহ করা হতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কখনও তাদের দেহ পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নি।"

নিম্নে এই সম্বন্ধে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো। শান্তি-রক্ষকদের মধ্যে মধ্যে এইরূপ বহু ঘটনার বা মামলার তদন্ত করতে হয়েছে।

"আমি রক্ষীজীবনে বহু অশ্লীল ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছি। একজনকে আমি জানতাম, যে নারী দেখলেই তার বাম হস্ত ধরে ডান হস্তে হস্ত-মৈথুন সুরু করেছে। কিন্তু সে ঐ নারীর গাত্র কখন ভুলক্রমেও স্পর্শ করে নি। অপর একজন দূর হতে নারী দেখলে ঐভাবে যৌন-তৃপ্তি লাভ করতো। বারে বারে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হয়েও এরা শোধরাতে পারে নি। কোনও কোনও ব্যক্তিকে নারীকে দেখামাত্র অণ্ডকোষ চুলকাতেও দেখা গিয়েছে। তবে ইহা বদ্ অভ্যাস, দাদ প্রভৃতি রোগ এবং অসাবধানতার কারণেও হয়ে থাকে। আমার মতে এই প্রত্যেকটি বিসদৃশ ব্যবহারই মানসিক রোগপ্রসূত হয়ে থাকে এবং চিকিৎসা দ্বারা ইহাদের নিরাময়ও করা যায়।"

এই বিকৃত যৌনবোধের জন্য বহু ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে ও অশ্লীল কার্য্য করে। বহু ব্যক্তি আছে যারা নারীদের দিকে যৌনঅঙ্গ দেখাতে অভ্যস্ত। মাত্র এইরূপে এরা তাদের বিকৃত যৌন-স্পৃহার উপশম ঘটিয়েছে। কামশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি বাৎস্যায়ন এইরূপ ব্যবহারের নাম দিয়েছেন প্রদর্শনবাদ। তিনিও ইহাকে এক প্রকার মানসিক রোগরূপে স্বীকার করেছেন।

এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা দেওয়ালে, বাষ্পযান সমূহের কক্ষগাত্রে, প্রস্রাব ঘরের মধ্যে 'অমুকে অমুক' প্রভৃতি বহু অশ্লীল অশ্রাব্য বাক্য লিখে রাখতে অভ্যস্ত। বলা বাহুল্য যে, এইগুলিও রোগপ্রসূত হয়ে থাকে। বহু বালক এরূপ মানসিক রোগে ভুগেছে। ইহা কারো মধ্যে সাময়িক ভাবে কারো মধ্যে বা বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হতে দেখা গিয়েছে। তবে বহুক্ষেত্রে অভ্যাস, কুসঙ্গ এবং কু-বাক্-প্রয়োগ প্রভৃতি এদের এইরূপ ব্যবহারের জন্য দায়ী হয়ে থাকে।

বিকৃতরূপ যৌন-সঙ্গম বা বিকৃত যৌন ব্যবহারও অশ্লীলরূপে প্রতীত হয়। আপন স্ত্রীর প্রতি প্রযুক্ত হলেও উহা অশ্লীল। যৌন-সঙ্গমের মধ্যেও সৌষ্ঠবতা থাকা উচিত। এই কারণে সভ্য মানবী স্বামীর সম্মুখেও বিবসনা হন না। অন্ধকার ব্যতীত যৌন-সঙ্গমেও এঁরা রাজী হন নি। এইগুলিকে মনে প্রাণে অপমানকর এবং এঁরা অশ্লীলরূপে মনে করেছেন।

[রোম ও গ্রীক দেশে প্রাচীনকালে পাত্রী মনোনয়ের জন্য এক অদ্ভুত রীতি ছিল। পাত্র কোনও এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকতো। কুমারী কন্যাগণকে তাঁর সম্মুখ দিয়ে নগ্ন দেহে হেঁটে যেতে বলা হতো। এদের মধ্যে যার নগ্ন অঙ্গ-সৌষ্ঠব পাত্রের পছন্দ হতো তাকে সে বিবাহ করতো। এই রীতিকে তারা কখনও অশ্লীল মনে করে নি। বস্তুত-

পক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদিত কন্যাদের প্রকৃত রূপ-লাবণ্য জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। একমাত্র বাটীর অপর নারীগণই এই সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে সক্ষম। এই কারণে স্ত্রীলোকদের সাহায্যে পাত্রী পছন্দ করার রীতি আছে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের শ্রেষ্ঠ চিত্র অধিক ক্ষেত্রেই নগ্ন নারীকে কেন্দ্র করে স্বষ্ট হয়েছে। সুবিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর Rodin Auguste এ যুগেও নগ্ন নারী ও পুরুষ মূর্ত্তি স্বষ্টি করেই নাম করেছেন। সাহিত্যিক ভিক্টর হিগোর মূর্ত্তিও তিনি নগ্নরূপে স্বষ্টি করেছেন। এমন কি ঐ মূর্ত্তিতে তার যৌনাঙ্গও প্রকটিত করেছেন।]

অশ্লীলতা সম্বন্ধে যারা চর্চ্চা করবেন, তাদের আমি D. H. Lawrence-এর "Apropos Lady Chatterley's Lover" পুস্তক পড়ে দেখতে বলবো। তাঁর পুস্তকের কিছু অংশ অশ্লীলতার জন্য বিচারকদের বিচারে বাদ দেওয়া হলে তিনি আত্মসমর্থনে এই দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রণয়ন করেছিলেন।

অশ্লীল পুস্তক ও গোপন থিয়েটারের ন্যায় অশ্লীল সিনেমা ছবির দ্বারাও লোকে বিকৃত যৌনবোধের উপশম ঘটিয়েছে। এই সিনেমা ছবিকে "ব্লু পিকচার" বলা হয়। এইরূপ প্যাথি-পিকচারের দুই এক কপি দুই একজন এদেশীয় যুবক দ্বারা এদেশে নীত হয়েছে। এই ছবিতে জঘন্যরূপ বহু যৌন-সঙ্গম দেখানো হয়েছে। এই ছবি প্যাথি-মেসিনের সাহায্যে ধনী যুবকেরা গোপনে রুদ্ধ কক্ষে বন্ধু-বান্ধবসহ উপভোগ করে থাকে। এইরূপ কয়েকটি প্যাথি-পিকচার বহু গৃহ হতে সংগৃহীত ক'রে আনা হয়েছে। আদালতে এদের কারুর কারুর সাজাও হয়ে গিয়েছে।

বালক-বালিকাদের এরূপ অশ্লীল চিত্রদর্শন এবং ঐ প্রকার আলাপন হতে বিরত থাকা শ্রেয়। এইরূপ আলোচনা দ্বারা এদের দৈহিক ও

মানসিক ক্ষতি হয়েছে। যে বালক অশ্লীল কথা বলতে পারে নি তাকে তার বন্ধুবান্ধবেরা বোকা বলে অবজ্ঞা করে। এই ভাবে এরা নিজেদের ন্যায় অপরেরও বহুবিধ ক্ষতি সাধন ক'রে থাকে।

হস্তমৈথুন একটি অশ্লীল কার্য্য। বৈজ্ঞানিকরা বলে থাকেন যে, হস্তমৈথুন ক্ষতিকর নয় কিন্তু উহা যে ক্ষতিকর এই চিন্তাই ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু আমার মতে এই উভয়বিধ বিষয়ই সমানরূপে ক্ষতিকর।

শুক্রথলিতে অনবরত শুক্র জমে এবং উহা স্বাভাবিক ভাবে বার না হ'লে তা উপচে পড়ে বার হয়। জাগ্রত বা ঘুমন্ত—এই উভয় অবস্থাতে ইহা সম্ভব। কিন্তু তা না হলে ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হয়। এইজন্য পণ্ডিতগণ বলেছেন যে স্বাভাবিক উপায়ে না বার করলে তা অস্বাভাবিক উপায়েও বার করা ভাল। তবে অতি কোনও কিছুই ভালো নয়, উহা অপচয় মাত্র। আমার মতে এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। আমি মনে করি যে এই বিষয়ে স্বাভাবিক ব্যবস্থাই শ্রেয়স্কর ব্যবস্থা।

এই দিক হতে বিচার করলে প্রমাণিত হবে যে সময়ে বিবাহ না করলে দেহ ও মনকে সুস্থ রাখা যায় না। এছাড়া এমন অনেক যুবক আছে, যাদের যৌনঅঙ্গ বিকৃত থাকে। সামান্যমাত্র চিকিৎসা বা অপারেশন এদের নিরাময় করতে সক্ষম। কিন্তু অশ্লীলতা বোধের কারণে এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে এরা লজ্জা বা ভয় পেয়েছে। এই অহেতুক লজ্জা যে কিরূপ অহিতকর তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"অমুক ভদ্রলোক তার কন্যা সহ থানায় এসে এজাহার দিলেন যে তাঁর নববিবাহিত জামাতা যৌন-সঙ্গমে অক্ষম। তাঁর কন্যা এইজন্য স্বামীর সহিত বসবাস করতে একান্তই অনিচ্ছুক। তিনি ঐ কন্যার

পূর্নর্বিবাহ দিতে বদ্ধ পরিকর, কিন্তু জামাতার পিতা এতে বিশেষ আপত্তি জানিয়েছেন এবং মারধোর করারও ভয় দেখাচ্ছেন। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় তিনি পুলিশের নিকট এজাহার দিতে এসেছেন। আমি এর পর ঐ জামাতাকে গোপনে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি। প্রথমে সে লজ্জায় প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করতে চায় নি। পরে জানতে পারি যে, যৌন-সঙ্গমের সময় সে কোনও এক কারণে অত্যন্ত ব্যথা পায়। এর পর আমি তাকে আমার এক বন্ধু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। ডাক্তার তাকে বলেন যে, যৌনঅঙ্গের মুখে একটু মাংসখণ্ড যুক্ত থাকায় উহা তাকে ব্যথা দেয়। এইজন্য সে যৌন-সঙ্গমে অক্ষম হয়েছে। ডাক্তার ঐ মাংসের মুখটা একটু চীরে দিয়ে আয়োডিন লাগিয়ে দেয়। এর পর যুবকটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়ে উঠেছিল। এবং তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল। বিবাহ বিচ্ছেদের আর প্রয়োজন হয় নি।"

যুবকদের ন্যায় যুবতীরাও সামান্যরূপ চিকিৎসা দ্বারা এই সকল রোগ হতে নিরাময় হতে পারেন কিন্তু অশ্লীলতা বোধের কারণে এরা আপন আপন ব্যাধির কথা কারো নিকট প্রকাশ করেন না।

বহু দাম্পত্য কলহের বা অবনি-বনার মূল কারণ থাকে এই সকল ব্যাধি, যা সামান্য চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় হতে পারে। এইজন্য বিবাহের পূর্ব্বে বর ও বধূর ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

অনেকে কন্যাদের প্রতি তাকিয়ে দেখাও অন্যায় বা অশ্লীল মনে করেন। কোনও এক ব্যক্তি আমায় বলেছিলেন, "মশাই, আমার পুত্র অমুক বড় ভালো ছেলে। ২৪ বছর বয়স হলেও সে কোনও মেয়ের প্রতি তাকিয়েও দেখে না।" উত্তরে আমি তাঁকে এইরূপ বলেছিলাম, "এ্যাঁ, বলেন কি মশাই! তাহলে দেহাভ্যন্তরের গ্ল্যাণ্ডের তারতম্য ঘটেছে। সময় মত এজন্য এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।"

এইরূপ বাহাদুরী থেকে বিরত হয়ে অভিভাবকদের বাস্তব জগতে নেমে এসে আপন পুত্র কন্যা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। সত্যকে সত্যরূপে স্বীকার না করলে দশ ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন কোনও দিনই হবে না। নানারূপ বৈচিত্রময় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা আমি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি।

ধর্ম্মের কারণেও এদেশে কেহ কেহ অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিয়েছেন। ভৈরব চক্র নামক এদেশের প্রাচীন ধর্ম্মিয় ব্যবস্থা ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানানুসারে সাধক উলঙ্গ অবস্থায় রুদ্ধ কক্ষে উলঙ্গ এক নারীকে ক্রোড়ে নিয়ে কালী মূর্ত্তির সম্মুখে বসে উপাসনা করেন। এই সাধন-পদ্ধতিতে মদ্য মাংস এবং নারী নিষিদ্ধ নয়। ভারতীয়রা এই উপাসনা পদ্ধতি কোনও যুগেই পছন্দ করেন নি।

এই উপাসনায় সাধক-সাধিকারা অত্যদ্ভুত মনোবল এবং সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এই অবস্থায় এদের রেতঃপাত পর্য্যন্ত হয় নি—যৌন-সঙ্গম তো দূরের কথা। কিন্তু এমন অনেক দুর্ব্বৃত্ত আছে যারা বহু সরলমনা নারীদের ধর্ম্মের অছিলায় ভুলিয়ে মিথ্যা ভৈরব চক্র দ্বারা বিভ্রান্ত করে তাদের উপভোগ করেছে।

কোনও কোনও যোগবিদ্যাতেও অশ্লীলতা দেখা যায়। এমন অনেক যোগীর কথা শুনেছি যারা পুরুষাঙ্গ দ্বারা এক বালতী জল শোষণ ক'রে নিতে পেরেছেন। অভ্যাস দ্বারা পেশী সঙ্কোচন ক'রে এইরূপ করা অসম্ভব নয়—এইরূপ অনেকে মনে করেন।

এদেশে পূজিত শিবলিঙ্গও যৌন ক্রীড়ার প্রতীক। কুমারীগণ এই কথা না বুঝে, না জেনেও এই মূর্ত্তির পূজা করে থাকেন। কিন্তু সৃষ্টি বা জীব গঠনের পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পূজা কি-ইবা আর থাকতে পারে?

বিদেশে স্বাস্থ্যের অজুহাতে অশ্লীলতা প্রশ্রয় পেয়েছে। অধুনা-দৃষ্ট

"নেকেড্ ক্লাব" সমূহ ইহার দৃষ্টান্ত। এই ক্লাবে নর-নারীরা নগ্ন দেহে পরিভ্রমণ ক'রে সূর্য্য স্নান করেন। এর দ্বারা না'কি তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

বেশ্যাপল্লীতে উপপতিকে বাংলায় "বাবু" এবং ইংরাজীতে "ভিসিটার" বলা হয়। এসোসিয়েশনের কারণে অনেকে এই দুইটী বাক্যকেও অশ্লীল মনে করেছেন। এই সকল ধারণা ক্ষমতায় অসীন ব্যক্তিদের ম্যানিয়াগ্রস্ত ক'রে বহু অঘটন পর্য্যন্ত ঘটাতে পেরেছে। এই সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক একটী ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"অমুক বালিকা হোষ্টেলে কয়েকটী বখা ছোকরা প্রায়ই উৎপাত করতো। তবে এই হোষ্টেলেরও যে বদনাম ছিল না তা'ও নয়। আমি একজন কর্ম্মচারীকে এইখানে ওয়াচ রাখতে বললাম। এই সময় এক ভদ্রলোককে চ্যালেঞ্জ করায় সে উত্তর দিলে যে সে বেলারাণীর ভিসিটার। প্রত্যেক হোষ্টেলেই যে ভিসিটিং বুক থাকে, এবং পূর্ব্ব হতেই ভিসিটারস্‌দের নাম লেখা থাকে এবং বাবা, কাকা, মামা ও দাদারাও যে ভিসিটার হতে পারে তা এঁর ধারণার বাইরে ছিল। ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠে এই নির্লজ্জউক্তির জন্য ঐ ভিসিটারকে অপমান করেছিলেন। পরে প্রকাশ পায় যে ঐ ভদ্রলোক ছিলেন বেলারাণীর মাতুল।"

কেহ কেহ যৌনরোগ সমূহকে অশ্লীল রোগ মনে ক'রে কারো নিকট উহা প্রকাশ করেন নি। তাঁরা এজন্য অহরহঃ নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। এমন কি তাঁরা এজন্য তাঁর নির্দ্দোষ ভবিষ্যত বংশীয়দের ক্ষতির কারণ হয়েছেন। কিন্তু লজ্জার কারণে কোনদিনই এঁরা এঁদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন নি। অথচ এই যুগে কোনও ব্যাধিই আর দুরারোগ্য নয়। এঁদের বুঝা উচিত ব্যাধি

ব্যাধিমাত্র, ভুল—ভুল ছাড়া আর কিছু নয়, দুর্ব্বলতা—দুর্ব্বলতাই—এই-গুলি মানুষ মাত্রের মধ্যেই বিদ্যমান। ভুলকে ভুল বুঝে তা শুধরে নেওয়ার মধ্যেই থাকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব। একমাত্র সুযোগ সুবিধা, সংস্কার, সাহসের অভাব এবং কৃষ্টি ও ইজ্জৎ হানির ভয়ই মনুষ্যকে বহু কার্য্য হতে বিরত রাখে। পৃথিবীর বহু ন্যায় ও অন্যায় মানুষের মনের বিকার মাত্র। এই গুলিকে অশ্লীল বা অন্যায় বিবেচনা না ক'রে এঁদের উচিত প্রকাশ্য বা গোপন চিকিৎসা দ্বারা যথা সত্বর নিরাময় হওয়া।

এমন অনেক বিকারগ্রস্ত যুবক আছেন যাঁরা স্ত্রীর সহিত আশু যৌন-সঙ্গম পর্য্যন্ত অশ্লীল কার্য্য মনে করেছেন। এর ফল কিরূপ বিষময় হয়ে উঠে তা নিম্নের বিবৃত হ'তে বুঝা যাবে।

"আমি বিবাহের কিছুদিন পরও স্ত্রীর সহিত যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত হই নি। এত শীঘ্র এই কার্য্যে লিপ্ত হলে আমার স্ত্রীর ধারণা হয়তো আমার উপর খারাপ হয়ে যাবে এবং সে হয়তো ভাববে যে আমি ভালো ছেলে ছিলাম না, তাই এত শীঘ্র এই কার্য্য করতে চাইছি—এইরূপ এক চিন্তার কারণে আমি কয়েকদিন তার সহিত সংযত আচরণ করেছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী এতে ভুল বুঝে পিত্রালয়ে গিয়ে আমার নামে বহু অপবাদ দিতে সুরু করলেন। তাঁর মতে আমি নাকি একজন যৌন শক্তি-হীন, অপদার্থ পুরুষ ইত্যাদি। কন্যার পিতা এই মিথ্যায় বিশ্বাস করে আমাদের বাড়ীতে এসে এজন্য বহু অনুযোগও ক'রে গেলেন। এই ব্যাপারে আমি লজ্জায় ক্ষোভে আধমরা হয়ে যাই। কারণ, সকলেই আমার যৌনশক্তিহীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ করছিল। আমার বারে বারে মনে পড়ছিল শ্বশুর মহাশয়ের তীক্ষ্ণ বাণী—'হি ক্যান নট ফাঙ্‌সন্ এ্যাজ্ হাজব্যণ্ড' এই দিন আমি প্রথমে বুঝতে পারি পুরুষের আসল লজ্জা, অপমান বা শ্লীলতাবোধ কোথায়?"

বিবাহের পর যৌন-সঙ্গমে অসুবিধা ঘটলে যুবক-যুবতীদের যৌন বিজ্ঞান বা কামশাস্ত্র অধ্যায়ন করা উচিত। এর দ্বারা তাদের প্রভূত উপকার হয়। এর মধ্যে অশ্লীলতার সন্ধান করা নিরর্থক। এমন অনেক নারী আছে যাদের বৃহৎ যোনির কারণে পুরুষ যৌন-সুখলাভে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থায় সে অন্য নারীতে সহজেই অনুরক্ত হতে পারে। এই বিষয়ে তাকে দোষারোপও করা যায় না। কারণ জীবনকে উপভোগ করার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু ঐ নারীর যদি কামশাস্ত্র পড়া থাকে তা'হলে সে পেশীর সঙ্কোচন পদ্ধতি আয়ত্ত করে স্বামীকে অনয়াসে সুখী করতে পারে। মানসিক কারণে যে সকল স্বামীর উত্তেজনা আসে না তারাও এই শাস্ত্রের রীতিগুলি অনুধাবন ক'রে স্ত্রীকে সুখী করতে সক্ষম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বাৎস্যায়ন ঋষি বলেছেন যে স্ত্রী যদি বুঝে যে স্বামীর রেতঃপাত শীঘ্রই হবে, তা'হলে তা বুঝামাত্র তার উচিত স্বামীর পৃষ্ঠে ও পৃষ্ঠনিম্নে চপেটাঘাত করা। এইরূপে সে নিজেকে ও স্বামীকে সুখী করতে পারবেন। অপরদিকে পুরুষদেরও উচিত অন্যমনস্ক থাকা, যেন সে কিছুই করে নি বা কর্চ্ছে না।

এইরূপ যৌন সত্য অনুধাবন করার মধ্যে অশ্লীলতা নেই বরং উপকার আছে। মহাপুরুষ শঙ্করার্য্য সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করে দিগ্বিজয়ে বার হয়ে তৎকালীন পণ্ডিত প্রবরা সরস্বতী দেবীর সহিত তর্ক করতে এলে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তুমি কি কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছো? উত্তরে 'না' বললে তাঁকে বলা হয়েছিল—বৎস, তা'হলে তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তোমার শাস্ত্র জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নি। জীব জগতের মূল মন্ত্র ঐ কামশাস্ত্র। উহার অধ্যয়ন শেষ করে তর্ক করতে এসো।" এই বিশেষ উপদেশটীর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক সত্য আছে তাহা স্বীকার করা উচিত হবে।

বহু ব্রহ্মচারী বিবাহের পর নিজেকে অসহায় মনে করে মনোকষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে তাদের অসুবিধার মূল কারণ অনভ্যাস। কিছুদিন অভ্যাসের পর মনের যৌনস্পৃহা ও উত্তেজনা ফিরে এসে থাকে। কিন্তু অহেতুক শ্লীলতা-বোধের কারণে তাঁরা এ সম্বন্ধে কারো পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। কেহ কেহ এজন্য অকারণে আত্মহত্যাও করেছেন। অতি ব্যবহারের ন্যায় কোনও অঙ্গ বিশেষের অব্যবহার বা অপব্যবহারও ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা পুনরায় নিরাময় হয়ে স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব। কামশাস্ত্র বা যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে এস্থলে আমি আলোচনা করবো না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী তথ্যের উল্লেখ করেছি মাত্র। আমি বুঝাতে চেয়েছি যে সৎ উদ্দেশ্য এইরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে অশ্লীলতা নেই।

এই পুস্তকে এই সকল যৌন সম্বন্ধীয় বিষয় অবতারণার অপর কারণ হচ্ছে এই যে বিবিধ যৌন সম্বন্ধীয় নিগূঢ় বিষয়গুলি শব্দ-সঙ্কলন এবং বর্ণবিন্যাসের দ্বারা যে নির্দ্দোষরূপে বলা যেতে পারে তা প্রমাণ করা। তবে এর সবটুকুই নির্ভর করে লিখন বা রচনা ভঙ্গির উপর। উপরের তথ্যগুলির লিখনভঙ্গি হ'তে বিষয়টী বুঝা যাবে। এই ক্ষেত্রে সাধু ভাষার সহিত বৈজ্ঞানিক শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহারই প্রকৃষ্ট। প্রয়োজনবোধে অশ্লীলতম অংশ মাত্র ইঙ্গিত দ্বারা পূরণ করা ভালো। কিন্তু এই একই তথ্য কথ্যভাষায় লিখিত হলে অশ্লীলরূপে প্রতীত হবে।

এছাড়া যে সত্য প্রবন্ধাকারে লেখা যেতে পারে তা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মুখে অশ্লীল শুনায়। উপন্যাস, কাহিনী এবং কবিতায় যৌন আলোচনার স্থান নেই। কারণ এইগুলির লেখা হয়ে থাকে বিভিন্ন যুগের রুচি ও বিভিন্ন বয়সের মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য এবং

এইখানে মানুষকে বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়। যে পুস্তক পিতা-পুত্রে বা ভ্রাতা-ভগ্নীতে একত্রে পাঠ করতে অপারক তা অশ্লীল পুস্তক।

এমন অনেক শব্দ আছে যা এক দেশে অশ্লীল কিন্তু অন্য দেশে উহা শ্লীল এবং ভিন্নরূপ অর্থবোধক। শব্দ হচ্ছে ব্রহ্ম, শব্দের কোনও অর্থ হয় না—এ কথা সত্য। উহা দেশে দেশে ভিন্নরূপে প্রকট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ টিটাগড় রেল ষ্টেশনের কথা বলা চলে। দেশবালীরা উহাকে ইটাগড় বলে, কারণ টিটা উহাদের নিকট অশ্লীল শব্দ।

সাহিত্যে অশ্লীলতার স্থান নেই। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। সাহিত্য হচ্ছে—সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। কিন্তু এমন বহু সমাজ আছে। যে সমাজের ব্যক্তি মাত্রেই দৈনন্দিন জীবনে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে। কেহ কেহ বলে থাকেন যে, ঐ সমাজকে চিত্রিত করতে হলে উহাদের ঐ বাক্যগুলিও ব্যবহার করা উচিত ; কিন্তু আমার মতে তা করা উচিত নয়। কারণ, এতদ্বারা ঐ সমাজের দোষ গুণ শোয়রানো তো যাবেই না, অধিকন্তু সভ্য সমাজও এরদ্বারা পঙ্কিল হয়ে উঠবে। এমন অনেক মানব গোষ্ঠি আছে যারা অশ্লীল বাক্য কথার মাত্রারূপে ব্যবহার করে। যথা, তুমি—কিচ্ছু নয়, তোমার—এ বুদ্ধি নেই, you are a—man, ইত্যাদি। ইংরাজ টমি এবং নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা এইরূপ কথোপকথনে অভ্যস্ত। জাতি-শোধন-সভার সাহায্যে এই অভ্যাস তাদের ত্যাগ করা উচিত। এই যৌন সম্বন্ধীয় অশ্লীল শব্দ তারা গালাগালিও মনে করে না। "তেরি, তুরি" করা তাদের নিকট অধিকারের সামিল।

বেশ্যা সমাজে অশ্লীল শব্দের ব্যবহার কম হয়। অনেকের নিকট ইহা আশ্চর্য্য মনে হবে ; কিন্তু ইহা সত্য। অশ্লীলতার মধ্যে বাস করে বলে হয়তো অশ্লীলতা এরা পরিহার করে। বাহিরের চাকচিক্য দ্বারা ভিতরের দৈন্য এরা ঢেকে নেয়। তবে নিম্নশ্রেণীর বেশ্যাদের সম্বন্ধে এ

কথা প্রযোজ্য নয়। এদের পাড়ায় অশ্লীল কথা কখনও কখনও শোনা গিয়েছে।

সাহিত্যে এই বেশ্যা পল্লীর চিত্র চিত্রিত করার নিয়ম আছে। কিন্তু তা বলে এই পাড়ায় অশ্লীল উক্তিসমূহ সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না। এমন অনেক কথোপকথন এ পাড়ায় হয় যা বাক্য বিন্যাসের দিক হ'তে অপূর্ব্ব। কিন্তু তা বলে উহা সাধারণ্যে প্রচার করা চলে না। নিম্নের বিবৃতিটী হতে বিষয়টী বুঝা যাবে।

"আমি আমার উপন্যাসে বেশ্যা পল্লীর চিত্র চিত্রিত করবার জন্য এক বেশ্যা পাড়ায় যাই। রাত্রি তখন দশ ঘটিকা। কোনও এক বাড়ীওয়ালী চীৎকার ক'রে শোনাচ্ছিলেন, 'জানিস! এই কোমরে আমি—' এর পর চীৎকার করতে করতে তিনি বাক্যটী এই বলে শেষ করলেন, 'সত্তর হাজার পুরুষ ঝুলিয়েছি।' আমি শুনেছিলাম, বেশ্যারা অশ্লীল কথা কম বলে এবং বললেও তা সংযতভাবে বলে। জঘন্য অশ্লীল বাক্যও যে সাধ্যমত শ্লীলরূপে বলা যায় তা এই দিন আমি বুঝতে পারলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও উহাকে আমি সাহিত্যের উপযোগী মনে করি নি। সৎ সাহিত্যে ঐরূপ উক্তিও রুচিদোষ-দুষ্ট ও অচল।"

অশ্লীল গালিগালাজ এদেশে শোনা গিয়েছে। মানুষ রাগে দিশেহারা হলে তার অবচেতন মনের যা কিছু পাঁক তা বার হয়ে আসে। এইজন্য মানুষ না রাগলে প্রায়ই অশ্লীল গালিগালাজ করে না। "তোর ই'য়ে করি, তোর উয়ো করি বা তোর অমুকের এই করি—" ইত্যাদি গালিগালাজ নিম্ন শ্রেণীর মানুষরা এদেশে প্রায়ই ব্যবহার করে। পানোন্মত্ত অবস্থায় ভদ্রসন্তানরাও এইরূপ অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে। কারণ তাদের অবচেতন মনে এই শব্দগুলি নিহিত আছে। মদ্যপান-জনিত প্রতিরোধ-শক্তির অভাব ঘটায় তারা এই

কদর্য্য বাক্য উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়। অসৎ পরিবেশ, কুসঙ্গ এবং কুশিক্ষাই এজন্য দায়ী। এই কারণে কদাচারী ভৃত্যদের নিকট শিশু পুত্রদের ভার দেওয়া উচিত নয়। বহুক্ষেত্রে এরা এই ভৃত্যদের নিকট হতে কদাচার ও বহু অশ্লীল বাক্য উহার অর্থ না বুঝেও শিক্ষা করে।

বৈদিক যুগেও বহু অশ্লীল বাক্য অশ্লীলরূপে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু কিরূপ সাবধানতার সহিত উহা সাহিত্যে স্থান পেতো তা বৈদিক যুগের নিম্নোক্ত শ্লোকটী হ'তে বুঝা যাবে।

"যকাঽসকৌ শকুন্তিকা হলগিতি বঞ্চতি।
আহন্তি গভে পসো, নিগল্গলীতি ধারকা ॥"

শ্লোকটী শুক্ল যজুর্ব্বেদ ২৩।২২ অশ্বমেধ পর্ব্ব, নিহত অশ্ব সম্পর্কে উক্ত হয়েছে। শ্লোকটীতে 'গভে' রূপ একটী শব্দ দেখা যায়। আসলে ঐ শব্দটী 'গভে' নয়, উহার আসল রূপ 'ভগে'। 'ভগে' শব্দ দ্বারা ঐ যুগে স্ত্রী-যোনি বুঝাতো। অশ্লীলতা বিধায় ঐ 'ভগে' শব্দটী মন্ত্র উচ্চারণের সময় 'গভে' বলিয়া উচ্চারিত হতো। এই মন্ত্রটী একটী যাদু মন্ত্র। অশ্বের কর্ত্তিত লিঙ্গটী মন্ত্রপূতঃ করে বন্ধ্যা স্ত্রীগণ যোনির মধ্যে স্থাপন করে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করলে না'কি সহজেই সন্তান সম্ভাবনা হতে পারতেন।

বৈদিক ঋষিগণ এইগুলিকে 'বর্ণবিপর্য্যয়' নামে অভিহিত করেছেন। এই বর্ণবিপর্য্যয় বা উল্টা খেউড় আমরা বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থের বহু শ্লোকে দেখতে পাই। অপরিহার্য্য অশ্লীলতা পরিহার করবার জন্যই এইরূপ উল্টা লিখনের প্রয়োজন হয়েছে।

এদেশে মেয়েদের ভূতে পেয়েছে—এমন কথা শোনা গিয়েছে। এই অবস্থায় ওঝা বা রোঝা নামক গ্রাম্য গুণীণদের ডেকে এই ভূত ঝাড়ানো

বা নামানো হয়। এই সকল ওঝাদের মন্ত্রে বহু অশ্লীল কথা থাকে। কিন্তু এই মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা কন্যাদের (কুমারী, বিধবা প্রভৃতি) নিরাময় হতেও দেখা যায়। আসলে ওদের ভূতে পায় না। ভূত বলে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই। আসলে ঐ কন্যাগণ এক প্রকার হিষ্টীরিয়া বা মানসিক রোগে ভুগে থাকেন। যৌন অবনমনের (Sex Supression) কারণে এই রোগের উৎপত্তি হয়েছে। এই অশ্লীল বাক্-প্রয়োগ পরোক্ষে যৌন-তৃপ্তি (Sublimation) আনয়ন করে। মাত্র এই কারণেই এরা এইরূপে নিরাময় হয়েছে। অশ্লীল বাক্য রোগীদের অন্যমনস্ক করতেও (Diversional Theropy) সক্ষম। চিন্তার গতি ভিন্নমুখী হওয়ার জন্যেও বহু মানসিক রোগী নিরাময় হতে পেরেছে। এইজন্য পাগলামীর চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ামাত্র পূর্ব্বে পাগলকে প্রহার করার রীতি ছিল।

সাপে কামড়ানোর মন্ত্রের মধ্যেও বহু অশ্লীল শব্দ শোনা যায়। বহু ক্ষেত্রে সাপ কামড়ায় না বা কামড়ালেও তারা বিষ নির্গত করে না। ছুটে পালাবার সময়ও বহু লোকের পা ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। কিন্তু অন্ধকারে তা না বুঝে লোকে ভীত হয়ে পড়ে। তার মনে হয় এই বুঝি সে শেষ হয়ে এলো, ভয়ে বিকৃতমনা হয়ে সে ঝিমিয়ে পড়ে। অশ্লীল বাক্য তার অচেতন মনকে অন্যমনস্ক করে দেয়। কিছুক্ষণ পরে সে সত্যই আর যন্ত্রণানুভব করে না। আঘাত সামান্য হলে তার যন্ত্রণা এমনিই দূর হয়ে যায়। মনের ভয় চলে গেলে সে সহজেই নিরাময় হয়ে উঠে।

কোনও কোনও ঝাড়ফুঁককারিগণ এই অশ্লীল মন্ত্র উচ্চারণের সময় কুমারী কন্যাদের সম্মুখে বসে থাকতে বলেছেন। এই মন্ত্র কুমারীদের সম্মুখে উচ্চারিত না হ'লে না'কি তা কার্য্যকরী হবে না। কিন্তু বিষয়টী যতই বিসদৃশ হোক, উহাতে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। পূর্ব্বেই

বলেছি যৌন অবনমনের কারণে মানসিক রোগসমূহ জন্মে থাকে। এই অবস্থায় কুমারী কন্যা দর্শন এবং অশ্লীলতা শ্রবণ একত্রে অবচেতন মনকে তৃপ্ত ক'রে রোগীকে নিরাময় করে। বিজ্ঞ ওঝারা মন্ত্রের এই অশ্লীল বাক্যের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সচেতন থাকে। এইজন্য উচ্চারণের সময় রোগী ব্যতীত [কুমারী কন্যাগণ সহ] অপর সকলকে কানে আঙুল দিতে বলা হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে, যে ছেলেদের পেত্নীতে এবং মেয়েদের ভূতে পায়। ধর্ম্মপ্রাণা বিধবাদের ভর করে ব্রহ্মদৈত্য। আমার মতে এই রোগের একমাত্র কারণ Sex Supression বা বিবিধ প্রকার যৌন অবনমন। নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমি অমুক বিধবা নারীকে ভূতে পেয়েছে শুনে অকুস্থলে এসে হাজির হই। এই সময় একজন গ্রাম্য গুণীণ বা ওঝা তাকে ঝাঁড়-ফুঁক করছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, মন্ত্রের অশ্লীল কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে একটু একটু করে কন্যাটি নিরাময় হয়ে উঠছে। বুঝলাম যৌন অবনমনই এর একমাত্র কারণ। সাধারণভাবে অশ্লীল কথা কাউকে শোনানো সম্ভব নয়। কিন্তু মন্ত্রের ভান করলে তাতে কেউ আপত্তি করে না। অজ্ঞ ওঝারা এই বৈজ্ঞানিক সত্য কিরূপে অবগত হলো তা ভেবে আমি অবাক হই।"

বহু ব্যক্তি মনোমৈথুনের দ্বারাও মানসিক রোগ হতে নিরাময় হয়েছে। আবার এমন রোগীও দেখেছি যে গোপন যৌন বিষয় একটু একটু করে প্রকাশ করে নিরাময় হয়েছে। একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিকটই এরা এই সকল গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে—এই কারণে সহানুভূতিশীল অন্তরঙ্গ বন্ধুরাই বহু পাগলকেও ভালো করতে পেরেছেন। কথোপকথনের মধ্যে অন্যমনস্ক থাকাকালে কেউ যদি

হঠাৎ অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে, তা'হলে উহা যত সহজে আমাদের কর্ণগোচর হয় তত সহজে কোনও শ্লীল বাক্য আমাদের কর্ণগোচর হয় নি। এই বিশেষ মতবাদের ইহা একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বহু ক্ষেত্রে অহেতুক অশ্লীলতাবোধ মানুষের কিরূপ ক্ষতির কারণ হয় তা নিম্নের বিবৃতি মূলক দৃষ্টান্তটি হতে প্রণিধানযোগ্য।

"আমাদের গ্রামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর বহু বিসদৃশ ব্যবহার আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত করেছে। তিনি প্রায়ই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠতেন। কিন্তু তিনি ভূত বিশ্বাস করলেও জাগ্রত অবস্থায় কখনও ভয় পান নি। আমি তাঁর এই বিসদৃশ ব্যবহারসমূহের কারণ জানবার জন্য তাঁর মনোবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই।

এই উদ্দেশ্যে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—'আচ্ছা দাদামশাই, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন ; সত্যই কি ভূত আছে ?' দাদামশাই বিরক্ত হ'য়ে উত্তর করলেন, 'নেই মানে ইংরাজী শিখেছো, তাই বিশ্বাস করো না। শোন তবে বলি। এ আমার জীবনের এক হারানো অধ্যায়।' দাদামশাই এর পর তাঁর জীবনের এক কাহিনী বলতে সুরু করলেন—"দেখ, আমি তখন বালক। সিপাহী যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। পাটনা থেকে হালিসহরের নিজ বাড়ীতে আমরা ফিরে এসেছি। প্রকাণ্ড দু'মহলা বাড়ীটাতে আমাকে ও পিসিমাকে রেখে বাবা কর্ম্মস্থলে চলে গেলেন। এর পর আমি গ্রামের এক স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে পড়লাম। আমাদের বাড়ীর বার মহলটা ভেঙে পড়েছিল। এবং তার প্রাঙ্গণটা পেয়ারা ও আতা গাছে ভরে গিয়েছে। একদিন পিসিমা ওবাড়ীর উঠান থেকে চীৎকার করে উঠলেন—'ওমা-আ!' আমি ছুটে গিয়ে দেখি পিসিমার হাতের আঙশী হাতেই আছে। তার একটাও পেয়ারা পাড়া হয় নি। তিনি মাথা নীচু করে অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে অন্দর মহলে এনে বুড়ী ঝি'মার কাছে রেখে ঐ

মহলে ফিরে গিয়ে যা দেখি তাতে অবাক হয়ে যাই। পাশের বাড়ীর ছোট্ট মেয়ে পুঁটী লাল পেড়ে শাড়ী প'রে ঐ গাছটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। এই পুঁটী ছিল আমার বাল্য সাথী। কাঁচা সোনার মত তার গায়ের রঙ। তার গড়নও তেমনি সুন্দর। এর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা-বার্ত্তা চলছিল ; এমনি সময় আমরা নৌকা করে পাটনায় চলে যাই। এর এক বছর পর আমি শুনতে পাই পুঁটী মারা গিয়েছে। পুঁটীকে এখানে সশরীরে অবস্থান করতে দেখে আমি ভীত হয়ে পড়ি। পুঁটী নেমে এসে খপ করে আমার হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'কি-ই গো, দুষ্টু ছেলে! ভালো আছো?' এর পর আমরা দুজনে বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে ত্রিতলের চাতালে উঠি। এইখানে একটা পুরাণো কাঠের সিন্দুক রাখা ছিল। এই সিন্দুকের উপরে দুজনে পাশাপাশি বসে কত গল্প করলাম। সেও আমাকে কত আদর করলে, আমিও তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। দুজনায় এতো ঘনিষ্ঠতা সত্বেও এই কথা কাউকে আমি প্রকাশ করিনি। স্কুল থেকে ফিরেই খাবারের থালা হাতে নিয়ে আমি উপরে উঠে এসেছি। তারপর ভাগাভাগি করে এই খাবার খেয়েছি। দুজনে কতো গল্প করেছি, চুম্বন, আদর, সোহাগও। তার পর আমরা নিচে নেমে এসেছি। দিনগুলো আমাদের সুখেই কাটছিল। কিন্তু মাস তিন পর পুঁটী বললে, এইবার তার ডাক এসেছে, তাকে চলে যেতে হবে। যাবার আগে সে নখ দিয়ে আমার বাম বাহুটা চিরে দিয়ে সেখানে ছর্‌রার মত কয়েকটা কি পুরে দিলে।"

[ভদ্রলোক উৎসাহের সহিত গল্প বলছিলেন। কিন্তু যৌন-সম্ভোগের বিষয় বলবার সময় তাঁর স্বর কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল। তিনি যেন একটু লজ্জিত হলেন ; এতক্ষণ যা তিনি মনেপ্রাণে সত্য বলে উপলব্ধি করছিলেন, এইবার তার মনে হলো যে এইগুলি মিথ্যা গল্প। তাঁর

এ'ও মনে হলো যে আমরা তার এই গল্প বিশ্বাস করছি না। অর্থাৎ এই যৌন সম্বন্ধীয় উক্তির সহিত তিনি আত্মস্থ হয়ে মিথ্যা ভাষণ রোগ হ'তে নিরাময় হচ্ছিলেন। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি গল্পটী শেষ করলেন।]

এই পর্য্যন্ত শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সে কি দাদামশাই! লাগলো না আপনার?'—'না লাগেনি', দাদামশাই বললেন, 'হাতের প্রলেপ দিয়ে সে ভালো করে দিলে।' তাতে মনে হলো যেন কিছুই হয় নি। এর পর সে মিলিয়ে যেতে যেতে বললে, 'ঐ ঔষধ থাকাকালীন আমাকে ভূতে কিছু করতে পারবে না।' পুঁটী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈশান কোণের তালগাছটাও মড় মড় করে ভেঙে পড়লো। সেই গাছটা ঐ ভাবে এখনও সেখানে আছে।"

বাল্যকালে দাদামশায়ের বাহুতে ছর্‌রার গুলি লেগেছিল। সবগুলি ডাক্তার বার করতে পারে নি। ভদ্রলোক ঐগুলি স্পর্শ করে আমাদের বিষয়টী বিশ্বাস করতে অনুরোধ করলেন। দাদামশাই যে মিথ্যে বললেন তাও নয়। ঐ অলীক কাহিনীটী তাঁর জীবনে সত্যই ঘটেছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা এইরূপ মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

[এক্ষণে আমার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে এই যে, বাল্যে ও যৌবনে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা তিনি অশ্লীলতার ভয়ে কখনও ব্যক্ত করতে পারেন নি, তা বার্দ্ধক্যের দুয়ারে এসে মিথ্যা ভাষণের দ্বারা তিনি বার করে দিতে চাইছিলেন। ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের এক বৃদ্ধা ভগ্নীর মুখে শুনেছিলাম যে, পুঁটী নামে একটী মেয়ের সহিত সত্যই তাঁর বিবাহের কথা হয়েছিল, কিন্তু সে মারা যাওয়ার পর তিনি আর বিবাহ করতে রাজী হন নি। এর পর হতে তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী হয়ে উঠেন। এবং তাঁর মধ্যে

বহু বিসদৃশ ব্যবহার দৃষ্ট হতে থাকে। আমরাও তাঁর মধ্যে বহু অত্যদ্ভুত ব্যবহার পরিলক্ষ্য করেছি। এই থেকে বুঝা যাবে যে আমরা যদি আমাদের কোনও স্বাভাবিক স্পৃহা বহিষ্কার না করে প্রদমিত করি তা হলে তা ভলকাণিক পদার্থের মত একদিন বহির্গত হয়ে আমাদের ক্ষতির কারণ হয়।]

আমি এমন দুই একজন হিষ্ট্রিক রোগীর সংস্পর্শে এসেছি, যাদের ধারণা ছিল কোনও বালিকা-ভূত রাত্রিকালে মনুষ্যাকারে তাদের সহিত সহবাস করে থাকে। এই প্রকার মনোমৈথুনের দৃষ্টান্ত মনুষ্য সমাজে বিরল নয়। কোনও কোনও দুর্ব্বৃত্ত ঘুমন্ত রোগিণীদের এই সুযোগে ধর্ষণও করেছে। সন্তান সম্ভাবনা হলে এরা এই দুর্ব্বৃত্তদের দোষী না করে ব্রহ্মদৈত্য, দেবতা আদিকে এজন্য দায়ী ক'রে বিবৃতি দিয়েছে। মনের বিচ্ছিন্নতার জন্য এই সকল রোগ জন্মে থাকে। যৌন অবনমনই যে এই রোগের মূল হেতু তা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন।

গ্রাম্য ওঝাগণ অশ্লীল বাক্য যুক্ত মন্ত্র দ্বারা এই মনোরোগ সহজেই নিরাময় করেছেন। হিষ্ট্রীয়া রোগ এবং বাই ও নিউরেটীক রোগও এই মন্ত্র দ্বারা সমভাবে সারানো সম্ভব। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে কর্ম্মব্যস্ত মানুষের কর্ণে কোনও শব্দ বা বাক্য প্রবেশ করে না। কিন্তু ঐ শব্দ বা উক্তি অশ্লীল হলে উহা তৎক্ষণাৎ শ্রুত হয়ে থাকে। উহা স্মেলিঙ সল্ট শিশির আঘ্রাণের বা চাবুকের ঘাএর ন্যায় কার্য্যকরী হয়। মানুষের কৃষ্টির তারতম্য অনুযায়ী কম বা বেশী অশ্লীল শব্দ প্রয়োগের রীতি আছে। সেই জন্য ওঝাগণ একটী মন্ত্র কার্য্যকরী না হ'লে অপর একটী মন্ত্র উচ্চারণ করেন। এমন বহু অবুঝ ও অলস ব্যক্তি আছেন, যাদের কাজকর্ম্মে রত করা যায় নি। কিন্তু অশ্লীল গালাগালি এদের মধ্যে সাড়া এনে দিয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে ইহা উত্তেজনক

আরকের কাজ করেছে। মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মন বিচ্ছিন্ন হলে বাহিরের কোনও বাক্য বা শব্দ তাদের নিকট শ্রুত হয় না। ভয়ের বা ভক্তির পাত্রদের দুই একটী কথা এরা শুনলেও প্রিয়জনদের কোনও কথাই শুনেনি। কিন্তু তা সত্বেও প্রতিটী অশ্লীল বাক্য তাদের অবচেতন মন শুনতে পায়। এবং ইহা তাদের জাগ্রত ক'রে আত্মস্থ ক'রে দেয়। এইভাবে তারা তাদের প্রকৃত সত্বা বা আত্মা (Normal Self) ফিরে পেয়েছে।

এদেশ তন্ত্র মন্ত্রের দেশ। বহুবিধ মন্ত্র এদেশে প্রচলিত আছে। দৈহিক রোগ নিরাময়ের জন্যও মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একমাত্র সাপ, ভূত এবং মানসিক রোগের মন্ত্র ব্যতীত কুত্রাপি অশ্লীল শব্দ দেখা যায় নি। অনিসন্ধিৎসুক ছাত্রদের এই সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হওয়া উচিত।

কিন্তু ভূতে পাওয়া রোগীদের এইভাবে নিরাময় করা হলেও যাদের উপর দেবতার ভর করেছে তাদের ঐভাবে নিরাময় করা হয় নি। এই সকল রোগীরা বহুকাল ধরে অকারণে ভুগে এসেছে। এই "পাওয়া" "ভর করা" প্রভৃতি মানসিক রোগ এবং উহার কারণ সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রায়শঃক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, অশ্লীল বাক্য প্রয়োগে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা কার্য্যক্ষেত্রে উহা কখনও প্রয়োগ করেন নি, বরং তারা নারী দর্শন মাত্র বিশেষরূপে সংযত হয়ে তাদের অতীব সম্মান দেখিয়েছে। তাদের স্বভাব চরিত্রও ভালো হয়। এবং তাদের স্বাভাবিক (Narmal) মানুষরূপে দেখা যায়। তবে এ কথাও ঠিক যে তাদের দ্বারা উচ্চ ধরণের কোনও কর্ম্ম এ পর্য্যন্ত সাধিত হয় নি। প্রায়শঃক্ষেত্রে এরা এক প্রকারের অলস প্রকৃতির মানুষ হয়েছে।

[আমি এই অশ্লীল শব্দযুক্ত সাপের ও ভূতের মন্ত্র সকল অতি কষ্টে

সংগ্রহ করেছি। আমার বিশ্বাস, এর দ্বারা উগ্র মানসিক রোগসমূহ সারানো সম্ভব। এই শব্দগুলি যে সুচিন্তিত ভাবে সঙ্কলিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ সম্বন্ধে কারো আগ্রহ থাকলে আমার সহিত সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। অশ্লীল দোষ দুষ্ট হওয়ায় এইগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা সম্ভব হলো না।]

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি অবিশ্বাসী মানুষই করেছে, বিশ্বাসী মানুষ এই সম্বন্ধে কিছুই করতে পারে নি। সকলে যা বিশ্বাস করে সে তা করে না। এইজন্যই মনে সে একপ্রার অশান্তি অনুভব করে। সে আবিষ্কার করতে চায় প্রকৃত সত্য। সন্দেহের সে নিরাময় করতে চায়। এইভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ গড়ে উঠে। এবং এই সত্য বহু ক্ষেত্রে নিরক্ষর বা অজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারাও উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কামশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি বাৎস্যায়ন নিজে বিবাহ করেন নি—স্ত্রী সংসর্গও করেন নি তিনি। অথচ তিনি কামশাস্ত্র লিখেছেন। বিবাহ বা স্ত্রী সংসর্গ করলে তিনি এমনি মশগুল হয়ে যেতেন যে এই সকল চিন্তা তাঁর মনে উদয়ই হতো না। এডিসন সাহেব গ্রামোফোন আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু শুনা যায় যে, তিনি নিজে ছিলেন বধির। এইজন্য তিনি কর্ণের চিকিৎসা পর্য্যন্ত করাতে রাজী ছিলেন না। এর দ্বারা তাঁর একাগ্রতা হ্রাসের সম্ভাবনা ছিল। এই কারণেই হয়তো মন্ত্র সম্বন্ধীয় এই সত্যসমূহ এদেশের কোনও অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী ব্যক্তি প্রথম আবিষ্কার করেছে। বস্তুতঃপক্ষে এদেশের ঝাড়-ফুঁক-কারী ওঝারা নিজেরা ভূত বিশ্বাস করে না। তাহারা বাহিরে যা'ই বলুক নিজেরা উহাকে রোগ বলে স্বীকার করেছে। আমি কোনও এক দেশীয় ওঝাকে জিজ্ঞাসা করি, 'বাপু, ভূত আমাকে দেখাতে পারো?'— 'নিশ্চয়ই পারি', বলে সে আমাকে নিয়ে বনে বাদাড়ে ও শ্মশানে শ্মশানে

কয়েক রাত্রি ঘুরে শেষে নাচার হয়ে বলেছিল, 'বাবুজী, আপনি যদি ভূত না বিশ্বাস করেন, তা'হলে কি তা কেউ আপনাকে দেখাতে পারে? ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না আমার কাছ শুনুন—ও সব মিথ্যে।'

অশ্লীল বাক্যের ন্যায় অশ্লীল ব্যবহারও কার্য্যকরী হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটী য়ুরোপীয় উদাহরণ উদ্ধৃত করলাম।

"কোনও এক ষোড়শী কুমারী কন্যার দক্ষিণ হস্তটি অসাড় হয়ে যায়। সে চেষ্টা ক'রেও হাতটি আর উঠাতে পারে নি। চিকিৎসাতেও কোন ফল হয় নি। এর পর এঁকে মানসিক রোগের হাসপাতালে আনা হয়। একজন যুবক ডাক্তার এগিয়ে এসে হঠাৎ তাকে আলিঙ্গন ক'রে চুম্বন দিয়ে দিলেন। কন্যাটী ক্রুদ্ধ হয়ে তার ঐ ডান হাতটি তুলেই ঐ ডাক্তারের গণ্ডে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল। এতদিন যে রোগ সারে নি, তা একদিনেই সারতে দেখে সকলে অবাক হয়। এর পর কন্যাটীর ঐ ডাক্তারের সহিতই বিবাহ হয়।"

মানুষ যত রোগে ভুগে তার মধ্যে মনের রোগই বেশী। বহুক্ষেত্রে মনের রোগই দৈহিক রোগরূপে চালু হয়েছে। বহু লোক অন্ধ হয়েছে দৈহিক কারণে নয়। তারা মানসিক কারণে দৃষ্টি সুখে বঞ্চিত হয়েছে। এক প্রকার পক্ষাঘাত সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলা চলে।

এই সম্বন্ধে প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক শ্রীকালী বাগচীর একটি বিবৃতি প্রণিধানযোগ্য। কাহিনীটি আমি তাঁর পুত্র অপূর্ব্ব বাগচীর নিকট শুনেছি। তবে কিছুদিন পরে স্বাভাবিক কারণে চক্ষু সম্পর্কীয় সূক্ষ্মস্নায়ু ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত হওয়াও অসম্ভব নয়।

"আমার নিকট এক চক্ষু রোগী আসে। সে একেবারেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি অভিমত জানাই ঈশ্বরের দয়া ভিন্ন দৃষ্টি তার ফিরবে না। এর প্রায় পাঁচ বৎসর পর সে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে জানালো যে, সে

নিরাময় হয়ে গিয়েছে। সে বলে যে প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে এক রাত্রে চীৎকার শুনে সে জেগে উঠে। বার হতে একজন চেঁচিয়ে বলছিল, 'আগুন আগুন, শীঘ্র বার হয়ে আসুন।' আমি ভীত ত্রস্তভাবে বেরিয়ে এসে প্রথম লক্ষ্য করি যে ঘরের মটকাগুলো দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। এই হতে আমি দৃষ্টি শক্তিও ফিরে পাই। দেখবার এক দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাই হয়তো আমাকে নিরাময় করেছে। কিংবা ঐ সময় আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে আমার দৃষ্টি শক্তি অটুট আছে। আমি পূর্ব্ব অবস্থা ভুলে গিয়ে তাই চোখ মেলে আগুন দেখেছি।"

অশ্লীলতার সহিত বিষের তুলনা করা চলে। পৃথিবীতে নিরাবিল অমঙ্গলের জন্য কোনও কিছু সৃষ্টি হয় নি। তাই উগ্র বিষও ক্ষেত্র বিশেষে অমৃত হয়ে উঠে। ব্যবহারের গুণে অশ্লীলতাও ঔষধের কার্য্য করে। এই অশ্লীলতা পৃথিবীর আদিম সৃষ্টি। অভ্যাস দ্বারা সভ্যতার কারণে মানুষ তাকে আজ গোপন করেছে; অশ্লীলতা পরিহার ও বর্জ্জনের সহিত গড়ে উঠেছে ধর্ম্ম, কলা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, কিন্তু তার অবচেতন মন হ'তে সভ্য মানুষ আজও পর্য্যন্ত একে দূর করতে পারে নি।

পণ্ডিতগণ অশ্লীলতাকে সৃষ্টির গোপনতম ডাক ব'লে অভিহিত করেন। কারণ অশ্লীল হ'তে শ্লীলের, অসুন্দর হতে সুন্দরের উৎপত্তি হয়েছে। ত্যাগ যদি কোথাও থাকে তা ভোগের মধ্যেই আছে। তাই সাধুগণ বলে থাকেন—অশ্লীলের মধ্যেই শ্লীল এবং ভোগের মধ্যে ত্যাগ আছে।

আত্মহত্যা

আত্মহত্যা অপরাধ কি'না এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এদেশে আত্মহত্যা অপরাধ নয়, কিন্তু আত্মহত্যার প্রচেষ্টা অপরাধ। দৈবক্রমে বেঁচে গেলে এই সকল ব্যক্তির শাস্তি হয়। বিলাতে আত্মহন্তারকের সম্পত্তি সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করেন। জাপান প্রভৃতি কয়েকটী দেশে আত্মহত্যা অপরাধরূপে বিবেচিত হয় নি। আত্মহত্যা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—(১) স্বরোগ বা রোগ প্রসূত, (২) নীরোগ বা রোগ প্রসূত নয়। নীরোগ আত্মহত্যার মধ্যে আদর্শ থাকে এবং উহা উদ্দেশ্য বিহীন হয় না। আত্মরক্ষার্থে এবং রাজনৈতিক ও ধর্ম্মীয় কারণে এই নীরোগ আত্মহত্যা সাধিত হয়েছে।

প্রথমে নীরোগ বা আদর্শগত আত্মহত্যা সম্বন্ধে বলবো। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ জাপানে প্রচলিত "হারিকিরির" কথা বলা যেতে পারে। এই হারিকিরি-রূপ আত্মহত্যা ঐ দেশে গৌরবের বিষয়। রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে ঐ দেশের সাহসী ব্যক্তিরা বহুক্ষেত্রে হারিকিরি করেছেন। আদর্শ জনিত আত্মহত্যাকে "হারিকিরি" বলা হয়। এইজন্যই বোধ হয় উহা ঐ দেশে অপরাধরূপে প্রতীত হয় নি। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে যে সকল কাজ দেশ তথা সমাজের ক্ষতি করে তা'কে বলা হয় অপরাধ। কিন্তু আদর্শ (Idealism) জনিত সকল কাজই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমাজের উপকার করেছে। কোনও কারণে অবশ্য যদি এই আদর্শ—ভুল পথে পরিচালিত না হয়। হারিকিরির মধ্যে আদর্শ থাকায় ইহা নিশ্চয়ই জাপানের মঙ্গলকর হয়েছে, তা না হলে দুর্দ্ধর্ষ জাপানী সৈন্যের সৃষ্টি সম্ভব হতো না। আজও পর্য্যন্ত জাপানে Suicide

Corps বা আত্মহন্তারক বাহিনীর জন্য যুবকের অভাব হয় না। এর কারণ হারিকিরি জাপানে ধর্ম্মীয় রূপপ্রাপ্ত হয়েছে। কিরূপ উৎসাহের সহিত এই আত্মহত্যা সমাধিত হয় তা ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্র অবগত আছেন। এরা সরল ভাবে দাঁড়িয়ে ছুরী দিয়ে তাদের উদরে লতাপাতা পাখী প্রভৃতি চিত্রিত করতে থাকে যতক্ষণ না তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ে যায়। অনেক সময় ভাবপ্রবণতার জন্যেও এরা হারিকিরি করেছে। কোনও এক কৃষক অজ্ঞতা বশতঃ তার এক পুত্রের নাম রেখেছিল মিকাডো। একদিন সে জানলো যে তাদের সম্রাটের নামও মিকাডো। তখন সে ক্ষোভে ও গ্লানিতে দগ্ধ হয়ে উঠলো। যে কোনও কারণে হোক তার ধারণা হয়েছিল যে সে এতদ্বারা তাদের প্রিয় সম্রাটের অবমাননা করেছে। সকলেই জানেন যে জাপানী মাত্রের নিকট জাপ-সম্রাট ঈশ্বরের অবতার। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সে তক্ষুণি ঐ পুত্রকে নিহত করে নিজে হারিকিরি করেছিল। যদি কোনও জাপানী মনে করে যে সে সম্রাটের বিরক্তির কারণ হয়েছে, কিংবা তার কার্য্যদ্বারা সাম্রাজ্যের ক্ষতি করেছে তা হ'লে তারা এই হারিকিরির আশ্রয় নিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কোনও কোনও জাপ-সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রীরাও হারিকিরি দ্বারা তাঁর অনুগমন করেছেন। কোনও কোনও জাপানী সৈন্য যুদ্ধে বন্দী হওয়া অপেক্ষা হারিকিরি করা শ্রেয় মনে করেছে। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বক্তব্য বিষয়টী বুঝা যাবে।

"সিঙ্গাপুরের পথে একদল জাপানী সৈন্যের গোপন অবস্থানের সন্ধান পেয়ে আমরা তাদের অনুসরণ করি। এই সময় আমরা একজন সৈন্যকে আগ্নেয় অস্ত্রসহ একটী বৃক্ষের উপর দেখতে পাই। আমরা তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষটী ঘেরাও করে তাকে নেমে আসতে বলি। ইতিমধ্যে তার ষ্টেনগানের শেষ গুলিটীও নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। উত্তরে জাপানী সৈন্যটী

আমাদের জানালো, দাঁড়ান, নামছি আমি। কিন্তু নেমে এসে সে একটী ছুরি বার করে সেটী তার উদরে প্রবেশ করিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে তার প্রাণবায়ু বার হয়ে গেলো। আমরা স্তম্ভিত হয়ে তার এই মহাপ্রয়াণ লক্ষ্য করেছিলাম।"

আদর্শজনিত আত্মহত্যা ভারতের এই পুণ্যভূমিতেও নানারূপে প্রচলিত ছিল। এবং নানা বিধি নিষেধ সত্বেও আজও পর্য্যন্ত তা প্রচলিত আছে। ভারতে প্রচলিত আদর্শ জনিত আত্মহত্যা বহুপ্রকারে সমাধিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—সতীদাহ, জহরব্রত, নিগমন প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা বাক্-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এদেশের মেয়েদের সহজেই আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। এইজন্য এদেশের মেয়েরা পুরুষ অপেক্ষা আরও সহজে আত্মহত্যা করেছে। এইজন্য এই প্রবন্ধে এই প্রাচীন কালীন আত্মহত্যা সম্বন্ধে আমি বিশদরূপে আলোচনা করবো।

(১) জহরব্রত—ভারতের প্রচলিত এই রীতি ভারতের এক গৌরবের বস্তু। আত্মরক্ষার কারণে আপন আপন সতীত্ব ও সম্মান রক্ষার্থে যুগে যুগে ভারতীয় সাধ্বী ললনারা এই ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। ভারতীয় নারীগণ তাঁদের সতীত্ব এবং সম্মানকে জীবনের বহু উর্দ্ধে স্থান দিয়ে থাকেন। নিজের, স্বামীর বা পুত্রের জীবন বিনিময়েও এরা সতীত্ব ও সম্মান হারাতে কখনও রাজী হন নি। ভারতীয় ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বর্ব্বর বিদেশী আক্রমণকারিগণ বারে বারে এই পুণ্যদেশ আক্রমণ করেছে। এদেশীয় বীরপুরুষগণ নানাকারণে সকল ক্ষেত্রে এদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় নি। এই সকল নর-রাক্ষসগণ নগর ও জনপদ এবং প্রাসদাদি অধিকার ক'রে প্রথমেই নারীর উপর অত্যাচার সুরু করেছে। এই কারণে এদেশের সতীসাধ্বী ললনাদের

পূর্ব্বাহ্নেই আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায়ও ছিল না। স্বামী-পুত্রকে যুদ্ধে পাঠিয়ে এরা আকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করতেন। এবং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝলে এরা এই জহরব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। এদের সকলে যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন তা নয়, কেউ কেউ স্বামী-পুত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধে নেমে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু একথা ঠিক যে তাঁরা কোনও ক্রমেই নিজেদের পূত দেহ শত্রুকে স্পর্শ করতে দেন নি।

এইবার এই জহরব্রতের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা যাক্। সাধারণতঃ প্রাসদ বা গৃহ প্রাঙ্গণে একটী বিরাট কুণ্ড বা গুহ নির্ম্মিত থাকতো। প্রয়োজনবোধে এই কুণ্ডে কাষ্ঠ স্থাপন করে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে। বিপদ বুঝে সতীত্ব রক্ষার্থে দলে দলে ভারতীয় ললনারা এই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন। রামচরিত অনুসারে এইরূপ অগ্নিকুণ্ডে প্রথম প্রবেশ করেন রামায়ণোক্ত সীতা দেবী আত্ম-পরীক্ষার্থে। পরবর্ত্তী যুগে ভারতীয় ললনারা আত্মরক্ষার্থে এই রামায়ণোক্ত প্রথাই বেছে নিয়েছিলেন।

এদেশে বহু যুদ্ধ-ব্যবসায়ী শ্রেণী ছিল যারা যুদ্ধস্থলে আপন আপন পরিবারবর্গকেও নিয়ে যেতেন। স্বল্প দূরে নিরাপদ স্থানে শিবিরে আপন আপন স্ত্রী-পুত্রকে রেখে এরা যুদ্ধে যেতেন। নিজেদের বীরত্ব এবং সাহসের উপর আস্থা থাকার কারণে এই রীতি এদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। এক রাজা অপর রাজার সহিত যুদ্ধে এদের প্রায়ই আহ্বান করতেন। ভারতের যুদ্ধে জয়পরাজয়ের জন্য নারীর সম্মানের কখনও হানি ঘটেনি। এই ব্যাপারে ভারতের কৃষক শ্রেণীর এবং ব্যবসায়ীদেরও কোনও অসুবিধা হয় নি। স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধে এজন্য তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু যবন আক্রমণের সময় এই প্রথায় বিপদ ঘটে। এইজন্য কোনও এক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর স্ত্রী-পুত্রকে এদের স্বহস্তে নিধন করতে

হয়েছিল। তা না হলে এদের অনেককেই অপহৃত বা ধর্ষিত হতে হতো। এই সকল বীর যোদ্ধদলের বহু নারী এই সময় অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন।

চিতোর নগরীর পতনের পর মহারাণী পদ্মিনী দেবী তাঁর পরিবারবর্গ এবং সহচরীগণসহ এইরূপ জহরব্রত দ্বারা আপন আপন সতীত্ব ও পারিবারিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ভারতীয় ইতিহাসের ইহা এক স্মরণীয় ঘটনা। টড্ সাহেবের রাজস্থানে ইহার উল্লেখ আছে। বিদেশীয় কামলুব্ধ নৃপতি ও সৈন্যগণ যখন ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করলো, তখন সেখানে একখানি তরবারিও তাদের বাধা দেয় নি। কারণ বাধা দেবার জন্য কেহই সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। ঐ স্থানে পুরুষমাত্রই বহু শত্রু নিধন করে নিজেরাও একে একে নিহত হয়েছে। কিন্তু রমণীগণ গেল কোথায়? বিদেশী সম্রাট জনমানব শূন্য কক্ষগুলির মধ্য দিয়া অগ্রসর হতে থাকেন; স্ত্রী বা পুরুষ, কোনও মানুষই তাদের গতিরোধ করে নি। পরিশেষে প্রাঙ্গণে এসে তাদের গতি সত্য সত্যই রুদ্ধ হয়ে যায়। তারা অবাক হয়ে পরিলক্ষ্য করেন যে বিরাট এক গহ্বর হতে লকলকে অগ্নিশিখা ধূম নির্গত করে কুণ্ডলীকারে উপরে উঠেছে। এর পর তাঁর বুঝতে আর কিছু বাকী থাকে নি। শত শত ভারতীয় ললনার অগ্নিদগ্ধ দেহের মাত্র ঘ্রাণ গ্রহণ করে তাঁকে ত্বরিত গতিতে ঐ স্থান ত্যাগ করতে হয়েছিল।

বঙ্গদেশে এইরূপ দুইটি ঐতিহাসিক জহরব্রত আজও পর্য্যন্ত স্মরণীয় হয়ে আছে। কোনও এক সামন্তরাজাকে একদা নবাব সরকার তলব করে পাঠান। ঐ সামন্তরাজের ধারণা হয় যে রাজধানীতে এলে তাঁকে অবাধ্যতার কারণে হয়তো নিহত করা হবে। এই কারণে তিনি একটী শিক্ষিত পারাবতকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং মহিষীদের বলে যান যদি এই

পারাবত ফিরে আসে তা'হলে তোমরা বুঝবে আমি নিহত হয়েছি। নবাব বাহাদুর কিন্তু মহাসমাদরে এই বীর বাঙ্গালী রাজার সহিত সন্ধি-স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ পারাবতটী দৈবক্রমে মুক্ত হয়ে রাজবাড়ীতে ফিরে এসেছিল। পারাবতকে ফিরতে দেখে মহিষীরা বুঝে নিলেন যে রাজা নিহত হয়েছেন, ফলে তাঁরা সকলেই জহরব্রত দ্বারা প্রাণ বিসর্জ্জন করেছিলেন। সামন্তরাজ ত্বরিত গতিতে বাড়ী ফিরে দেখলেন তাঁর প্রিয়তম মহিষীরা ইতিমধ্যেই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এর পর তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং কিছুদিন পর তিনিও প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিতীয় ঘটনাটী ছিল আরও চমকপ্রদ। বাঙ্গলা দেশের বহু অংশ মোসলেমগণ দ্বারা বিজিত হলেও উহার কোনও কোনও অংশ তখনও স্বাধীন ছিল। পশ্চিম বঙ্গের কোনও এক অংশের রাজা বারে বারে এই বিদেশী শত্রুদের পরাজিত করে শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক একদিন তিনি এক মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়ে তার বাধ্য হয়ে উঠলেন। এমন কি তাঁর সমুদয় প্রজাগণসহ একদিনেই গণধর্ম্মান্তর (Mass-conversion) দ্বারা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করতে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। কিছুতেই তাঁকে এই অপকার্য্য হ'তে নিরস্ত করতে না পারে রাজমহিষী অতর্কিতে আপন স্বামীকে নিহত করে প্রজাদের রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি জহর-ব্রত পালন দ্বারা হাসতে হাসতে প্রাণ ত্যাগ ক'রে এই স্বামী ও রাজ-হত্যা রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

অপহৃতা বা ধর্ষিতা নারীদের এইদেশে বেঁচে থাকা বা না থাকা সমান কথা। প্রায়শঃক্ষেত্রে এরা সমাজে তাদের পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা ফিরে পায় নি। সমাজ তাদের কীটদষ্ট মনে করেছে। এমন কি, ঐ নারী নিজেকেও অপবিত্র মনে করে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করেছে। এদের

কেউ কেউ ফিরে এসে স্বামীগৃহে দাসীবৃত্তি করেছে। কিন্তু তাদের স্বামীকে তার দেহ স্পর্শ করতে দেয় নি, এই ভেবে যে তার এই অপবিত্র দেহ স্পর্শ করলে স্বামীর অমঙ্গল হবে। অনেক অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারী অনাহারে থেকে বা অন্য কোনও প্রত্যক্ষ উপায়ে আত্মবিনাস করেও মানসিক যন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়েছে।

সামাজিক সংস্কার ও অশৈশব বাক্-প্রয়োগ বা শিক্ষাদীক্ষা এই অবস্থার জন্যে দায়ী। অত্যধিক সম্মান-জ্ঞান অনেক সময় মনো-বিকারেরও কারণ হয়। এই মনোবিকার হতে ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় সমাজ তথা জাতিও ভুগে থাকে। এই কারণে, সামান্য অসম্মান বা তার সম্ভাবনা এদেশের বহু নরনারীকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করে।

অন্যান্য সমাজ বা জাতির চিন্তাধারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপ বিপরীত হয়ে থাকে। নারীর ইচ্ছাকৃত পদস্খলন এঁরা সাময়িক দুর্ব্বলতা মনে করে বারে বারে ক্ষমা করেছেন। সামান্য ভৎর্সনাই এজন্য যথেষ্ট মনে করা হয়। বিধবা বিবাহ এই সকল সমাজে প্রচলিত থাকার কারণে এদের চিন্তাধারা ভিন্নরূপ থাকে। এখানে দেহের অপবিত্রতার প্রশ্ন উঠে না, প্রশ্ন উঠে অধিকারের বা উচিত অনুচিতের। ঐ দেশের বহু বধূ বা কন্যা গুপ্তচরের কার্য্যে শত্রুর সহিত সহবাস করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু এজন্য তাদের কেউ ঘৃণা করে নি বরং সম্মান করেছে।

এদেশের অনেকের ধারণা অগ্নি সর্ব্ব পাপ অপহারক। এইজন্য অনেকে পাপস্খলনের জন্যও এই জহরব্রত পালন করেছেন।

মধ্যযুগের বিদেশী যোদ্ধাদের রীতি ছিল যে কোনও এক যোদ্ধাকে নিহত করার পর তার রাজ্য দ্রব্যাদি সহ তার নারীদেরও অধিকার করা। এই রীতি ভারতীয়রা সর্ব্বকালেই ভয়াবহ ও নীতিবিরুদ্ধ মনে করেছেন। এইরূপ অবস্থায় ভারতীয় নারীদের আত্মহত্যা করা ছাড়া

উপায়ও ছিল না। এই পাপ নীতি ভারতীয়রা সর্ব্বযুগেই ঘৃণা করে এসেছেন। রাজা শিবাজীর কাহিনী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোনও এক মুসলমান রণনেতার নিধনের পর তাঁর পরমা সুন্দরী বেগমকে মহারাজ শিবাজীর নিকট আনা হলে, তিনি মুগ্ধ হ'য়ে বলেছিলেন, 'মা! আমার মা যদি তোমার মত সুন্দর হ'তো তা'হলে আমিও সুন্দর হতাম। যাও মা, তোমার গৃহে ফিরে যাও, এই হিন্দু রাষ্ট্রে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।' এর পর মহা সম্মান সহকারে এই নারীকে দিল্লী নগরীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্ম কথা। তারা নারীর সম্মান বুঝে তাই কোন অবস্থাতেই তা তারা ক্ষুণ্ণ করে নি। হিন্দু বাহিনীর কোনও সৈন্য নারীর উপর অত্যাচার করলে তাকে কঠোরতর সাজা দেওয়া হয়েছে। নারীর সম্মান হিন্দুদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তাই এরা এজন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নি। সেই দিনও নোয়াখালির কোনও যুবক তার ভগ্নীকে রক্ষা করতে অপারক হয়ে স্বহস্তে তাকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করে নি।

[নোয়াখালির ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের সময় এইরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে। আপন পরিবারস্থ নারীদের রক্ষা করতে অপারক হয়ে পিতা পুত্রীকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে বধ করতে বাধ্য হয়েছে। কোনও পরিবার আপন আপন কুটিরে অগ্নি সংযোগ করে পরিবারবর্গসহ অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নারীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। অন্য দিকে পুরুষগণ নিশ্চিত মৃত্যু বুঝেও সংখ্যাগুরু দস্যুদলকে প্রতিরোধ করতে ইতস্ততঃ করে নি।]

মহারাজ শিবাজী যুদ্ধের কারণে শঠতা বা ধূর্ত্ততার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কিন্তু যখনই তিনি বুঝেছেন যে তাঁর অধিকৃত দুর্গের পতন অবশ্যম্ভাবী এবং ঐ দুর্গের পতনের পর দুর্গের সামন্ত ও

সেনাপতিদের পরিবারবর্গের সম্মানহানির সম্ভাবনা আছে,—তখনই মাত্র তিনি রাজা জয়সিংহের পরিচালিত মোসলেম বাহিনীর নিকট পরাজয় স্বীকার করে অকারণে নিজে আত্মসমর্পণ করেছেন, কিন্তু তা তিনি করেছেন এই সর্ত্তে যে দুর্গের কুলনারীদের নিরাপদে বার হয়ে যেতে দেওয়া হবে। এই ভাবে কুলনারীগণ নিরাপদে অন্যত্র অপরসারিত হবার পর সুযোগমত পুনরায় তিনি অস্ত্রধারণ করেছেন।

সতীদাহ—এদেশের বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথা নেই, কারণ এদেশীয়দের ধারণা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল এ জন্মের নয় জন্মজন্মান্তরের ; মৃত্যুর পরও এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে—ভারতীয় মাত্রেই এই কথা বিশ্বাস করেন। নারীর পুনঃ বিবাহ এদেশীয়দের কল্পনার বাহিরে। অন্যান্য দেশে কেবলমাত্র পতি-প্রীতি আছে, কিন্তু এদেশে এই প্রীতির সহিত আছে ভক্তি। পতিগত-প্রাণা ভারতীয় নারীরা স্বামীর অবর্ত্তমানে বেঁচে থাকা প্রয়োজন মনে করেন না। এছাড়া বৈধব্য যন্ত্রণা, এদেশে সত্যই অসহনীয়। অনেকে আবার এ'ও বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যু বরণ করে এরা মৃত স্বামীর সহিত পুনর্মিলিত হতে সক্ষম। এই সকল কারণে বহু পতিব্রতা সতী নারী স্বেচ্ছায় স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেছেন। সতীদাহের অপর নাম চিতারোহণ, সহমরণ ইত্যাদি। দাহ্যমান শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা এই চিতা নিৰ্ম্মিত হয়ে থাকে। সতী রমণীগণ স্বামীর মৃতদেহ ক্রোড়ে নিয়ে ঐ চিতার উপর উপবেশন করলে পড়শিগণ ঐ চিতায় অগ্নি সংযোগ করতো। সতী রমণীগণ ধীর-স্থিরভাবে নিজেদের ঐরূপে দগ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের হৃদয় এজন্য একটু মাত্র কম্পিত হয় নি।

যে পরিবারে সতীদাহ হয়েছে সেই পরিবার অপরের ঈর্ষার পাত্র হতো। সতীর পরণে লাল চেলী, আল্‌তা এবং পায়ের ছাপ শুভ দ্রব্য-

রূপে এদেশে বিবেচিত হয়েছে। স্বর্গগতা এই সতী প্রপিতামহীদের চেলী বা পদচিহ্ন স্পর্শ করে বহু পরিবারের অধস্তন পুরুষের বালকেরা আজও পর্য্যন্ত শুভকার্য্যে বার হয়। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"আমাদের বংশের কোনও এক প্রপিতামহী দু'শ বৎসর পূর্ব্বে সতী হয়েছিলেন। সেই বিগত দিনের স্মৃতি স্বরূপ একটী পুরাতন জীর্ণ লাল চেলী ঠাকুরমাতার বাক্সে এতদিন পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে। আমরা পরীক্ষার জন্য বা চাকুরী প্রাপ্তির আশায় বাহির হলে ঠাকুরমাতা ঐ শাড়ীর একটু অংশ আমাদের পকেটে রেখে দিতেন। আমরা প্রতি কার্য্যে, মামলা-মকর্দ্দমায় এই বস্ত্রখণ্ড শুভ দ্রব্য ও পাথেয়রূপে ব্যবহার করেছি, সফলতাও পেয়েছি।"

[এ ছাড়া অপর আর একটী বস্ত্রখণ্ডও শুভদ্রব্যরূপে আমরা ব্যবহার করতাম। আমাদের বাস্তু ভিটার উঠানে গভীর রাত্রে মধ্যে মধ্যে গোখুরা সাপের শঙ্খ লাগতো। সর্প জীবের যৌন-সঙ্গমকে সাধারণ ভাবে "শঙ্খ লাগা" বলা হয়। এই সময় এরা খাড়া হয়ে বারেক বামে বারেক ডাইনে হেলে পরস্পরের গাত্র স্পর্শ করে। এই শঙ্খ লাগা মাত্র ঠাকুরমাতা সিঁদুর মাখা একখণ্ড বস্ত্র নিকটে ফেলে দিয়েছেন। এরা কিছুক্ষণ বস্ত্রটীর উপর গড়াগড়ি করে বা খেলা করে স্থান ত্যাগ করলে বস্ত্রটী তিনি উঠিয়ে এনেছেন শুভকার্য্যে ব্যবহারের জন্যে।]

দল বেঁধে মরা অতি সহজ কিন্তু একাকী মরা সহজ নয়। এই দিক হ'তে বিচার করলে আমাদের পিতামহী, প্রপিতামহীরা অত্যন্ত সাহসী ছিল তা স্বীকার্য্য। এইরূপ আত্মদান সাহসী বীর জাতিয় রমণীরাই প্রদর্শন করতে পারে। ভীরুরা পারে না।

এই সতীদাহ প্রথা প্রথমে কিরূপে প্রবর্ত্তিত হয় তা বলা শক্ত।

সম্ভবতঃ কোনও এক সময়ে কোনও এক নারী পতি শোকে বিহ্বলা হয়ে এইরূপে আত্মহত্যা করেছিলেন। এর পর এঁর প্রদর্শিত পন্থায় বোধ হয় আরও বহু নারী এইভাবে প্রাণত্যাগ করেন। পরে এই প্রথা ব্যাপকতা লাভ ক'রে সামাজিক মর্য্যাদা লাভ করেছিল। পুনর্বিবাহ সমাজে প্রচলিত না থাকায় এই প্রথার কেহ বিরুদ্ধাচরণ করে নি। বস্তুতঃ বাল-বিধবাদের পক্ষে সারা জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা এই পথ শ্রেয় ছিল। এই সময় জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ ক'রে ভুলে থাকার সুযোগ সুবিধা বিধবাদের ছিল না। ভারতে বিদেশী শাসন প্রবর্ত্তিত হবার পর নারীগণ পর্দ্দার মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হলে এদের অপহৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পর্দ্দা-প্রথার প্রবর্ত্তন হওয়ার জন্যে নারীগণ বৌদ্ধ শ্রমণীদের ন্যায় জনহিতকর কার্য্যে বাহির হতে পারে নি। শ্রীচৈতন্যের প্রাদুর্ভাব হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নারীগণ জনহিতকর বা ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে পুনরায় বাড়ীর বার হওয়া কল্পনা করে নি। মোসলেম সৈনিকগণ সকলেই নারীসহ এদেশে আসেন নি। এঁদের অনেকে এদেশ হতে নারী সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এঁরা ধর্ম্মীয় শাসন অনুযায়ী সধবা নারীদের কম অপহরণ করেছেন। আক্রমণকারিগণের বিধবা এবং কুমারীদের উপরই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এইজন্য এদেশে বাল্য-বিবাহের প্রচলন হয় এবং তৎসহ সতীদাহ প্রথাও উৎসাহ প্রাপ্ত হয়।

অল্প বয়স্কা বিধবাদের বাকি জীবনটুকু অতিবাহিত করা কষ্টকর হতো। এমন কি এদের পদস্খলন হওয়াও অসম্ভব ছিল না। এই সকল কারণে অভিভাবকগণ এদের এই কার্য্যে বাধা তো দেনই নি, বরং এই বিষয়ে তাঁরা উৎসাহই দিয়েছেন। দেশের রাণী ও সামন্তরাজদের বধূগণের পক্ষে সহমরণ অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। কারণ দেশের রাণীরা

রাণীরূপেই প্রাণ ত্যাগ করা অধিক পছন্দ করেছেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই নারী মাত্রেই যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছেন তা'ও নয়। অনেকে স্বেচ্ছায় চিতায় আরোহণ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। কেহ কেহ আর্ত্তনাদ করে উঠে পালাতেও প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু এই আত্মগ্লানিকর প্রচেষ্টা পারিবারিক অসম্মানরূপে বিবেচিত হতো। এইজন্য এদের আত্মরক্ষার চেষ্টায় সর্ব্বদাই বাধা দেওয়া হয়েছে। ঢাক ঢোল, ও করতালের উচ্চ নিনাদের দ্বারা তাঁদের পরিজনবর্গ ও প্রতিবেশিগণ তাদের এই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ রুদ্ধ করে দিতেন। যাতে এদের মর্ম্মান্তিক চীৎকার কেউ শুনতে না পায়, তার জন্য ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্যের ব্যবস্থা করা হতো। কখনও উচ্চবংশীয়াদের সহমরণের সময় হস্তী যূথ নিয়ে আসা হয়েছে উচ্চনাদ করবার জন্যে। বাদ্য সুরু হওয়া মাত্র হস্তীর উচ্চনাদে অশ্বের হ্রেষা রবে ও জনতার উল্লসিত চীৎকারে অভাগিনীদের শেষ আর্ত্তনাদ চাপা পড়ে গিয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পলায়মান নারীদের জলন্ত চিতার উপর বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে রাখাও হয়েছিল। তবে আভ্যন্তরিক ধাক্কা বা Shockএর কারণে অগ্নিদগ্ধ হওয়া মাত্র এদের অনেকেই উত্থান শক্তি রহিত হয়ে পড়তেন। এঁদের কেহ কেহ ভয়ে অজ্ঞান হয়েও পড়েছেন। এজন্য সহজেই এদের দহন কার্য্য সুসম্পাদিত হ'তে পেরেছ। বাধ্যতামূলক সহমরণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নের ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

"কোনও এক মারাঠা সেনানায়ক বিবাহ আসরে বিবাহের জন্যে আসছিলেন। কিন্তু ইতি পূর্ব্বেই কোনও এক মুসলমান ওমরাহ কন্যার বাড়ী চড়াও করে ঐ বাগদত্তা কন্যাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। এর বহু পরে মারাঠা শ্বশুর ও জামাতা শক্তি সংগ্রহ

করে ঐ মুসলমান ওমরাহকে আক্রমণ করে তাঁকে নিধন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই যুদ্ধে ঐ মারাঠা বীরের বাক্‌দত্ত জামাতাও মারা যায়। মারাঠা পিতা বাহুবলে কন্যাকে শত্রুর কবল হতে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ মোসলেম ওমরাহ তাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করে ফেলেছিল এবং তার ঔরসে সে সন্তানসম্ভবাও হয়ে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ কন্যাকে বাক্‌দত্ত স্বামীর চিতায় আরোহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। পিতা তার ঐ কীটদষ্ট অশুচি প্রাপ্তা কন্যাকে জীবিত রাখতে পারেন নি। বাক্‌দানকেই প্রকৃত বিবাহের মর্য্যাদা দিয়ে তিনি কন্যাকে এইভাবে হত্যা করেছিলেন।"

ইংরাজ শাসনের সময় ভারতের বড় লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক বাংলাদেশ হতে এই সতীদাহ প্রথা প্রথম লুপ্ত করেন। এজন্য তাঁকে কঠোরতম আইন প্রণয়ন করতে হয়েছিল। এমন কি, যে পরিবারে সতীদাহ হবে সেই পরিবারের কোনও ব্যক্তিকে রাজ সরকারে কোনওচাকুরী দেওয়াও তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। বহু চেষ্টার পর তিনি এই ব্যাপক প্রথা বাংলাদেশ হ'তে রহিত করতে পেরেছিলেন। সতীদাহ রহিত করবার জন্যে ক্ষেত্রবিশেষে সৈন্য ব্যবহারও করতে হয়েছিল। শোনা গিয়েছে যে, কোনও এক ইংরাজ এইভাবে একজন নারীকে জ্বলন্ত চিতা হতে উদ্ধার করে তাকে বিবাহ করেছিলেন। কলিকাতার সেণ্ট জনস্‌ চার্চ্চের প্রাঙ্গণে এই মহিলাটীর এবং তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর কবর আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দারুণ বৃষ্টিপাতও ঝঞ্ঝাবাত্যার কারণে লোকজন পলায়ন করলে বা দূরে চলে গেলে বৃষ্টির কারণে নির্ব্বাপিত চিতা হতে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় নেমে এসে কোনও কোনও নারী পলায়নও করেছেন।

সতীদাহ প্রথা রহিত হওয়ার ফল ভালো বা মন্দ হয়েছে, সেই সম্বন্ধে

এদেশে বর্ত্তমানকালে কোনও মতভেদ নাই। আমাদের বাড়ীতে দুই একজন অপুত্রক বিধবা পিসিমা বা মাসীমা না থাকলে আমাদের অনেকেই সুষ্ঠুভাবে মানুষ হতে পারতাম না। এঁরাই আমাদের সমাজে অবৈতনিক ধাত্রীর কার্য্য করেছেন। মায়ের চেয়ে অধিক যত্নে তাঁরা আমাদের লালন পালন করেছেন। এঁরা সর্ব্বকালেই এ দেশীয় পরিবারে সর্ব্বময়ী কর্ত্তৃরূপে অবস্থান করেছেন। কেবলমাত্র কোনও একটী পরিবারের লোকজনেরা নয়, গ্রামের সকল পরিবারই এঁদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকেছে। এদের পরামর্শে ও সাহায্যে সন্তান-প্রসব, সন্তান-পালন, কাজকর্ম্ম, পূজা, উৎসব, শ্রাদ্ধ, রোগ-শান্তি প্রভৃতি সুষ্ঠু-ভাবে তারা সমাধিত করেছে।

সতীদাহ প্রথা এদেশে এক্ষণে লুপ্ত হয়েছে কিন্তু তা সত্বেও কোনও কোনও সময় এই অপকার্য্য আজও সাধিত হয়। নিম্নে এই সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক উল্লেখযোগ্য এক মামলার কাহিনী উদ্ধৃত করলাম।

"এই সতীদাহ মামলার ১৯২৮ সালে পাটনার দায়রা জজের আদালতে বিচার হয়েছিল। ২১শে নভেম্বর পাঁচটার সময় বিহার প্রদেশের বারার সন্নিকটস্থ ভারণা গ্রামের এক রাস্তায় একটী বিরাট মিছিল জনৈক শান্তিরক্ষকের দৃষ্টি গোচর হয়। জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা ঐ শান্তিরক্ষকটী জানতে পারে যে, কেশ-পাণ্ডের বিংশতি বৎসর বয়স্কা কন্যা সাম্পতি সহমরণে চলেছে। এই মিছিলে পাণ্ডে ভ্রাতৃগণ সহ ঐ কন্যার বহু আত্মীয় ও অনাত্মীয়—সর্ব্ব সমেত প্রায় দুই তিন শত ব্যক্তি যোগ দিয়েছিল।

অবস্থা গুরুতর বুঝে ঐ শান্তিরক্ষক নিকটস্থ কোতোয়ালীতে সংবাদ দেয়। পরে সে তাহার সহযোগীদের সাহায্যে তাদের এই আইন বিরুদ্ধ কার্য্য হতে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু জনতা উত্তেজিত হয়ে

তাদের কোনও কথাতেই কর্ণপাত করে না। কারণ ঐ কন্যাটীকে এবং জনতাকে বুঝানো হয়েছিল যে এক পূতঃ অগ্নি সহসা সতীর আসনের নিম্ন হতে নির্গত হবে এবং ঐ অগ্নিশিখা সতীনারী এবং তার পতি সহ শূন্যে অন্তর্হিত হবে। এই অগ্নিজ্বালাবে দেবতায়, মানুষে নয়।

সংবাদ পেয়ে থানার দারোগার পরে ঐ সারকেলের ইনস্পেক্টার অকুস্থলে এসে জনতাকে তাড়িয়ে দিয়ে শবদেহ পুলিশের হেপাজতে গঙ্গার ঘাটে পাঠিয়ে দেয়। সাম্পতিকেও তারা বুঝায় যে, এই স্বয়ংক্রিয় পূত অগ্নি সম্বন্ধে তাকে যা বলা হয়েছে তা ভিত্তিহীন ও অসত্য। এর পর পুলিশের লোকেরা তাকে এক সহচরীর জিম্মায় এক্কায় তুলে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু পরে ঐ পাণ্ডে ভ্রাতৃদ্বয় পথিমধ্যে ঐ সতীরাণীকে পাকড়াও করে তাকে গঙ্গার তীরে নিয়ে আসে। এই সময় শ্মশানে প্রায় চার পাঁচ সহস্র লোক বিভিন্ন গ্রাম হতে এসে জড় হয়েছে। স্বল্প সংখ্যক রক্ষীদল প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের হটাতে পারে না। জনতা পুলিশকে রুখে সমস্বরে চীৎকার করছিল—'জয়, সতী মায়ী কি জয়।'

এর পর সদ্যস্নাতা সাম্পতি নূতন লাল পেড়ে কাপড় পরে মৃত স্বামীর দেহ ক্রোড়ে করে চিতায় উঠে পূত অগ্নির আবির্ভাবের অপেক্ষায় বসে রইলো। একথা সত্য যে কেহ কাহাকে ঐ চিতায় অগ্নি দিতে দেখে নি। বরং তারা সহসা সতীর বস্ত্রাভ্যন্তর হতে দাউ দাউ করে অগ্নি জ্বলে উঠতে দেখেছে। কিন্তু অগ্নি যে ভাবেই জ্বলুক না কেন? অগ্নি আগ্নই; দহনের জ্বালায় অস্থির হয়ে সাম্পতি চিতা হতে লাফ দিয়ে পড়ে পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। গঙ্গার স্রোতে বহুদূর পর্য্যন্ত সাম্পতি অসহায় অবস্থায় ভেসে গিয়েছিল। বিপাক বুঝে পাণ্ডে ভ্রাতৃদ্বয় চীৎকার করে বলেছিল, সাম্পতি গঙ্গায় ডুবে মরো, নইলে মহা পাপের ভাগী হবে। ইতিমধ্যে

আরও বহু পুলিশ বিভিন্ন স্থান হতে সেখানে এসে গিয়েছে। বহু চেষ্টা করে নৌকা যোগে তারা সাম্পতিকে ডাঙ্গার ঘাটে তুলে আনলো। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ কুসংস্কারচ্ছন্ন জনতা পুলিশের এই আচরণ পছন্দ করে নি। তারা পুলিশকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সংখ্যালঘু পুলিশ এই জনতার সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারলো না। এর পর দুই রাত্রি ও দুই দিন অজ্ঞান অবস্থায় সাম্পতি ঐ ঘাটে পড়ে রইলো। পরে মহকুমা হাকিম উপযুক্ত সংখ্যক শান্ত্রীসহ অকুস্থলে এসে তাকে সহরের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। এরও একদিন পর ২৫শে নভেম্বর সাম্পতি সকল যন্ত্রণা অতিক্রম করে ইহলোক ত্যাগ করে। এদিকে জনতা কিন্তু গঙ্গার ঘাট ত্যাগ করে নি। তারা ঐ স্থানে একটী সতী-বেদী তৈরী করে সাম্পতির উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিতে সুরু করে দিলে।"

কিন্তু মনুষ্য-প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে এই পূত অগ্নি এলো কোথা হোতে? এই সম্বন্ধে দায়রা বিচারক স্যার কোরটর্ণি টেরেল তাঁর রায়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

"পাণ্ডে ভ্রাতৃদ্বয় নিজেরা অগ্নি সংযোগ নিশ্চয় করে নি, কারণ এরদ্বারা তারা ফাঁসীর পথে এগিয়ে যেতো। তা ছাড়া নিজেরা অগ্নি প্রদান করলে সাম্পতি এবং জনতাকে বিশ্বাস করানো যেতো না যে স্বয়ংক্রিয় পূত অগ্নির আবির্ভাব হয়েছে। তবে এই অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করবো এমন বোকা আমরা নই। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এমন কোনও ট্রিকস্ ছিল। এই ট্রিকস্ সার্কাস আদিতে বা ম্যাজেসিয়ান কর্ত্তৃক হাটে ও মেলায় বহুবার দেখানো হয়েছে। ঐ চিতার নিম্নে এক অগ্নি-দহন যন্ত্র যে গোপনে স্থাপিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয়বার এই বিনষ্ট যন্ত্রটী চিতার মধ্যে পুনঃ স্থাপন করা সম্ভব হয় নি।

আমাদের মতে এইজন্যই সাম্পতিকে তারা আত্ম নিমজ্জন করতে বলেছিল।"

[আমার মতে উত্তেজনা বশতঃ সাক্ষিগণ অগ্নি আবির্ভাবের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে নি। পূর্ব্ব হতেই তারা বিশ্বাস করেছিল যে অলৌকিক ভাবে অগ্নির আবির্ভাব হবে! এই কারণে বহুকার্য্য তারা দেখেও দেখতে পায় নি। যা তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে তাদের মনে হয়েছে তারা বুঝি তাই দেখেছে। উত্তেজনা প্রায়ই মানুষের সহজ দৃষ্টি ও চিন্তা শক্তি অপহৃত করে। এইজন্যে তারা যা ভেবেছিল পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা তাই তারা দেখেছে বলে বিশ্বাস করেছে। অপরের নিকট হতে শোনা কথাও পূনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা সত্যই ঘটেছে ব'লে বিশ্বাস করানও অসম্ভব নয়। তা ছাড়া গোলমাল উত্তেজনা ও ভীড়ের মধ্যে বহু দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয়েও হয় না। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে মিথ্যাচরণ প্রবন্ধটী পাঠ করলে বক্তব্য বিষয়টী বুঝা যাবে।]

নিম্ন আদালতে আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার অপরাধে পাণ্ডে ভ্রাতৃদ্বয় ও তাহাদের সহকারীদের ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৯ এবং ৩০৬ ধারা মতে বিচার হয়েছিল।

পাটনার উচ্চ আদালতে মামলাটীর আপীল হলে মহামান্য বিচারকদ্বয় স্যার কোর্টলি টেবেল এবং জাস্টিস আগারি রায় দানের সময় এই সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন।

"বলা হয়েছে যে এই আসামিগণ বিশ্বাস করেছিল যে, অলৌকিক ভাবে এই অগ্নির আবির্ভাব হবে। এইজন্যে তাদের অগ্নি সংযোগ সম্পর্কে ১০৭ ধারা মতে ভাঃ দঃ বিঃ-তে অভিযুক্ত করা যায় না। মনুষ্যকৃত অগ্নি-দহনের ব্যাপারে তারা নিশ্চয়ই যোগ দিতো না। কিন্তু এক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠে না। কারণ, তারা ঐ বালিকাটীকে আত্মহত্যায়

সাহায্য করার জন্যে অভিযুক্ত হয়েছে। এই আত্মহত্যা অগ্নি সংযোগে কৃত হয়েছিল; তা এই অগ্নি লৌকিক বা অলৌকিক, যেরূপেই আবির্ভূত হোক না কেন? এইরূপ আত্মসমর্থন আসামীদের উপকারে আসে না।"

ইতিমধ্যে ঐ গঙ্গার তীর মহাতীর্থে পরিণত হয়ে পড়ে। পূর্ব্বাপর সকল কথা বিবেচনা না করে অন্ধ ভক্তেরা ঐ সতী-বেদীতে পূজা দিতে থাকে, রৌপ্য মুদ্রাও। এই সম্বন্ধেও মহামান্য বিচারপতিদ্বয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

"আমরা ইচ্ছা করি যে, প্রথমতঃ দুষ্কৃতকারীদের সাজা হোক, দ্বিতীয়তঃ যারা এই অসহায়া বালিকাকে নির্য্যাতিত করেছে, তার কুফল তারাও ভোগ করুক, এবং তৃতীয়তঃ যারা যুক্তি মানে না তারা অন্ততঃ ভয়েও অপকার্য্য হতে নিবৃত্ত হোক। আমরা কেবল ইহলোকের মানুষকে সাজা দিতে পারি। পরলোক বলে কোনও বস্তু আছে কি'না জানি না, কিন্তু যদি তা থাকে, তা'হলে যারা এই পার্থিব শাস্তি (আইনের ফাঁকে) এড়িয়ে গেল, তারা এখন সাম্পতির ঐ সতী-বেদীতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এই বলে প্রার্থনা করুক, সাম্পতি! তোমার অমর আত্মা যেন ভগবানের দুয়ারে আমাদের জন্য করুণা ভিক্ষা করে।"

নিগমন—দেশপ্রেম ও ধর্ম্মের কারণে আত্মহত্যার নাম 'নিগমন'। পুরাকালে ভারতীয়দের মাত্র চারিটী ধর্ম্ম ছিল; উহাদের যথাক্রমে বলা হতো, ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবন, গার্হস্থ ধর্ম্ম, বাণপ্রস্থ এবং জ্যোতি। অতি বৃদ্ধ অবস্থায় দেহ শক্তিহীন হলে হিন্দুগণ ধ্যানস্থ হয়ে বা নিরম্বু উপবাসে দেহত্যাগ করতেন। ইহাকে আত্মহত্যা বলা যেতে পারে। মধ্যযুগে কোনও কোনও হিন্দুর বিশ্বাস ছিল, প্রয়াগ তীর্থের অক্ষয় বট বৃক্ষ হতে উল্লম্ফন দ্বারা যমুনায় পড়ে আত্মহত্যা করলে পুনর্জন্ম হয় না। বহুলোক

এইভাবে আত্মহত্যা করেছিল। এইরূপ এক বিশ্বাসে জগন্নাথদেবের রথচক্রের তলায় মস্তক রেখে বহু লোক আত্মহত্যা করেছে। তবে এইরূপ বিশ্বাস ব্যাপক ভাবে হিন্দুস্থানে কখনও প্রকট হয় নাই। ধর্ম্মের নামে উপবাস বা কৃচ্ছ্র সাধন করে যারা তিলে তিলে দুর্ব্বল হয়ে পড়েন এবং তৎজনিত আখেরে অকাল-মৃত্যু বরণ করেন তারা আত্মহত্যাই করেন। এইরূপ অহেতুক কৃচ্ছ্রসাধনার ধর্ম্মীয় বিধিগুলির বিরুদ্ধে ভগবান বুদ্ধদেব প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

সৈনিকগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করতে যুদ্ধে যোগ দেয়। স্বদেশীয় নরনারীর ধন-প্রাণ, নারীর সম্মান বজায়, জীবন ও প্রতিপত্তি এবং সর্ব্বোপরি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুগে যুগে যুবকগণ স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে বাধ্যতা মূলক ভাবেও (Conscription) লোকে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। এইরূপ আত্মদানকে আত্মহত্যা বলা যেতে পারে।

[কেহ কেহ বলেন যুদ্ধাগত প্রত্যেক সৈনিকই মনে করে যে সে ছাড়া আর সকলেই ঐ যুদ্ধে নিহত হবে এবং একমাত্র সে-ই বুকভরা রিবন বা মেডেল ও বিজয়মাল্য নিয়ে ফিরে আসবে। এইরূপ এক মনোবৃত্তি ও আশা না থাকলে বহু সৈন্যই স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দিতো না। এই কারণে সাধারণ বাহিনীতে স্বেচ্ছায় যোগ দিলেও তাদের অনেকেই আত্মহন্তারক বাহিনীতে (Suicide Corps) যোগ দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করতে রাজী হন নি।

মধ্যযুগে এই কারণে মোসলেম বাহিনীকে বুঝানো হতো যে মৃত্যু হলে সে স্বর্গে যাবে। স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাসী সরলমনা বহু মানুষ মধ্যযুগে স্বর্গসুখ ভোগের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। রাজ্য রক্ষার্থে বা স্বার্থের প্রয়োজনে রাজন্যবর্গ ও নেতাগণ প্রজাদের এইজন্য স্বর্গ সম্বন্ধে বিশ্বাসী

করে তুলতেন। মধ্যযুগীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস তাদের এই কার্য্যে সাহায্য করেছিল।

প্রাক্‌ঐতিহাসিক যুগের হিন্দু যোদ্ধা শ্রেণী বা ক্ষত্রিয়দেরও এইরূপ বুঝানো হতো। এমন কি এদের অনেকে যুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্যে অকারণে যুদ্ধ আহ্বান করেছেন। রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের যুগের রণস্পৃহার ভিতর ছিল এইরূপ এক বিশ্বাস।]

ধর্ম্ম বা স্বজাতি প্রীতি—যে কারণেই হোক যুদ্ধে আত্মদানের মধ্যে উচ্চ আদর্শ থাকে। এইরূপ আত্মহত্যাকে আমরা আদর্শগত আত্মহত্যা বলবো। সাধারণতঃ হেলায় কেহ প্রাণ দিতে চায় না। অথচ এই যুগে অলীক বিশ্বাস দ্বারা কাহাকেও ভুলানো সম্ভব নয়। এইজন্যে এ যুগে সৈন্যদের যুদ্ধের প্রাক্কালে আরক ও মাদক পান করানোর রীতি আছে। বাক্‌-প্রয়োগও মাদকতার কার্য্য করে। এইজন্যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দ্বারাও স্বদেশপ্রীতি সঞ্চারিত করে রাষ্ট্রবিদগণ ইহাদের স্বেচ্ছামৃত্যু মেনে নিতে রাজী করিয়েছেন।

এইরূপ আত্মদানের মধ্যে অন্য আর এক প্রকার মনস্তাত্বিক কারণও থাকে। মানুষের পক্ষে দল বেঁধে মৃত্যু বরণ করা যত সহজ, একক মৃত্যু বরণ করা তার পক্ষে তত সহজ নয়। বহুলোক একত্র থাকলে পরস্পর পরস্পরের মনে গণ-বাক্‌-প্রয়োগ (Mass suggestion) দ্বারা সাহস সঞ্চার করে। এই ভাবে তারা নৈতিক শক্তি (Morale) অটুট রাখে। এই সময় তারা সংসারের সুখ বা চিন্তা বিবর্জ্জিত মানব দানবে পরিণত হয়। এই অবস্থায় শির দেওয়া বা নেওয়া তাদের নিকট অমূলক। নির্ম্মম নিয়মতান্ত্রিকতাও এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করেছে। এইজন্যে বলা হয়ে থাকে যে অসহায় গুলি ছুঁড়ে, অসহায় মরে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাণভয়ে ভীত সৈনিক পালাবার

উপক্রম করা মাত্র তাকে পিছন হ'তে গুলি করেও মারা হয়েছে। এই অবস্থায় শত্রু নিধন করবার জন্যে অগ্রসর হওয়া ছাড়া তাদের উপায়ও থাকে নি। উপরন্তু নিরক্ষর উপদলীয় (Tribal) মানুষদের চিন্তা শক্তি থাকে কম। এজন্যে তারা কখনও সহজে ভীত হয় না। জীবন বা মরণ সম্বন্ধে তারা থাকে বেপরোয়া। এই কারণে রাষ্ট্রবিদগণ সেনাবাহিনীতে এদেরই অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করেছেন। এছাড়া এদের পরিবারবর্গের বা আহত হলে নিজেদের জন্য পেনসন্, ভূমিদান, সুযোগ সুবিধা প্রভৃতিরও প্রতিশ্রুতি তাঁরা এদের দিয়েছেন। এই সকল কারণে খেয়ালের বা ঝোঁকের মাথায় যুদ্ধে যোগ দিয়ে ইচ্ছাসত্ত্বেও এরা ফিরতে পারেনি। সেনাবাহিনীর নিয়ম কানুন এবং দলত্যাগীদের কঠোর শাস্তিও এ বিষয়ে রাষ্ট্রকে সাহায্য করেছে।]

রাজনৈতিক আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত স্বরূপ মধ্যযুগীয় রাজস্থানের রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর বিষপানের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। দুইজন পাণিপ্রার্থীর মধ্যে বিরোধের কারণে ঐ রাজ্য ধ্বংস হবার উপক্রম হলে রাজকুমারী স্বরাজ্যের হিতার্থে নিজেকে এই অনর্থের মূল কারণ বুঝে বিষপান করে আত্মহত্যা করেছিলেন।

রাজনৈতিক কারণে মধ্যযুগে বহু রাণী ও রাজকুমারীকে সম্মান রক্ষার্থে বিষপান করতে হয়েছিল। এই কারণে তাঁরা সকল সময়ে বিষাঙ্গুরী ধারণ করতেন। তাঁদের হীরক অঙ্গুরীর মধ্যে উগ্র বিষ ভরা থাকতো। বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝলে বা আকস্মিকভাবে বন্দীকৃত হলে এই বিষ তাঁরা পান করেছেন। মহামানব মহাত্মা গান্ধীও এই অবস্থায় নারীদের সম্মান ও সতীত্ব রক্ষার্থে বিষপানের উপদেশ দিয়েছিলেন। মিশরের মহারাণী ক্লিওপেটরার আত্মনাশও ইহার অপর দৃষ্টান্ত।

নিশ্চিত পরাজয় বুঝে বন্দীকৃত বিষধরকে হাতে তুলে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছিলেন।

মহাবীর হিটলারের আত্মনাশও এই শ্রেণীর আত্মহত্যা। শুনা গিয়েছে যে অপরের সাহায্যে এই আত্মহত্যা তিনি করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বহু রুশ সেনানায়ক জার্ম্মানদের হস্তে রুশ সেনানীদের দলে দলে নিহত হতে দেখে ক্ষোভে অভিমানে আত্মহত্যা করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মান পকেট ব্যাটেলসিপের অধিনায়কও তাঁর প্রিয় জাহাজকে রক্ষা করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিলেন।

স্বয়ং আত্মহত্যা না করে কাউকে যদি আঘাত করবার জন্যে আদেশ বা অনুরোধ করা যায় তা'হলে তাকেও আত্মহত্যা বলা হবে। এমন বহু ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেছে যে স্থলে রোগী রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আত্মীয় বা বন্ধুকে তাকে হত্যা করবার জন্যে অনুরোধ করেছেন।

রাজনৈতিক প্রায়োপবেশন দ্বারা আত্মহত্যার জন্য আয়র্ল্যাণ্ডের ম্যাক্সুইনি সাহেব এবং ভারতবর্ষের যতীন দাস আজও পর্য্যন্ত অমর হয়ে রয়েছেন। প্রায়োপবেশনের দুই তিন চার ছয় সাত দিন মাত্র মানুষ কষ্ট-বোধ করে। পরে দেহকোষগুলি বাহিরের খাদ্যের অভাবে স্বকীয় মেদ ও পরে মাংসের উপর নির্ভরশীল হয়। এইরূপ অবস্থাকে বলা হয় অটো-ডাইজেসন বা স্বয়ংক্রিয় আহার। এই সময় হতে মানুষ আর একটুও কষ্ট ভোগ করে না। বহু মানুষ এই কারণে ৫০ ৬০ বা ৯০ দিন বা ততোধিক পর্য্যন্ত অনাহারে বেঁচে থাকতে পেরেছে।

[ভেক ও সর্প জাতি সারা শীতকাল অনাহারে জীবনযাপন করে। এই পদ্ধতিতে পুরাকালে ভারতীয় যোগীরাও বহুদিন পর্য্যন্ত অনাহারে

থেকেছেন। ইহা কতকটা যে অভ্যাস সাপেক্ষ, তাহাও বটে। অধিকক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে থাকার অভ্যাস করলে না'কি মানুষও বহুদিন বায়ুহীন অবস্থায় অনাহারে বেঁচে থাকতে সক্ষম। ভেক সর্প আদি জীব তাদের জিহ্বা নাসিকার অন্তররন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে গর্ত্তে বাস করে শীতকাল অতিবাহিত করে। কোনও যোগী এদের প্রদর্শিত পন্থা আয়ত্তে এনে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত অবস্থায় কিছুকাল বাস করতে পেরেছেন। তবে এ বিষয়ে তাঁরা কতটা সফল হয়েছেন তা আমি বলতে অক্ষম।]

স্বেচ্ছামৃত্যুর বহু কাহিনী এদেশে শোনা গিয়েছে। তবে ইচ্ছামত বেশী দিন বেঁচে থাকা সম্ভব না হলেও ইচ্ছাদ্বারা আত্মনাশ করা অসম্ভব নয়। তবে এইরূপ ইচ্ছা সকলে প্রকাশ করতে পারে না। পূর্ব্বকালে এমন বহু বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা ছিলেন যাঁরা মৃত্যুর দুই বা তিনদিন পূর্ব্বে বুঝতে পারতেন যে তাঁরা মারা যাবেন। তিনদিন পূর্ব্বে তাঁরা নিজেরাই তাড়াহুড়া করে তে-রাত্র গঙ্গাবাসের জন্যে গঙ্গাঘাটে উপনীত হয়েছেন। এমন কি মৃত্যুর দিন সকালে তাঁরা নাতি নাতনীদের তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলেছেন, এই ভেবে যে তাঁর মৃত্যুজনিত যদি তাদের অনাহারে থাকতে হয়। এমন কি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তাঁরই আদেশে তাঁকে গঙ্গার জলে এনে তাঁর পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলীটী ঐ জলে ডুবিয়ে ধরা হয়েছে, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হরিনাম করে অঙ্গুলী ঘুরাতে ঘুরাতে প্রাণত্যাগ করেছেন। কোনও কোনও বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা মৃত্যুর প্রাক্কালে পুত্রবধূদের সাবধান করে বলেছেন, 'বৌমা, আমার আর দেরী নেই। এক্ষুণি নিয়ে চলো আমাকে। আর ঘরদোরগুলোয় চাবি দাও, নইলে সর্ব্বস্ব চুরি হয়ে যাবে। আর আমার ইষ্টিকবচ ও হারটা আমার বড় মেয়ে অমুককে পাঠিয়ে দিও। সাবধানে থেকো সব,' ইত্যাদি। এইরূপ মৃত্যু দেখে বা উহা শুনে অনেকেই এই ইচ্ছামৃত্যু সম্বন্ধে বিশ্বাসী। কিন্তু আমার মতে একে

ইচ্ছামৃত্যু বলা যায় না। বহু লোককে এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা স্বকীয় দীর্ঘ জীবনে মরতে দেখেছেন। এইজন্যে মৃত্যুর প্রাক্কালীন অনুভূতি সম্বন্ধে এরা একটী সহজাত জ্ঞানলাভ করতেন। এই সহজাত জ্ঞানের কারণে তাঁরা দুই বা তিনদিন পূর্ব্বে বুঝতে পারতেন এইবার তাঁরা ঐ ভাবে মারা যাবেন।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরই তার সুস্থ ও সবল স্ত্রীও অকারণে মারা গেছেন। এই সকল ঘটনা হ'তেও লোকে এই 'ইচ্ছামৃত্যু' বিশ্বাস করেন। এদেশে নারীর কাছে তার স্বামী কি বস্তু, তা সকলেই জানেন। স্বামীহারা হয়ে বা স্বামী ত্যাগ করে বাস করা এঁরা কল্পনাও করেন না। এই অবস্থায় দারুণ শোক, ভয় ও ক্ষোভে মুহ্যমান হয়ে নিদারুণ 'শকের' কারণে হার্টফেল করা খুবই স্বাভাবিক। যাদের স্বামী স্ত্রীকে নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় রেখে মারা যান, তাদের শোকের বদলে ভয়ই হয় বেশী। 'আমি কোথায় যাবো, এখন কি করবো', এই চিন্তাই তাকে অভিভূত করে দেয়—এবং এই ভয়ের সঙ্গে থাকে ভালোবাসা ও আশু বিরহ কাতরতা। এর উপর পূর্ব্ব হতেই যদি ঐ স্ত্রীর হৃদরোগ থেকে থাকে তা'হলে হার্টফেল হয়ে তা'রা মারা যায়। এইজন্যে দেখা গিয়েছে যে, একমাত্র হিন্দু স্ত্রীগণ—যাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা নেই, তাঁরাই এইভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন। এই কারণে হিন্দু স্বামী মাত্রেরই কর্ত্তব্য সময়ে স্ত্রীর জন্যে যথাসম্ভব সংস্থান করে রাখা, যাতে করে তাঁর মৃত্যুর পর সে অসহায় না হয়।

সরোগ আত্মহত্যা

নীরোগ বা আদর্শজনিত আত্মহত্যার কথা বলা হলো। এইবার সরোগ বা রোগজনিত আত্মহত্যার কথা বলবো। অনেকে রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। অনেকে যৌন-রোগের কারণে বা উহা প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কার ভয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু এইরূপ আত্মহত্যাকে আমরা সরোগ আত্মহত্যা বলি না। মস্তিক বিকৃতি, মানসিক রোগ ও অত্যধিক ভাবপ্রবণতার কারণে আত্মহত্যা করলে উহাকে আমরা সরোগ আত্মহত্যা বলি। এই আত্মহত্যার মূলে থাকে সাময়িক উন্মাদনা (Temporary Insanity) মনের প্রতিরোধ শক্তির অভাবে মানুষ শোক, দুঃখ, লজ্জা ও কষ্টে এমনিই অভিভূত হয় যে সহজেই সে আত্মবিনাশ করে। এই প্রতিরোধ শক্তির অভাব বহুক্ষেত্রে মানসিক বা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের কারণে ঘটে। এই দৌর্ব্বল্যের সহিত ভাবপ্রবণতা সংযুক্ত হলে দুর্ব্বলমনা মানুষ সহজেই আত্মনাশ করে। তা না হলে সদা মৃত্যু ভয়ে ভীত মানুষের পক্ষে এই ভাবে আত্মহত্যা করা সম্ভব হতো না। আত্মহত্যা করতে হলে যে অসীম সাহসের প্রয়োজন তা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে না। এইজন্য প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে মানুষ মনোবিকারের কারণে, খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে বা আত্মবিস্মৃত হয়ে প্রায়ই আত্মহত্যা করে থাকে। মনোবিকার যথার্থই মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দেয়। এই রোগ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) কারণ প্রসূত মনোবিকার এবং (২) অকারণ মনোবিকার। আমি প্রথমে কারণ প্রসূত মনোবিকার সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

কারণ প্রস্থত মনোবিকার মানুষের বোধগম্য থাকে। ক্রোধ, আত্মাভিমান, লজ্জা, দুঃখ, ভয় ও ব্যর্থ প্রেম প্রভৃতির কারণে এই রোগ জন্মে। উহা তাদের মধ্যে সাময়িক উন্মাদনার সৃষ্টি করে। এই সময় মানুষ ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করে বসেছে। কিছুটা সময় পেলে এরা আত্মস্থ হয়ে এইরূপ কার্য্য হতে বিরত থাকতো। কিন্তু উন্মাদনার কারণে এত তাড়াতাড়ি তারা এই কাজ করে বসে যে পরে আর তাদের বাঁচবার কোনও উপায়ই থাকে না। নিম্নের বিবৃতি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমার ছোট ভাই ছিল অত্যন্ত অভিমানী। একদিন অকারণে তাকে ভর্ৎসনা করায় সে আত্মহত্যা করতে মনস্থ করে। সে সোজা চলে যায় এক আফিমের দোকানে এবং কিছু আফিম ক্রয় করতে ইচ্ছা করে। আফিম বিক্রেতা তার মুখ চোখ হতে বিষয়টী বুঝে নিতে পেরেছিল। এইজন্যে সে আফিমের বদলে পুরানো আমসত্বের সহিত একটু তামাক গুঁড়ো মিশিয়ে গুলি তৈরী করে তাকে বিক্রী করে। বাড়ী ফিরে দরজা বন্ধ করে তা সে সেবন করে, কিন্তু উহা ভক্ষণ করার পরই সে আত্মস্থ হয়ে উঠে। বোধ হয় তার শেষ পরিণতি বুঝতে পেরে সে অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠেছিল। ভয়ে ভাবনায় অস্থির হয়ে সে চীৎকার করে উঠলো, 'মাগো, আমি একি করলাম? আমাকে বাঁচাও তোমরা, আমি যে মরে যাচ্ছি।' আমরা তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে তার মাথায় জল দিই। ইতিমধ্যে আমাদের একজন ডাক্তার ডাকতে বেরিয়ে যায়। এদিকে আফিম বিক্রেতাও এইখানে এসে হাজির হলেন। তার কাছে প্রকৃত সমাচার জ্ঞাত হয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হই। সেই সঙ্গে আমাদের ঐ নির্ব্বোধ ভাইটীকেও আশ্বস্ত করে আমরা তাকে নীরব হতে বলি।"

বহুক্ষেত্রে বিষপান করার পরক্ষণেই মানুষ আত্মস্থ হয়ে এইভাবে আক্ষেপ করেছে, কিন্তু কিছু বিলম্ব হয়ে যাওয়ায় বা ধারেকাছে ডাক্তার না থাকায় তাদের আর বাঁচানো সম্ভব হয় নি। আত্মহত্যার জন্য যে মনোবলের প্রয়োজন তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু প্রায়শঃক্ষেত্রে আত্মহন্তারকদের এই মনোবল ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। কোনও এক ভদ্রলোক আত্মহত্যা করবার জন্যে শয়নকক্ষের কড়িতে দড়ি টাঙিয়ে ভেবেছিলেন যে এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরে ঘরটা নষ্ট করি কেন? এর পর তিনি এই একই উদ্দেশ্যে তাঁদের বাগানে এসে একটী গাছের ডালে দড়ি বাঁধছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখলেন গাছের গোড়ায় একটী গোখুরা সাপ ফণা তুলছে। এই দেখে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ঐ ভদ্রলোটী পালিয়ে এসেছিলেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এই মনোবল তুই তিন ঘণ্টা বা তুই তিন দিনও কারুর কারুর মধ্যে দেখা গিয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই স্পৃহা ধীরে ধীরে গড়ে উঠে এবং পরে উহা ধীরে ধীরে নেমে এসে অন্তর্হিত হয়। বহুক্ষেত্রে বাহাতুরি বা দাম্ভিকতা এবং ভাবপ্রবণতাও উন্মাদনার সহিত মিশ্রিত হয়ে আত্মহত্যার কারণ হয়েছে। এই সম্বন্ধে একটী চমকপ্রদ কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"একদিন রাত্রি তুইটায় থানায় বসে রোঁদের রিপোর্ট লিখছি। এমন সময় টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলো। রিসিভারটী তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে? কি চান আপনি!' ফোনের অপর দিক হতে বালকের গলায় একজন উত্তর করলো, 'আজ্ঞে; থানা?' দেখুন, এইখানে একটী ছেলে গলায় দড়ি দিয়েছে। দয়া করে আসবেন এক্ষুণি। এতো নম্বরের বাড়ী বুঝলেন?' এতো রাত্রে অন্য কোনও অফিসারকে না জাগিয়ে জমাদার অমুককে বললাম, 'জেগে তো আছিই আমরা, চলো

তদন্তটা আমরাই শেষ করি।' এর পর জমাদার অমুককে নিয়ে আমরা ঐ কথিত রাস্তার মোড়ে এসে হাজির হলাম। রাস্তার মোড়ে একটী বালককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমাদের দেখে সে বলে উঠলো, 'এসে গিয়েছেন। যান সোজা গিয়ে বামে বেঁকবেন। সামনেই দেখবেন অতো নম্বরের বাড়ী।' বালকটীর গলা শুনে বুঝা গেল যে সেই আমাকে ফোন করেছিল। আমি এও বুঝলাম যে ছেলেটা বোধ হয় মৃতদেহটী দাহ করবার জন্মে লোকজনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ম্লান হাসি হেসে আমি তাকে বলেছিলাম, 'আজ রাত্রে আর লাস পাবে না, কারণ ঐ লাস ময়না তদন্তে যাবে।' এর পর বালকটীর নির্দ্দেশিত পথে এগিয়ে এসে অত নম্বরের বাড়ীতে পৌঁছে দেখলাম, ভোঁঃ ভাঁঃ, কেউ কোথায় নেই। জানলা দরজা সবই বন্ধ। চারিদিকে শুধু অন্ধকার। কড়া নেড়ে নেড়ে চেঁচাচ্ছিলাম, 'ও মশাই, কে আছেন?' বহুক্ষণ পর উপর হতে উত্তর এলো, 'এতো রাত্রে কে আপনি, কি চাই?'—'পুলিশ,' আমি উত্তর করলাম, 'এ বাড়ীতে গলায় দড়ির কেস হয়েছে?'—'এ বাড়ীতে?' বিস্মিত হয়ে উপরের ভদ্রলোক জানালেন, 'কে ইন্‌ফর্ম করলো? ষাট্ ষাট্, এ'কি অলক্ষণে কথা!' আমার হাঁক ডাকে বাড়ীর অন্য সকলেও জেগে উঠলেন। রাস্তা হতেই দেখতে পেলাম যে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠছে। আরো কিছুক্ষণ বোধ হয় তাঁর সঙ্গে এইরূপ তর্ক চলতো, কিন্তু মহিলা কণ্ঠে একজন চীৎকার করে উঠলেন, 'ওমা! তাই তো? ওগো এ কি হলো গো-ও। ওগো শীঘ্র উপরে এসো, এখনো বোধ হয় বেঁচে আছে।' কিছুক্ষণ ছুটাছুটী হাঁকাহাঁকির পর এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নেমে এসে বললেন, 'সত্য সত্যই তার কনিষ্ঠ পুত্র গলায় দড়ি দিয়েছে, কিন্তু তা তারা এইমাত্র জানতে পারলেন। তবে এই সম্বন্ধে তাঁদের কেউই থানায় ফোন করেন নি। তা ছাড়া তাঁদের বাড়ীতে

কোনও ফোনও নেই।' ত্রিতলের একটা ঘরে এসে যা দেখলাম তাতে আমার বাক্‌স্ফূরণ হলো না। ইতিমধ্যে জমাদার রহমৎ খাঁ ভয়ে কাঁপতে সুরু করেছিলো। আমরা পরিলক্ষ্য করলাম যে বালককে আমরা কিছুক্ষণ আগে রাস্তায় দেখেছি সে-ই সেখানে ঝুলছে। একবার মনে হলো তাই বা হয় কি করে? কিন্তু, পায়ের জুতা, চোখের চশমা, এমন কি, ইজের ও ছিটের সার্টটী পর্য্যন্ত যে আমার চেনা! আধ ঘণ্টা আগে তাকে আমরা দেখেছি, নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করা যায় না। হঠাৎ সমস্যার এক সমাধান মনে এলো। এর পর যা কিছু ভয় বা চিন্তা তা বিদূরিত হলো এবং সেই সঙ্গে কাঁপুনিও গেল থেমে। মূর্খতার জন্যে লজ্জিত হয়ে বিজ্ঞের মত জিজ্ঞাসা করলাম, 'হুঁ, এরা তো তাহ'লে জমজ ভাই! এর আর এক ভাই কোথায়?' বিস্মিত হয়ে সকলে জানালেন,—'জমজ ভাই? না তো। এর তো জমজ ভাই নেই। ওর বড় ভাই ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে।' আবার আমি পূর্ব্বের মত ভীত হয়ে পড়লাম এবং সেই সঙ্গে আমার কাঁপুনিও সুরু হলো। আমি মুখ ঘুরিয়ে জমাদারকে আদেশ করলাম, 'তুম রহ যাও হিঁয়া, হাম আভি চল্‌তা, ফজীরমে হাম আয়েগা।' উত্তরে জমাদার সাহেব জানালো, 'নেহি হুজুর মর যায়গা তভি নেহি রহেগা।' অগত্যা লাস বাড়ীর লোকের জিম্মা দিয়ে দুজনেই বেরিয়ে এলাম।' কিন্তু যতবার বাগ-বাজার ষ্ট্রীটে বেরুতে চেষ্টা করেছি, ততবার খাল ধারে এসে পড়েছি। এমনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে এর পর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গ্যালিফ ষ্ট্রীট ঘুরে আমরা থানায় ফিরে আসি। পরদিন তদন্ত করে আমরা জানতে পারলাম যে ঐ বাড়ীর বাগানের দরজা দিয়ে বার হলে অল্পক্ষণে রাস্তার মোড়ে পৌঁছানো যায়। খুব সম্ভবতঃ বালকটী আমাদের বাঁকা পথ দেখিয়ে সোজা পথে বাড়ী ঢুকে দুই এক মিনিট পরেই আত্মহত্যা

করেছিল। তদন্তে আরও প্রকাশ পায় যে, এক অজ্ঞাতনামা বালক অদূরের এক দোকান হতে ডাক্তার ডাকার আছিলায় ফোনটী ঐ রাত্রে ব্যবহার করেছিল। খুবই সম্ভবতঃ ঐ বালকটী ফোনে পুলিশকে খবর দিয়ে তার পর ঐ ভাবে আত্মহত্যা করেছে।

আত্মহত্যা এবং পর-হত্যা এক শ্রেণীর অপরাধ। তবে উহাদের গোত্র বিভিন্ন। একইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই অপকার্য্য করে। এই কারণে প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের ন্যায় আত্ম-হন্তারকদের আত্ম-হত্যা-রূপ কার্য্যও দাম্ভিকতা ও ভাবপ্রবণতা প্রসূত হয়ে থাকে। বাহাদুরির নেশাও বহুক্ষেত্রে দাম্ভিকতা ও ভাবপ্রবণতার সহায়ক হয়েছে। বংশগত উন্মাদনার কারণেও এই আত্মহত্যার স্পৃহা মানুষের মনে স্থান পেয়েছে। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে একই পরিবারে বংশানুক্রমে বহু ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে যারা আত্মহত্যা করে তারা তা আদর্শের কারণে করে থাকে। যেমন বহু ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার্থে স্বদেহে অল্প অল্প বিষ প্রয়োগ করে আখেরে মৃত্যুবরণ করেছেন। যারা প্লেগ প্রভৃতি রোগের সেবার ভার নেন, তারাও আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত থাকেন। এমন অনেক ছাত্র দেখা গিয়েছে, যারা ভাবপ্রবণতার কারণে মিথ্যা আদর্শের জন্য প্রাণত্যাগ করেছেন। কলিকাতার কোনও এক কলেজের ছাত্রাবাসে পর পর দুইটী ছাত্র এইভাবে আত্মনাশ করেছিল। পোটাসিয়াম সাইনাইড একটী উগ্র বিষ, ইহা সেবন মাত্র ত্বরিত গতিতে মানুষের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ঐ বস্তুর প্রকৃত স্বাদ কি? তা বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন পর্য্যন্ত জানতে অক্ষম ছিলেন। একটী বালক বাম হাতে ঐ সাইনাইড মুখে পুরে ডান হাত দিয়ে লিখলেন S ; কিন্তু দ্বিতীয় অক্ষর লিখবার পূর্ব্বে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই "S"এর অর্থ Sweetও

হয় এবং Sower'ও হয়। পর বৎসর অপর এক ছাত্র পূর্ব্বাহ্নে একটুকরা কাগজে লিখে রাখে So=Sower এবং S=Sweet; তারপর S এই অক্ষরটী লিখে ঐ সাইনাইডের বিষে সে মারা যায়। বিজ্ঞানের কল্যাণে এইরূপ ভাবে আত্মহত্যা করলে তাদের নাম বিশ্বে চিরবরেণ্য হবে এইরূপ একটী বাহাদুরির নেশা বোধ হয় তাদের পেয়ে বসে। এইজন্যই বোধ হয় তারা এইভাবে হেলায় প্রাণ হারিয়ে থাকেন।

তবে কয়েকটী ক্ষেত্রে ভুল পথে চিন্তাধারা প্রবাহিত হওয়ার জন্যেও কেহ কেহ আত্মহত্যা করেছে। নূতন বৃহত্তর লেকটীতে জল উঠা মাত্র জনৈক বালক তাতে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল। ঐ বালকটীর জামার পকেটে এক টুকরা কাগজে এইরূপ লেখা ছিল—"এই নূতন লেকে আমিই যে প্রথম আত্মহত্যা করলাম ইতিহাসে যেন তা লেখা থাকে।"

এদেশে ছয় প্রকার উপায়ে মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে। যথা—(১) গলায় দড়ি, (২) জলে ডুবা, (৩) অগ্নি প্রদান, (৪) বিষ পান, (৫) উল্লম্ফন, (৬) প্রতিঘাত।

গলায় দড়ি—কড়ি বা অন্য কোনও জিনিষের সঙ্গে একটী দড়ি বা দড়ির মতন করে পাকিয়ে একটী কাপড়ের খুঁট বেঁধে উহার অপর খুঁটটী গলায় ফাঁসের আকারে বেঁধে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ পার্শ্বের একটী তক্তপোষ বা উঁচু টুল বা বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে এই কার্য্য সম্পন্ন করা হয়েছে। ঐ আত্মহন্তারক ঐ টুলটী পদাঘাতে দূরে সরিয়ে দিয়ে বা ঐ উচ্চ স্থান হতে লাফ দিয়ে নীচের দিকে এমন ভাবে ঝুলে পড়ে, যাতে তার পা দুটো মাটীতে না ঠেকে। কণ্ঠনলী ফাঁসের কারণে রুদ্ধ হয়ে দম আটকে মানুষ মারা গিয়েছে, কখনও গ্রীবাস্থি (Medula oblongota)

ভেঙে গিয়েও মানুষ মারা গিয়েছে। জানালার মধ্য-দণ্ডে দড়ি টাঙিয়ে বসে বসেও গলায় দড়ি দিয়ে মরা সম্ভব। অনেকে এই অবস্থায় মৃত ব্যক্তিদের দেখে উহাকে হত্যা মনে করেছেন। কণ্ঠনালী দড়ির চাপে রুদ্ধ হয়ে বা শকের কারণে এদের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে থাকে।

জলে ডুবা—পল্লীবধূরা প্রায়শঃক্ষেত্রে জলেডুবে আত্মহত্যা করেছে। গৃহে আত্মীয়স্বজন পরিবৃত থাকায় আত্মহত্যার সুযোগ তাদের কম, কিন্তু একাকী জল তুলবার জন্যে ঘড়া নিয়ে পুকুরে যেতে এদের বাধা নেই। কিন্তু জলে ডুবা এত সহজ নয়, বিশেষ করে সাঁতারুদের পক্ষে। তা ছাড়া জীবিত অবস্থাতেই দেহ ভেসে উঠে এবং পড়শীরা তাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। এইজন্যে এরা কলসী বা ঘড়াতে পূর্ব্বাহ্নেই ইষ্টক ও প্রস্তর পুরে রাখেন এবং ঐ ভারী ঘড়া বা কলসী তারা গলায় বেঁধে জলের মধ্যে নিজেদের তলিয়ে দেন। স্রোতস্বিনী নদীর স্রোত মানুষকে এমনিই ভাসিয়ে তুলে। এইকারণে এই অপকার্য্যের জন্যে পুকুর ও দীঘিই বেছে নেওয়া হয়েছে। কলিকাতা শহরে নিরালা পুষ্করিণীর অভাব। তবে এই অভাব ঢাকুরিয়ার বৃহৎ লেক বহুল পরিমাণে পূরণ করেছে। কেহ কেহ মোটরসহ বেগে জলের মধ্যে নিজেদের তলিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শহরের আধুনিক ছেলেমেয়েরা নানাকারণে এই লেকে ডুবে আত্মহত্যা করাই পছন্দ করে থাকে।

(৩) অগ্নি প্রদান—পল্লী অঞ্চলের নিরক্ষর মেয়েরাই এই পন্থায় অধিক আত্মহত্যা করেছে। সাধারণতঃ দুয়ার বন্ধ করে শাড়ীতে কেরোসিন তৈল বা স্পিরিট দিয়ে উহাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে। বহু আত্মহন্তারক এই অবস্থায় ছুটাছুটী করেছে, আত্মীয়-স্বজন ছুটে এসে ঐ আগুন নিবিয়েও দিয়েছে। কিন্তু তার পূর্ব্বেই দেহের কিছু অংশ পুড়ে যায়। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও দগ্ধ জনিত 'শকে'র কারণে প্রায়শঃক্ষেত্রে এই সকল অভাগিনীরা মারা গিয়েছে।

(৪) বিষপান—পল্লী অঞ্চলে আত্মহত্যার জন্য বিষ সহজলব্ধ নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু বধূ বিষ পানে গত হয়েছে। সাধারণতঃ আত্মহত্যার কারণে এরা তুঁতে ভক্ষণ করে থাকে। কেহ কেহ কলকে ফুলের বীচি শীলে বেটে তাই খেয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছে। কলকে প্রভৃতি কয়েকটী ফুলের বীচি অত্যন্ত বিষাক্ত। শহরাঞ্চলে মানুষ আত্মহত্যার কারণে অহিফেন ব্যবহার করে। এরা প্রয়োজনীয় পরিমাণের অহিফেন কিনে আনে কিংবা উহা অহিফেনসেবী ঠাকুরমাতা, ঠাকুরদা বা অন্য কাহারও কাছ হতে তারা চুরি করে। অধিক পরিমাণ অহিফেন সহজেই মানুষের মৃত্যু ঘটায়। আধুনিক যুবক যুবতীরা সাধারণতঃ আত্মহত্যার কারণে সাইনাইড্ ব্যবহার করেছে। পূর্ব্বকালে সন্ত্রাসবাদী যুবকরা সাইনাইডের শিশি ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ ঘুরাফিরা করতো। ধরা পড়ার উপক্রম হলে কয়েকজনকে নিহত করে এরা সাইনাইডের সাহায্যে নিজেরাও মরেছে। এইরূপে আত্মহত্যা করবার জন্যে তাদের উপর দলপতিদের নির্দ্দেশ দেওয়া থাকতো, যাতে করে ধরা পড়ার পর দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তারা দলের প্রয়োজনীয় সংবাদ পুলিশের গোচর করতে না পারে। ব্যর্থ প্রেমের কারণেও যুবক যুবতীরা এই সাইনাইডের সাহায্যে আত্মহত্যা করেছে। শহরের কলেজের ল্যাবোরেটারী হতে সহজেই এই সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। এইজন্যে ছাত্রছাত্রীরা এসম্পর্কে এই দ্রব্যই অধিক ব্যবহার করেছে। এদের অনেকে এ্যাসিড আদি বিষও সেবন করে ইহলীলা সংবরণ করেছে। কিন্তু এ্যাসিড সাইনাইডের ন্যায় ত্বরিত-গতিতে এবং বিনা কষ্টে জীবননাশ করে না। এইজন্যে এ্যাসিডপায়ী আত্মহন্তারকরা বহুক্ষণ যাবৎ অত্যন্ত কষ্ট পায়। এই সময় এজন্য অন্তুতাপে এরা দগ্ধও হয়; আশু চিকিৎসার অভাবে যন্ত্রণা পেয়ে এরা মারা গিয়েছে।

(৫) উল্লম্ফন—অসহায় অবস্থায় ঘরে আবদ্ধ থাকায় বহু বধূ উচ্চ

হ'তে লাফ দিয়ে নীচে পড়ে মারা গিয়েছে। কোনও কোনও ভাবপ্রবণ যুবক মনুমেণ্ট বা পাহাড় অর্থাৎ উচ্চ স্থান হ'তে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করেছে। এইজন্য আজকাল কোনও সুউচ্চ মনুমেণ্ট আদির উপর কাউকে একাকী উঠতে দেওয়ার রীতি নেই।

(৬) প্রতিঘাত—নিজে নিজের গলায় ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করেছে এমন বহু নিদর্শন শান্তি-রক্ষকেরা পেয়ে থাকেন। তবে বন্দুকের বা পিস্তলের গুলিতেই এরা সাধারণতঃ মারা যান। কেহ কেহ টুল বা চেয়ারে বসে বন্দুকের পশ্চাদংশ দুই হাঁটুর মধ্যে চেপে উহার নলটি কণ্ঠির নিম্নে রেখে পায়ের আঙুলের সাহায্যে টিগার টেনে মারা গিয়েছেন। পিস্তলটি সাধারণতঃ ডান কানে রেখে উহার টিগারটী টেনে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু টিগার টানার সময় পিস্তলের নল এমনিই কিছুটা পার্শ্বে সরে যায়। এইজন্যে বহু স্থলে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এঁদের কেহ কেহ বেঁচেও গিয়েছেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলির শব্দ শ্রুত হওয়া মাত্র এরা আত্মস্থ হয়ে ভয়ে পিস্তলটি দূরে ফেলে দিয়েছেন।

[এইরূপ বহু প্রকার আত্মহত্যার উপসর্গ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে পুস্তকের ৭ম খণ্ডে তদন্ত সম্পর্কীয় প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হবে।]

১৪ হ'তে ২১, এমনি একটী বয়স যে সময় যুবক যুবতীরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ থাকে। এই বয়সে তারা প্রেমে পড়ে কিংবা দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয় কিংবা রাজনৈতিক কার্য্য কলাপে রত হয়। সাধারণতঃ এই বয়সের বালক বালিকা বা যুবক যুবতীরা সামান্য কারণে বা অকারণে আত্মহত্যা করে।

পৃথিবীর জাতি সমূহের মধ্যে যারা অধিক অভিমানী ও ভাবপ্রবণ, আত্মহন্তারকের সংখ্যা তাদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঙ্গালী জাতির কথা বলা যেতে পারে। এই জাতির মেয়েরা ছেলেদের

চেয়েও ভাবপ্রবণ ও অভিমানী, আত্মসম্মানজ্ঞানীও ; এইজন্যে এদের মেয়েরাই আবাহমানকাল হতে অধিক আত্মহত্যা করেছে। অত্যধিক ভাবপ্রবণতা হিষ্টীরিয়ার নামান্তর মাত্র। আমি মনে করি এই হিষ্টীরিয়ার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সহিত থাকে সাময়িক উন্মাদনা। এই উন্মাদনা মানুষকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে তুলে। এই অবস্থায় বাঙ্গালীরা অতি সহজেই আত্মহত্যা করতে সক্ষম। এইজন্যে প্রতি বৎসর বাঙ্গালীদের বহু ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করতে দেখা গিয়েছে।

পরীক্ষায় ফেল করে কিংবা অবিভাবক কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত বা প্রহৃত হয়ে বহু বাঙ্গালী বালক আত্মহত্যা করেছে। যে তাদের ভালবাসে সে যদি তাকে অবহেলা করে, তা'হলে এদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরেও বহু ভাবপ্রবণ বালক-বালিকা এদেশে আত্মহত্যা করেছে। স্বামীর অবহেলার কারণেও বহু হিন্দু স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন, কারণ স্বামী সোহাগিনী না হ'তে পারা এ দেশে অপরিসীম লজ্জার বিষয়। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"অমুকের বধূ আত্মহত্যার জন্যে অহিফেন সেবন করে, কিন্তু ত্বরিত চিকিৎসার গুণে সে বেঁচে যায়। হাসপাতাল হ'তে তাকে বাড়ী আনা হলে আমি 'আত্মহত্যার প্রচেষ্টা' অপরাধের তদন্ত সম্পর্কে তাদের বাড়ী যাই। জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারি—ঐ বালিকা বধূ তার স্বামীর নিকট আব্দার করে যে তার একটা আয়না বা (আর্শী) চাই। কিন্তু হাতে পয়সা না থাকায় তার স্বামী আকাঙ্ক্ষিত আর্শী স্ত্রীকে কিনে দিতে পারে নি। এই অন্যায় আব্দারের জন্যে সে স্ত্রীর সম্মুখে কিছুটা বিরক্তি প্রকাশও করে ছিল। এই অভিমানে বালিকাটী অহিফেন সেবন করে। অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে আমি দেখি কন্যাটীর শুশ্রূষা চলেছে। তা ছাড়া একটা আর্শীও কিনে তার মাথার শিয়রে রেখে দেওয়া হয়েছে। বধূটী মাঝে

মাঝে আর্শীর দিকে চেয়ে লজ্জায় মুখটা ফিরিয়ে নিচ্ছিল। দেখলাম আত্মহত্যার ঐ মূল কারণটী সুস্থমনা অবস্থায় তার অপরিসীম লজ্জার বিষয় হয়ে উঠেছে। সে আমার সামনেই স্বামীকে অনুযোগ করে বললে 'ঐ আর্শীটা না সরালে এবার আমি সত্য সত্যই আত্মহত্যা করবো। তোমরা কি আমাকে একটুও ক্ষমা করতে পারো না।' বধূটী তার এই অপকর্ম্মের জন্যে আমার কাছেও বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল।"

বাঙ্গালা দেশে মেয়েরা সকলের অত্যাচার সইতে পারে, কিন্তু তার স্বামীর বা ভালবাসার লোকের নিকট হ'তে সামান্য অবহেলাও সইতে পারে না। এরা শাশুড়ী, শ্বশুর, দেবর ও অন্যান্যদের জ্বালা যন্ত্রণা ও গঞ্জনা অহরহ সহ্য করেছে, কিন্তু একবার মাত্র স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিত হয়ে এরা আত্মহত্যা করেছে। খাদ্য বা বস্ত্র না পেলেও এরা অসন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু স্বামীর মিষ্টি কথা বা সহানুভূতির অভাব এদের ক্ষিপ্ত করে তুলে।

কিন্তু কোনও ক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশের মেয়েদের নিকট মাত্র চারিটী পথ উন্মুক্ত থাকে। শ্বশুরালয়ের অত্যাচার ও অবহেলা সহ্য করতে না পেরে প্রথম শ্রেণীর মেয়েরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর বধূরা মুখ বুজে সকল কষ্ট সহ্য করে। এদেরই আমরা সতীসাধ্বী বলে থাকি। কিন্তু প্রদমিত ক্ষোভ, ক্রোধ ও ইচ্ছার অবনমনের কারণে এদের অনেকে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর বধূরা ঘরে থাকে বটে, কিন্তু কলহের প্রত্যুত্তরে কলহ করে। কলহমুখরা হওয়ায় এদের মনের গ্লানি স্বাভাবিক পথে নির্গত হয়। এর ফলে এরা বহুদিন বেঁচে থেকে শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর গৃহের কর্ত্রী হয়। চতুর্থ শ্রেণীর মেয়েরা হয়ে থাকে জীবন-ধর্ম্মী। যৌবনের সুখ তারা হেলায় হারাতে রাজী হয় না। তারা প্রায়ই তেজী ও একরোখা হয়। এই কারণে

দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে এরা নূতন জীবনের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসে।

আধুনিক পরিবারসমূহ হ'তে অবশ্য এইরূপ অনাচার ও অত্যাচার প্রায়শঃ দূরীভূত হয়েছে। বরং এই কালে শাশুড়ীরাই ক্ষেত্রবিশেষে বধূদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।

স্ত্রীপুত্রদের খেতে দিতে অক্ষম হয়ে বা পাওনাদারদের তাগিদায় অস্থির হয়ে বা চাকুরী যোগাড় করতে না পেরে বহু দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তি আত্মহত্যা করে জীবনের দায় এড়িয়েছে। স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের কারণেও বহু লোক আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু লজ্জায় এ কথা একদিনও কাউকে সে বলেনি। পুত্রশোক বা টাকার শোকও বহু লোককে উন্মাদ করে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে। বড় বড় ব্যাঙ্ক ফেলের পর বহু লোক অনাথ হয়ে আত্মহত্যা করে থাকে।

আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে বা আশু কারাগার গমনের আশঙ্কা হলে বহু লোক আত্মহত্যা করে। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, ঘর তল্লাসী করে চোরাই দ্রব্য উদ্ধার করা মাত্র গৃহের মালিক পুলিশের হাত এড়াবার জন্যে পাশের ঘরে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। বহুকাল পূর্ব্বে জনৈক ব্যক্তি ঘোড় দৌড়ের বাজীতে হেরে সর্ব্বস্ব খুইয়ে মাঠের মধ্যে অহিফেন সেবন করে; কিন্তু পরে জানা যায় যে তার ধৃত ঘোড়াটাই প্রথম বাজী জিতেছে। এ সম্বন্ধে সে ভুল খবর পেয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কোনও একটা শোক বা দুঃখ পাবার পর লজ্জায় বা আশঙ্কায় বা অভিমানের কারণে মানুষের মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ঐ লজ্জা বা ক্ষোভের বিষয় বস্তুটী পুনঃ পুনঃ চিন্তা করলে দুর্ব্বল চিত্ত মানুষের মনোবিকার

ঘটে। এর পর এই উন্মাদনার কারণে সে সহসা আত্মবিনাশ করে বসে। কিন্তু জীবনের পথ কখনও সহজ বা সরল নয়। যারা জীবনের যুদ্ধে ভয় পেয়ে আত্মনাশ করে, তারা কাপুরুষ; বস্তুতঃপক্ষে আত্মহন্তারকরা প্রায়ই কাপুরুষ হয়। এদের যা কিছু সাহস তা উন্মাদনার কারণে এসেছে। এইজন্যে ইহাকে প্রকৃত সাহস বলা যায় না।

ব্যর্থ-প্রেম এদেশে আত্মহত্যার অন্যতম কারণ। এই প্রেম সাধারণতঃ উন্মাদনা ও মোহ প্রসূত হয়ে থাকে এবং ইহার মূলে থাকে অজ্ঞতা, হিষ্টীরিয়া, মোহ ও মনোবিকার। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটী বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"এই দিন অমুক বন্ধুর কন্যার আশীর্ব্বাদের নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু প্রত্যুষেই খবর পেলাম, কন্যাটী কলেরায় মারা গেছে। অতএব বিয়ে বা আশীর্ব্বাদ বন্ধ। অকুস্থলে এসে শুনলাম তা নয়, বন্ধুকন্যা আত্মহত্যা করেছে। সাইনাইড্ খাবার পূর্ব্বে সে তুইটী চিঠি লিখে রেখে গেছে। পিতাকে লিখিত চিঠিতে সে অপর চিঠিটী, অমুক (রাস্তার) ঠিকানায় এক যুবককে পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিল। এর পর আমি এই অপর চিঠিটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। পত্রটীর কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

'এই পত্র তোমার কাছে যখন পৌঁছুবে তখন আমি আর ইহজগতে থাকবো না। বড় আশা ছিল আমি জীবনে মরণে তোমারই হবো। কিন্তু বাবা কিছুতেই এতে রাজী হলেন না, কাল রাত্রেই আমার অন্যত্র বিয়ে হবার কথা। কিন্তু প্রিয়তম! তা'ও কি কখনও হয়। বড় সাধ ছিলো তোমার সঙ্গে তোমাদের পল্লীকুঠিতে বাস করবো। সন্ধ্যাবেলায় প্রাঙ্গণের তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দেবো এবং তুমি আমায় পিছন হতে জড়িয়ে ধরে আমাকে চুমা দেবে; ইত্যাদি।'

কন্যাটীর এই মূর্খতা আমাকে ক্ষুব্ধ করে। বেচারার পল্লী সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না। পাড়াগাঁর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বধূকে জড়িয়ে ধরে চুমা দেওয়া যে সম্ভব নয়, তা ছিল তার ধারণার বাইরে। গাঁ ঘরের পদ্দিপিসি, ক্ষ্যান্ত পিসির দল এই দেখে নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করতো না। বেড়ার পাশে, রাস্তার বাঁকে, দুয়ারের ফাঁকে তাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। এই বেহায়াপনা তারা কোনও কালেই বরদাস্ত করেনি। তা ছাড়া স্বামীর পিতামাতাও এই দেখে তাদের ক্ষমা করতো না। এ ছাড়া ছবিতে দেখা পল্লীর সহিত বাস্তবতার কোনও মিল নেই। মশা, মাছি, কাদা, রাত্রির অন্ধকার, কলের জলের অভাবের কথা সে ভাবতে পারেনি। আজন্ম শহরে মানুষ হওয়া আদরের কন্যাকে পল্লীর এই দরিদ্র যুবকের সহিত বিয়ে দিতে এই কারণেই বন্ধুবর রাজী হয়নি। পূর্ব্ব হ'তে বিষয়টী জানলে আমি কন্যাটীকে কিছুদিন আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতে রেখে আসতাম।"

শান্তিরক্ষকরা তদন্ত ব্যাপদেশে আত্মহন্তারকদের দ্বারা লিখিত বহু পত্রাদি প্রতিবৎসর পেয়ে থাকেন। সাধারণতঃ যারা বিষ খায়, তারাই পত্র বেশী লিখে। এই পত্রে পুলিশকেও জানানো হয় যে তার মৃত্যুর জন্যে অন্য কেহ দায়ী নয়, রোগের যন্ত্রণায়, প্রেমের ব্যাপারে, অন্নাভাবে বা অন্যান্য কারণে সে আত্মহত্যা করছে। এই সকল পত্রের কয়েকটী অদ্ভুত রূপ দেখা গিয়েছে। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টী বুঝা যাবে।

"অকুস্থলে এসে দেখি ছেলেটীর মাথাটী শুধু জলের উপর ভাসছে। সহকারী অফিসার আমাকে জানালেন যে ভোরের দিকে আর একটী লাস ভেসে উঠতে পারে। কারণ আজকাল এখানে ডবল সুইসাইডই বেশী হচ্ছে। একা এই লেকে কেহ সুইসাইড করে না। বহু চেষ্টায় লাসটী

উপরে এনে দেখা গেলো, যে মৃত দেহের গলদেশে একটী মাছুলি বাঁধা রয়েছে। মাছুলির দুই পাশে গালা দিয়ে সীল করা ছিল। সিল দুইটি ভেঙে ফেলে দেখলাম আমাদের সন্দেহ অমূলক নয়। মাছুলির ভিতর দুইখানি চিঠি পাওয়া গেল। একখানি পত্রে লেখা ছিল, মামুলি কথা, অর্থাৎ আমি তুমি, তুমি আমি। আমি চল্লাম, তুমি পারো তো আমার সঙ্গে এসো, ইত্যাদি। অপর পত্রটী আরও অদ্ভুত। উহাতে লেখা ছিল, 'যিনি আমাকে প্রথম জল হ'তে তুলবেন, তিনি যদি হিন্দু হ'ন তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বেদবেদান্ত, গীতা ও উপনিষদের নামে তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি ; যদি তিনি বৌদ্ধ হ'ন তো ভগবান তথাগত বুদ্ধদেব ত্রিপিটকের নামে তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি ; যদি তিনি খৃষ্টান হ'ন তো যীশুখৃষ্ট, মাদার মেরী, জেরুজেলাম ও পবিত্র ক্রশের নামে তাকে অনুরোধ করছি ; যদি তিনি মোসলেম হন তো হজরত মহম্মদ, খোদাতালা, পবিত্র মক্কা মদিনার ও কাবার নামে তাঁকে অনুরোধ করছি ; যদি তিনি শিখ হ'ন ত গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ ও গুরু গ্রন্থের নামে তাঁকে অনুরোধ করছি যে তিনি অপর পত্রটী যেন অমুক দেবীকে দিয়ে আসেন।

উপরের পত্রটী ভাবপ্রবণতার এক অপরূপ দৃষ্টান্ত। যে প্রেরণাতে যুবকরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে থাকে, সেই একই প্রেরণাতে এই যুবকটীও প্রাণ উৎসর্গ করেছে। তবে সে তা করেছে দেশের জন্যে নয়, সে তা করেছে প্রেয়সীর জন্যে। আদর্শ উভয়েরই একই ছিল। উদ্দেশ্য মাত্র ছিল ভিন্ন। তবে তার এই আত্মত্যাগ কোনও ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের কাজে লাগেনি, এই যা। বেঁচে থাকলে এজন্যে একে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হতে হতো।

বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় যুবক-যুবতীরা ব্যর্থ-প্রেমের কারণে একত্রে এই

লেকে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছে, কিন্তু তারা তাদের অভিভাবকদের লজ্জা বা ক্ষোভের কারণ হয়ে বেঁচে থাকে নি; যদিও এরা অনায়াসে বাপ-মার মতামত গ্রাহ্য না করেই বিবাহ করতে পারতো। যারা দুই দিক বাঁচাতে চায় তারাই একত্রে এই ভাবে প্রাণত্যাগ করে। ব্যর্থ-প্রেম জনিত আত্মহত্যার অপর কারণ এক তরফা প্রেম। এই ক্ষেত্রে একজন পাগল হলেও অপর জন খুসী মতো সরে পড়ে, কিংবা দয়িতাকে তারা নিষ্ঠুরতার সহিত প্রত্যাখ্যান করে। আমি কোনও এক কন্যাকে বলতে শুনেছিলাম, 'সেন্টিমেণ্টাল ইডিয়েট্! মরেছে ভালোই হয়েছে, খুসী হয়েছি আমি।' কথাটী যে মিথ্যে, তা নয়। যে মরে সে-ই মরে, অন্য কাহারও এতে ক্ষতি হয় না। পৃথিবীও পূর্ব্বের মতই চলে। মৃত্যুর পরপারে কিছু আছে কি'না জানি না। কিন্তু যদি থাকে তা'হলে মৃত্যুর পর নিশ্চয় এজন্যে এরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতো। এই সম্বন্ধে আমি বিদ্রূপ পূর্ণ নিম্নোক্ত গল্পটী লিখেছিলাম। এই গল্পের বিষয় বস্তু হ'তে বক্তব্য বিষয়টী সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"হাঁ ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। কিন্তু তাতেই কি শান্তি আছে। যত রাজ্যের চিন্তা স্বপ্নের মধ্যে বাস্তব হয়ে উঠে। ঘুমিয়েও ঘুমাতে পারি না, হঠাৎ মন আমার সজাগ হয়ে উঠলো। আবার আমি এসেছি লেকের ধারে, এবার আমি একা। টেনে তুললাম দু'দুটা লাস, হাঁ নিজেই টেনে তুললাম। তাদের মধ্যে একজন ছিল যুবক ও আর একজন ছিল যুবতী। তাদের বালক বালিকাও বলা চলে, চোখে মুখে তাদের অকৃত্রিম ভালবাসার ছাপ। তাদের পরস্পরের পা ও হাত এক সঙ্গে রুমাল দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। মৃত্যুর পরও তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না।

লাস দুটো পাশাপাশি সসম্ভ্রমে শুইয়ে দিয়ে ভাবছিলাম, হঠাৎ

দেখলাম ; সর্ব্বনাশ ! একি ? লাস দুটো ঈষৎ নড়ে উঠলো। তারপর সেই দেহ দুটা হ'তে বেরিয়ে এলো, অনুরূপ একটি ছেলে, আর একটী মেয়ে।

ছেলেটী বলে উঠলো, 'ইডিয়েট ! এমনি ক'রে আমার জীবনটা নষ্ট করবার তোর কি দরকার ছিল ? বাঁদরী কোথাকার ! এমন সুন্দর পৃথিবী, ছিঃ ! তোর ছেলেমানুষির জন্যেই না—'

উত্তরে মেয়েটী বললো, 'আমি ইডিয়েট, না তুমি ? হতভাগা ! তুই তো আমার সর্ব্বনাশ করলি, আরও কতদিন আমি বাঁচতে পারতাম। এমন সুন্দর পৃথিবী, আঃ ! তোর জন্যেই না আমি ভোগ করতে পারলাম না। বেরো এখান থেকে।'

এর পর মেয়েটী কোনও দিকে আর দৃক্‌পাত না করে, লেকের একটী দ্বীপের উপর গিয়ে বসলো। তারপর পা দুটো লেকের জলে একবার ডুবিয়ে নিয়ে সাঁ সাঁ করে শূন্যের মধ্যে মিলিয়ে গেল, বোধ হয় তাড়াতাড়ি বিধাতার কাছ হ'তে নূতন করে একটী পরোয়ানা নিয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করবার জন্যে।

ভূমির উপর লাস দুটো তখনও নিস্পন্দ ভাবে পড়েছিল। তাদের দেহ দুটীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ছেলেটীর দিকে তাকালাম। তখনও সে তার পুরাণো আবাস, সেই মৃতদেহটীর প্রতি সকরুণ দৃষ্টি রেখে সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ দেখলাম ফুটে উঠছে তার মুখে ও চোখে এক নিদারুণ যন্ত্রণার ছাপ। শূন্যের দিকে চেয়ে মুখ ভেঙচে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সে সামনের তালগাছটা বেয়ে সড় সড় করে উপরে উঠে গেল, বোধ হয় গাছের উপর বসে কিছুক্ষণ নিশ্বাস নেবার জন্যে।"

উপরের এই কথাচিত্রটী হতে বুঝা যাবে যে মনুষ্য জীবনে অহেতুক ভাবপ্রবণতার কোনও স্থান নেই। এইভাবে মরে তাদের ইহজীবন বা পরজীবন কোনও জীবনেই সুখভোগ করা সম্ভব হয় নি।

অকারণ মনোবিকার

কারণ প্রসূত মনোবিকারজনিত আত্মহত্যার কথা বলা হলো। এইবার আমি অকারণ মনোবিকার প্রসূত রোগ সম্বন্ধে বলবো।

কারণ প্রসূত মনোবিকার মানুষের বোধগম্য থাকে। ক্রোধ, আত্মাভিমান, ব্যর্থ-প্রেম, দুঃখ প্রভৃতির কারণে এই রোগ জন্মে এবং উহা মানুষের মধ্যে উন্মাদনার সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় মানুষ ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করে বসেছে—কিছুটা সময় পেলে এরা আত্মস্থ হয়ে এইরূপ কার্য্য হ'তে বিরত থাকতো, কিন্তু উন্মাদনার কারণে তারা এতো তাড়াতাড়ি এই কাজ করে বসে যে পরে আর বাঁচবার তাদের কোনও উপায়ই থাকে না।

অপরদিকে অকারণ মনোবিকার মানুষের বোধগম্য হয় না। মানসিক রোগের কারণে এই রোগ এসে থাকে। এই রোগ ভুল ধারণা বা প্রদমিত ভয় ও স্পৃহার কারণে উপগত হয়েছে। মনোবিশ্লেষণ দ্বারা এই রোগের প্রকৃত কারণ অবগত হয়ে বাক্-প্রয়োগ দ্বারা উহা অচিরে দূরীভূত করা উচিত। এই রোগের রোগী যে কি চায় তা সে নিজেই বুঝে না বা জানে না। এইজন্য তাকে এ বিষয়ে বুঝানোও সকল সময় সম্ভব হয় নি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রোগী যে কি চায় তা সে জানে, কিন্তু কেন সে তা চায়, তা সে বুঝতে পারে না। এক অজানা ভয় ও যন্ত্রণা যুক্ত চিন্তা অকারণে মুহুর্মুহুঃ তাকে আঘাত করে। এই কারণে কিছুতেই

সে শান্তি পায় না। এই দুঃসহ অকারণ-চিন্তা-রোগ হ'তে অব্যাহতি পাবার জন্যে বহু রোগী অধৈর্য্য হয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু রোগীদের বুঝা উচিত যে এই রোগ সারে এবং সারানোও যায়। এইজন্য এদের ধৈর্য্য ধরবার জন্য অনুরোধ করবো। কিছু দিন পর এমনিই এই মনোরোগ তাদের সেরে যাবে। অপরের সাহায্য পেলে মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেরে যায়। বহু ক্ষেত্রে এই অবিশ্বাস্য মনোরোগের কথা রোগী কাউকে বলতে পারে নি। কাউকে বলতে পারলে আলোচনা ও কারণ নির্ণয় দ্বারা সে অচিরেই নিরাময় হ'তো। কয়েক মিনিট বাক্-প্রয়োগ ও কারণ বিশ্লেষণ দ্বারা (পুস্তকের প্রথম খণ্ড দেখুন) এই রোগ চিরতরে নিরাময় করা যায়।

মানসিক রোগ সমূহের মধ্যে চিন্তা রোগ অন্যতম। এই চিন্তা রোগ দুই প্রকারের হয়। প্রথম ক্ষেত্রে কোনও একটী বিশেষ চিন্তা মানুষের অপরাপর চিন্তার ঊর্দ্ধে উঠে মানুষকে নিয়ত আঘাত হানে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানুষের মন কোনও একটী বিশেষ চিন্তা অধিকক্ষণ ধরে রাখতে অক্ষম হয়। একটীর পর একটী চিন্তা মনে এসে মুহুর্মুহুঃ তাকে বিরক্ত করে বা ভয় দেখায়। এইরূপ অবস্থায় মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। এই অবস্থায় এই অকারণ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মানুষ আত্মহত্যা করে বসে।

চিন্তা দুই প্রকারের হয়। যথা, আনন্দদায়ক (pleasent) এবং নিরানন্দ (unpleasant) চিন্তা। এদেশের সাধু সন্ন্যাসীরা বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা ভাবে সমাধিস্থ হয়ে সদাসর্ব্বদা একরূপ বিমল আনন্দময় চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। ইহা একপ্রকার রোগ হলেও ইহা এক আনন্দদায়ক রোগ। অন্যদিকে ভয় বা দুঃখ সহ যে চিন্তা আসে তাকে আমরা নিরানন্দ চিন্তা বলি। এই নিরানন্দ চিন্তা মুহুর্মুহুঃ বা সদাসর্ব্বদা

মনে হলে মানুষ যন্ত্রণা অনুভব করে। অথচ এই চিন্তা কেন বারে বারে আসছে এবং উহা তার কাছে নিরানন্দরূপেই বা প্রকাশ পাচ্ছে কেন? তা রোগী কিছুতে বুঝে উঠতে পারে না। যে চিন্তা বা তত্ত্ব অন্য কাহারও মনে আসে না এবং আসলেও তার মনে তা আমল পায় না। সেই একই চিন্তা তাকেই বা কেন উত্যক্ত করে বা ব্যথা দেয় তা তার কিছুতেই বোধগম্য হয় না। সে প্রাণপণে এই অহেতুক যন্ত্রণাযুক্ত এবং ভীতিপ্রদ চিন্তা মন হ'তে দূর করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও উহা তার অপরাপর চিন্তার উর্দ্ধে উঠে তাকে অবিরত ত্যক্ত করে। কিন্তু এতো সত্ত্বেও সে তার এই যন্ত্রণার কথা কাকেও বলতে পারে নি। উহা কাউকে সে বললে আলোচনার মধ্যে এর প্রকৃত ঔষধের নিশ্চয়ই সন্ধান মিলতো। কিন্তু এদের ধারণা হয় যে এই অহেতুক চিন্তার কথা কেহ বিশ্বাস করবে না। এইজন্য তারা দুঃসহ জ্বালা সহ্য করলেও একথা কাকেও বলে না। একাগ্রচিত্তে কোনও কাজে মন দিতে পারলে হয়ত কিছুক্ষণের জন্য এই চিন্তা হ'তে সে অব্যাহতি পেয়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই ঐ চিন্তা পুনরায় উদয় হয়ে তাকে উত্যক্ত করেছে! সাধারণভাবে এই যন্ত্রণা সহ্য করেও সে কাজকর্ম্ম করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও রাত্রে ঘুমাতে পারে নি। কিছুক্ষণ ঘুমালেও জাগ্রত হওয়া মাত্র পুনরায় চিন্তারোগে আক্রান্ত হয়েছে—মাত্র একটী বিশেষ নিরানন্দ ও ভীতিপ্রদ চিন্তা; কিছুতেই এই চিন্তা হ'তে মুক্ত হ'তে না পেরে বহু ব্যক্তিই অকারণে আত্মহত্যা করেছে।

নিম্নের পত্রটী হ'তে বিষয়টী বুঝা যাবে। আমার জনৈক ডাক্তার বন্ধু বিষ পানের পূর্ব্বে এই পত্রটী লিখে রেখেছিলেন।

"প্রিয় ছেলেমেয়েরা, আজ তোমাদের নিকট হ'তে বিদায় নিতে বাধ্য হ'লাম। কি অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে মুহুর্মুহুঃ আমি ভুগছি, তা তোমাদের

আমি বুঝাতে পারবো না। কিছুতেই এই অকারণ চিন্তা হ'তে আমি মুক্ত হ'তে পারছি না। এ যে কি রোগ? তা ঈশ্বরই জানে। দৈহিক যে কোনও রোগ আমি সহ্য করতে পারতাম, কিন্তু এ কি? আমি যখন অপারেশন করবার জন্য ছুরি ধরি, মাত্র তখনই একটু এই চিন্তা হ'তে আমি মুক্ত হই। কিন্তু ছুরিখানি নামিয়ে রাখামাত্র পুনরায় ঐ রোগ আমায় পেয়ে বসে। অথচ এই চিন্তার মধ্যে ভয় বা ভাবনার কোনও কারণ নেই। আমি নিজেকে প্রাণপণে বুঝিয়েছি, কিন্তু বুঝিয়েও বুঝাতে পারছি না। আত্মহত্যা করা ছাড়া মুক্তির আর উপায় ছিল না।"

ইতিমধ্যে বন্ধুবরের সহিত বহুবার দেখা হয়েছে, কিন্তু এই রোগের কথা আমাকে একবারও জানান নি। আমি তাকে প্রতিদিন সহজ মানুষই দেখেছি। তাকে সারাক্ষণ আমি বিষণ্ণ দেখলেও অসুস্থ দেখি নি। এই রোগ অতি সহজেই সারানো যায়। কয়েক মিনিট বাক্-প্রয়োগ ও কারণ বিশ্লেষণই যথেষ্ট। বহুক্ষেত্রে স্ববাক্-প্রয়োগে এই রোগ সেরে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পর-বাক্-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এই রোগের মূল কারণ জানতে হ'লে মনোবিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। অপর কাহারও মনে এই অকারণ চিন্তার উদয় হয় না, কিন্তু এরই মনেই বা তা হয় কেন? কিন্তু এতো কথা জানবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। জানবার চেষ্টা করলে ঐ রোগ না সেরে একটী চিন্তার সহিত অপর চিন্তা জড়িয়ে গিয়ে ফল আরও খারাপ হতে পারে। কোনও একটী আনন্দদায়ক চিন্তা কেন এলো? তা মনোবিশ্লেষণ করে জানলে ক্ষতি হয় না; কিন্তু চিন্তা নিরানন্দ হ'লে মনোবিশ্লেষণ সাবধানে করা উচিত, তা না হলে বিপদ আছে। এখানে মানুষ তার চেতন মনে কোনও একটী বিষয় বিশ্বাস বা পছন্দ না করলেও

তার অবচেতন মন তা করে। চেতন মন যখন বলে, হাঁ; অবচেতন মন তখন বলে না। বিষয়টী দ্বন্দ্বরত অবস্থায় অবচেতন মনে তলিয়ে গেলে মানুষের মধ্যে বহু বিসদৃশ ব্যবহার দেখা যায়। এই অবস্থায় প্রকৃত সমস্যা কোথায়? তা জানবার জন্য মনোবিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। প্রকৃত সমস্যা কোথায়? তা জ্ঞাত হয়ে বাক্-প্রয়োগ দ্বারা উহা বিদূরিত করতে হবে। মনোবিশ্লেষণের রীতিনীতি সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রোগীর মনের প্রকৃত চিন্তা কি? বা তার মূল সমস্যা কোথায়? তা রোগী বলতে পারলে কারণ জ্ঞাতার্থে মনোবিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি হলেও রোগীর রোগ সারে না। যে সকল নিরানন্দ চিন্তা বা সমস্যা মন হতে বহুদিন পূর্ব্বে অন্তর্নিহিত হয়েছে, সেইগুলি পর্য্যন্ত রোগীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে পাগলে পরিণত করা হয় মাত্র।

এমন বহু রোগী আছে, যাদের সর্ব্বদাই ভয় ভয় করে। তাদের মন সর্ব্বদাই দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে। কিন্তু তাদের দুঃখ বা ভয়ের প্রকৃত কারণ কি? তা তারা বলতে পারে না। এই অবস্থায় অবশ্য এই ভয় ও দুঃখের মূল কারণ কি—তাহা জানাবার জন্য মনোবিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু রোগীরা যদি বলতে পারে, যে তাদের মনে কি কি অহেতুক চিন্তার উদয় হচ্ছে, তাহ'লে এর একমাত্র ঔষধ বাক্-প্রয়োগ ও কারণ নির্ণয়, অকারণে মনোবিশ্লেষণ নয়।

চেতন মন কি জানতে বা শুনতে চায়, কি শুনলে তার চেতন মন শান্ত বা খুসী হয়; কিংবা কিরূপ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা চেতন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্বের চিরতরে অবসান হয়; সর্ব্বাগ্রে ইহা জানা দরকার। চেতন মন যখন বলে, হাঁ। অবচেতন মন তখন বলে, না। এই বিষয় দুইটী দ্বন্দ্বরত

থাকলেও দ্বন্দ্বের মূল কারণ মানুষ বিস্মৃত হয়। চেতন মন একটী বিষয় বিশ্বাস করলেও অবচেতন মন তাহা করে না। এই রোগীর চেতন মন যাঁকে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে স্বীকার করে, এমন কোনও এক ব্যক্তি এই সময় যদি ঐ রোগীর চেতন মনকে সমর্থন করে জানায় যে হাঁ, তোমার কথাই ঠিক এবং অবচেতন মনের ধারণা ভুল তাহ'লে রোগী অচিরে নিরাময় হয়ে যায়। অর্থাৎ চিকিৎসকের উচিত যে কোনও উপায়ে এই চেতন মনকে অবচেতন মনের সহিত এই যুদ্ধে জয়যুক্ত করে দেওয়া। পুনঃ পুনঃ পর বা স্ববাক্-প্রয়োগ দ্বারা এই রোগ নিরাময় হতে পারে। হাঁ, তোমার ধারণাই ঠিক তুমি যা ভেবেছো তা'ই সত্য; ইত্যাদি কথাগুলি এই অবস্থায় বাক্-প্রয়োগের কাজ করবে। যদি মিথ্যা বলার বা ধাপ্পা দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তা'ও ভালো। তবে যে স্থলে মাত্র চেতন মন সমস্যার সমাধান চায়, সেস্থলে প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে দেওয়া ভালো। চতুর ও শিক্ষিত লোকেদের জন্য এই ব্যবস্থা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। এই ক্ষেত্রে এই চিন্তা বিদূরিত না করে উহার সমাধানের প্রয়োজন। তা না হ'লে উহা মনের নিম্ন স্তরে নেমে মনোরোগের কারণ হ'তে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে। কোনও এক ব্যক্তির মনে উদয় হলো, ঈশ্বর আছে কি'না? এই চিন্তার সমাধান করতে না পেরে, সে অস্থির হয়ে উ'ঠলো। কোনও একটী বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষা ভালো। কিন্তু অত্যুগ্র হলে উহা রোগে পরিণত হয়। এই চিন্তার মধ্যে ভয় বা দুঃখ না থাকলেও অস্থিরতা থাকে। ঈশ্বর যে আছে তা সে—আশৈশব বিশ্বাস করেছে, এক্ষেত্রে সে ইহার প্রমাণ চেয়েছে। কিন্তু আশৈশব "ভূত" অবিশ্বাস করে যদি সে সহসা উহার চাক্ষুস কোনও প্রমাণ পায়। তাহ'লে সে নিশ্চয়ই এক ভীতিপ্রদ নিরানন্দ চিন্তাজনিত অস্থির হয়ে উঠে। তার বিজ্ঞমন বুঝতে পারে যে

নিশ্চয়ই ভূত বলে কোনও কিছু পৃথিবীতে নেই। এ সম্বন্ধে যা শুনা যায় তা ম্যাজিক ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অস্থির হয়ে সে ভাবে যে তাহ'লে ঐ ব্যক্তি ঐ ভূত দেখলো কেমন করে। যে ভূতকে সে অবিশ্বাস বা অবহেলা করেছে, সেই ভূত তার ভয়ের কারণ হয়। এই ভয় মনের উপর স্থায়ী কোনও ছাপ না রাখে তো ভালো; কিন্তু উহা যদি 'হাঁ বা না' এই অন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রসূত চিন্তা রোগের সৃষ্টি করে, তাহ'লে এই রোগ তাকে ভয় দেখায় বা দুঃখ দেয়। মানুষের পূর্ব্বতন অহমিকা চেতন মন হ'তে এই ভয় দূরীভূত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে তা সে পারে না। তবে কখনও কখনও সে এই চিন্তা নিজেও দূরীভূত যে না করেছে তা'ও নয়। এক্ষেত্রে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে কোনও প্রবঞ্চক ব্যক্তি তাঁকে এ সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়েছে মাত্র।

এই রোগগ্রস্ত মনকে একটী মাত্র (পোক্) বা "শিক" ভাঙা সাই-কেলের চাকার সহিত তুলনা করা চলে। এই চাকা চলে বটে, কিন্তু কিছু অসুবিধার সহিত চলে। এবং উহাতে খটখট বা ঘড়াৎ ঘড়াৎ আওয়াজ হয়। জোরে নাড়া দিলে উহা স্বস্থানে পুনঃ সংস্থাপিত হতেও পারে। সেইরূপে মনের এই বিকৃত অংশ কাজকর্ম্মে নিয়ত নিরত থেকে অন্যমনস্কতা দ্বারা বা উগ্র আঘ্রাণ গ্রহণ করে বা যৌন তৃপ্তি কিংবা নেশা দ্বারা কিংবা নূতন পরিবেশে এসে মানুষ নিরাময় হয়েছে। এই বিকৃত মনকে স্বস্থানে সংস্থাপিত করে ঝালাই করেও দেওয়া চলে। ইহাতে পুনরায় উহা বিচ্ছিন্ন হয় না। এই ঝালাই করার সহিত পুনঃ পুনঃ বাক্-প্রয়োগ ও কারণ-বিশ্লেষণের তুলনা করা চলে। ইহাতে রোগী স্থায়ীরূপে নিরাময় হয়ে যায়, তা না হলে সামান্য কারণে পুনরায় ঐ চিন্তারোগ ফিরে আসতে পারে।

[ঐ বিষয়ক কোন শব্দ শ্রুত হলে বা উহা তার দৃষ্টিপথে পতিত হলেও মানুষ কিছু সময়ের জন্য ঐ রোগে পুনরাক্রান্ত হতে পারে। এই অবস্থায় চিন্তারোগ দুই বা তিনদিন স্থায়ী হ'তে পারে, কিন্তু উপযুক্ত বাক্-প্রয়োগ দ্বারা রোগী ত্বরায় নিরাময়ও হ'তে পারে।]

মানসিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে আমি পুস্তকের ১ম খণ্ডে আলোচনা করেছি, এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ করবো না। বাক্-প্রয়োগ সূচক সামান্য কথা, যথা "ওঃ কিচ্ছু নয়", বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির মুখে শুনে বহু রোগী নিরাময় হয়েছে। কোনও এক ব্যক্তি দেখতে পায় গঙ্গা বেয়ে বহু মন ওজনের বিচুলি বোঝাই একটী নৌকা চলেছে। সহসা লোকটীর মাথায় এলো, এতো বিচুলি ওরা রাখবে কোথায়? এই অকারণ চিন্তায় সে পাগল হয়ে উঠেছিল। এই সময় জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে বলে দেয়, কোথায় রাখবে? জানো না বুঝি? নৌকটা এগিয়ে গিয়েই ডুবে গিয়েছিল। বিচুলির একটী তাড়াও উদ্ধার করা যায়নি। এই কথা শুনে 'তাই নাকি?' এই বলে লোকটী আত্মস্থ হয়ে নিরাময় হয়েছিল। অবিশ্বাসী মানুষ যোগ অভ্যাস বা অলৌকিক ব্যাপার পরীক্ষা করতে গিয়ে—পাগলে পরিণত হয়েছে। যা তারা বিশ্বাস করে তা অবিশ্বাস্য কি'না? তা পরীক্ষা দ্বারা যারা জানে তাদের ততো ক্ষতি হয় না। এই বিষয়ে তারা সামান্য বেদনা পায় মাত্র। কিন্তু অবিশ্বাস করে যদি তা বিশ্বাস্য হয়, তাহ'লে তা তাদের অস্থির করে। কিন্তু বিশ্বাস্য কিংবা অবিশ্বাস্য, 'হাঁ কিংবা না' এই বিষয় নিয়ে যদি চেতন ও অবচেতন মনে দ্বন্দ্ব বাধে এবং কেহ কাহাকে হটিয়ে দিতে না পারে এবং উপরন্তু এই চিন্তা যদি নিরানন্দ ও দীর্ঘ স্থায়ী হয় তাহ'লে উহাকে চিন্তা-রোগ বলা হয়।

ম্যাজিক অনেকেই দেখে, কিন্তু এই ব্যাপার সত্যই অলৌকিক কি

না ? এই চিন্তা কাউকে অহরহ দগ্ধ করে না। কিন্তু রোগগ্রস্ত মানুষকে তা অস্থির করে। সহসা ভয় বা দুঃখ পেলে এই চিন্তা তার মনে স্থায়ী-ভাবে শিকড় গাড়ে। এমন কি নিরাময় হওয়ার পরও ঐ ভয় বা দুঃখ ঐ সম্পর্কীয় শব্দ বা বাক্য শ্রবণ মাত্র তার মনে পুনরায় ফিরে আসতে পারে।

আমার বক্তব্য বিষয়টী নিম্নের বিবৃতিটী হতে সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি ভূত প্রেতে কখনও বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু কোন এক ওঝা হাতের কসরতের সাহায্যে কলসীর জলের মধ্যে আমার পরিচিত এক মৃত ব্যক্তির ছবি দেখায়। উহা সে ফটো কাঁচের সাহায্যে টীকস্ দ্বারা দেখালেও তা আমি বিশ্বাস করি। আমার অবিশ্বাসী মনকে উহা নাড়া দিয়ে বিকৃত করে দেয়। আমি ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলাম। মনের কিছুটা অংশ মূল মন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলো। সকল চিন্তার উর্দ্ধে উঠে মাত্র এই একটী চিন্তাই মুহুর্মুহুঃ আমার মনে উদয় হতে থাকে। কি করে তা সম্ভব হয় ? সত্যই কি ওটা বন্ধুর চেহারা। কোথা থেকে তা এলো। না তা সবই মিথ্যা ? ইত্যাদি। আমি কিছুতে শান্তি পাচ্ছিলাম না। স্ববাক্-প্রয়োগ দ্বারা মনকে বুঝাতে চেষ্টা করি 'ও সব ধাপ্পা।' আবার মনে হলো, হয়তো তা নয়। এর পর আমি মিলিটারীতে ঢুকি। দিন রাত্র প্যারেড ও পড়াশুনায় ব্যস্ত থেকে আমি নিরাময় হয়ে যাই। কিন্তু 'ভূত' শব্দটী আমি শ্রবণ করা মাত্র ঐ অব্যক্ত বেদনাময় চিন্তা পুনরায় আমাকে উত্যক্ত করেছে। আমার জনৈক মনস্তত্ত্ববিদ বন্ধুকে বিষয়টী খুলে বলে ফেলি, কিন্তু বলবার সময় আমি কেঁপে কেঁপে উঠেছিলাম। বন্ধুবর উহা যে হাতের কায়দা মাত্র তা আমাকে বুঝিয়ে দেন। এর পর আমি স্থায়ী ভাবে নিরাময় হয়েছি।"

প্রদমিত ভয় অত্যন্ত ক্ষতি করে। 'সাহসীরা একবার মরে, কিন্তু

ভিরুরা মরে বহুবার'—এই প্রবচনটী অতীব সত্য। ভূত প্রেতের ভয়, জীবন-ধারণের ভয়, সম্মানহানীর ভয়, যৌন রোগের ভয়, মৃত্যুর ভয়, বৃদ্ধ হবার ভয়, অর্থ বা প্রাণ নাশের ভয়, কখনও মানুষকে সুখী করতে পারেনি। জীবন মৃত্যু, মান অপমান সম্বন্ধে বেপরোয়া ব্যক্তিরা এইজন্য মানসিক রোগে কম ভুগে। মানসিক রোগে শিক্ষিত লোকেরা অধিক ভুগে। অশিক্ষিত ও অজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে উহা কদাচিৎ দেখা গিয়েছে। যাদের বিচার শক্তি নেই, তাদের চিন্তার কারণও নেই। এইজন্য ইংরাজীতে বলা হয়, 'ইগ্নোরেন্স্ ইজ্ ব্লিস্'। সভ্যতা ও শিক্ষার বহু অবদান আছে কিন্তু উহার অপদান হচ্ছে মানসিক রোগ বা মনোবিকার। মানসিক রোগের কারণে শিক্ষিত লোকেরা অধিক আত্মহত্যা করেছে। অন্য দিকে নিরক্ষর ব্যক্তিরা তা প্রায়ই করেনি।

বিচার বুদ্ধি কম থাকায় অজ্ঞ লোকদের মনোরোগ বাক্-প্রয়োগ বা ঝাড় ফুঁকের মহড়া দ্বারা সহজে নিরাময় করা যায়। মানুষের নিরানন্দ চিন্তাকে বাক্-প্রয়োগ দ্বারা ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে আনন্দদায়ক, উপভোগ্য বা অগ্রাহ্যত্বক করা সম্ভব। তবে তা একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে করা উচিত হবে।

দ্বন্দ্বরত চিন্তাদ্বয়ের কোন্টী আনন্দদায়ক এবং কোন্টী বা নিরানন্দ তা রোগীর নিকটে কৌশলে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। উহা দ্বন্দ্বরত অবস্থায় মনোতলে ডুবে না গেলে রোগী তা জানাতে সক্ষম। এই ক্ষেত্রে মনোবিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, কারণ রোগী তার এই অশান্তির কারণ সম্বন্ধে সচেতন। এর পর চিকিৎসকের উচিত ঐ আনন্দদায়ক চিন্তার পক্ষে এবং নিরানন্দ চিন্তার বিপক্ষে রায় দেওয়া এবং উহার অসারতা সম্বন্ধে রোগীকে অবহিত করা এবং পরে পুনঃ পুনঃ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা ঐ চিন্তা তার মন হতে দূর করতে তাকে সাহায্য করা।

যদি দেখা যায় রোগীর চেতন মন কোনও জিনিস বিশ্বাস করে না, বা তার অবচেতন মনের 'না' (বা হাঁ) সে পছন্দ করছে না, তাহ'লে চেতন মনের মনোপুতঃ 'বাক্-প্রয়োগ' প্রয়োগ করা উচিত। একই বাক্-প্রয়োগ বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা প্রযুক্ত হলে আরো ভালো হয়। তাহ'লে রোগী অবচেতন মনের এই 'হাঁ বা না'কে সহজে বিদূরিত করে নিরাময় হবে। চিকিৎসক যদি দেখেন যে চেতন মনের ধারণা বা ইচ্ছা ভুল বা অন্যায়, তাহ'লেও তার এই অন্যায় বা ভুলকে সমর্থন করে বিবৃতি দিতে হবে কিম্বা ঐ ভাবে তা তাকে সম্ভব মত ও সুবিধা মত বুঝাতে হবে। কেহ যদি চেতন মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অকারণে রায় দিয়ে বসেন তাহ'লে তিনি তার ক্ষতি করবেন।

কেহ হয়তো অলৌকিক ক্রিয়া বা মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। এই বিশ্বাস করা বা না করার জন্য জগতের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেহ তাকে এইগুলিতে বিশ্বাস করাতে যান তাহ'লে তিনি তার বিশেষ অশান্তির কারণ হবেন। মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ও মানসিক রোগের ডাক্তারেরা কেহ কেহ চিকিৎসার অজুহাতে রোগীকে বহু দিন পর্য্যন্ত আয়ত্তে রাখবার উদ্দেশ্যে অপরাধ করেছেন। বহু ক্ষেত্রে এই অপকর্ম্মের কারণে রোগী চিকিৎসকের আয়ত্তের বাইরে চলে এসে পাগলে পরিণত হয়ে গিয়েছে। প্রায়ই দুর্ব্বল চিত্ত বা ভাবপ্রবণ ব্যক্তিগণ এবং সরল চিত্ত ব্যক্তিগণ নানা কারণে নানাপ্রকার মানসিক রোগে সাময়িকভাবে ভুগে থাকেন। এই সকল মানসিক রোগ সামান্য মাত্র বাক্-প্রয়োগ বা ব্যাখ্যার দ্বারা সহজেই নিরাময় হয়। কিন্তু এত সহজে নিরাময় ক'রে দিলে ৫০৲ টাকা ফি প্রতিবারে গ্রহণ করা যায় না। এই কারণে রোগী এবং তাদের অভিভাবকদের ভয় খাইয়ে এই রোগকে কিছু দিন পর্য্যন্ত জাগিয়ে বা জিইয়ে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটী বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

'সহসা একদিন ভয় পেয়ে আমার মনে একটা অহেতুক চিন্তা রোগের উৎপত্তি হলো। কিছুতেই এই চিন্তা আমার মন হইতে বিলীন হচ্ছিল না। এই চিন্তার প্রকৃত সমাধান আমি করতে পারছিলাম না। এই কারণে আমি শান্তিও পাচ্ছিলাম না। এই অদ্ভুৎ রোগের কথা কাকেও বলা যায় না। কারণ উহা কেহ বিশ্বাসও করবে না। কাউকে এ কথা বলতে পারলে আলাপ আলোচনার পর আমি নিশ্চয়ই নিরাময় হতাম। আমার মন এইটুকুই চাইছিল যে কেহ এসে বলুক, ও সব বাজে, মিথ্যে। ভাববার দরকার নেই। * এর পর আমি এক মনস্তত্ত্বের প্রফেসারের নিকট বিষয়টী গোপনে জানাই। তিনি এজন্য আমাকে কোনও সান্তনার কথা না শুনিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন, 'এ্যাঁ, তাই না'কি? বলো কি? এই রকম? তোমার বাপ মা আছে তো? তারা কোথায়? জানো এতে তুমি পাগল হয়ে যেতে পারো। তোমাকে সারাতে হ'লে মনো বিশ্লেষণের দরকার। দশ বারোবার সিটিঙের কমে সুফল হবে না। তা'ও তুমি যে এতেও সেরে যাবে সে কথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি না। পারবে প্রতিবারে ৪০৲টাকা করে ফিঃ দিতে, এ্যাঁ?' তার এই ভীতিপ্রদ উক্তিতে আমার এই রোগ আরও বেড়ে যায়। এই সময় আমি ভয়ে কাঁপতে থাকি। এর পর আমি পাড়ার এক কবিরাজের কাছে বিষয়টী জানিয়ে কেঁদে ফেলি। তিনি সব কথা শুনে সেই মানসিক রোগের চিকিৎসককে গাল দিতে থাকেন। এবং আমাকে কাছে বসিয়ে অভয় দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা ছেলে

* এক্ষেত্রে যদি কেহ ভর্ৎসনা করে বলে পাগলামী করো না। তাহ'লে তার ফল ভালো হবে না। সহানুভূতির সহিত ওয়াকীবহালভাবে বাক্-প্রয়োগ করতে হবে। এমন কি মিথ্যা করেও বলতে হবে, অমুকের এইরকম হয়েছিল, কিন্তু এই করে সেরে গেল। এই ঔষধটা না হয় খেয়ে নাও; তা'হলেই নিরাময় হবে, ইত্যাদি।

মানুষ তো তুমি ? কিছুই হয়নি তোমার। এরকম অসুখ ছেলেমেয়েদের প্রায়ই হয়ে থাকে। 'একে ব্যাচিলার ডিসিজ' বলে। বিয়ে করলেই সেরে যাবে। তোমার মনে এই সব প্রশ্ন উঠছে তো ? ওগুলোর অর্থ হচ্ছে এইরূপ। এই জন্যই এই সব হয়, বুঝলে ? কেমন, এইবার বুঝতে পারছ তো ? এখন বাড়ী যাও। বাড়ী গিয়ে দু'গেলাস নিমপাতার রস খেয়ে ফেলো।' নিমপাতার রস আমাকে খেতে হয় নি। কবিরাজ দাদুর বোঝাবার গুণে আমি নিরাময় হ'য়ে যাই।"

মানুষের মন আজও দুর্জ্ঞেয়। অন্ধকারে নিদানের জন্য আমরা হাতড়ে বেড়ায় মাত্র। অনেক সময় মনের জোট ছাড়াবার চেষ্টা করে আমরা মনের মূল সূত্রটী ছিঁড়ে ফেলেছি। এই কারণে মনোবিশ্লেষণ একমাত্র সুস্থ-মনা মানুষকে নিয়ে করা উচিত। অসুস্থ মানুষের মনোবিশ্লেষণ তাদের অজ্ঞাতসারে করাই ভালো। বাক্-প্রয়োগ এবং কারণ নির্ণয়ের দ্বারা রোগীকে নিরাময় করা সম্ভব হ'লে মনোবিশ্লেষণের দ্বারা বিষয়টীকে জটীলতর করা নিষ্প্রয়োজন। এমন বহু পণ্ডিত আছেন, যাঁরা জানতে চেষ্টা করেন, 'কেন তার এই রোগ হলো ?' রোগীর রোগ নিরাময় করা অপেক্ষা রোগের কারণ জ্ঞাত হওয়ার জন্যই তারা ব্যস্ত হন। এতদ্বারা তাঁরা এই রোগের কারণ জ্ঞাত হ'তে পারেন, কিন্তু এই সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করার জন্যে মূল রোগটী তাঁরা সারাতে পারেন না। উপরন্তু রোগীর রোগটীকে জটিল হ'তে জটিলতর করে তুলেন।

এই ভুল চিকিৎসার কারণে বহু মনোরোগী আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা-যন্ত্রণা হ'তে অব্যাহতি পেয়েছে। কিন্তু এইজন্য এই চিকিৎসকদের কোনরূপও শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় না।

উন্মদনার কারণেও মানুষ আত্মহত্যা করেছে। এই অবস্থায় আত্মহত্যার একটা 'মেনিয়া' তাকে পেয়ে বসে। এই স্পৃহা স্থায়ীরূপে প্রকাশ

পেলে উহাকে উন্মাদনা বলা হয়। কিন্তু এই স্পৃহা ক্ষণস্থায়ীরূপেও প্রকাশ পেয়ে থাকে। কেহ যদি ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকাতে তাকাতে চিন্তা করে, এবার লাফিয়ে নীচে পড়লে কেমন হয়। তাহ'লে দেখা যাবে যে লাফিয়ে পড়ার জন্য এক দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা তাকে পেয়ে বসেছে। এমন কি সহসা উন্মাদ হয়ে বা ঝোঁকের মাথায় সে নীচে লাফিয়েও পড়তে পারে। এই ক্ষণস্থায়ী উন্মাদনা মনোরোগের কারণেও এসে থাকে। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বক্তব্য বিষয়টী বুঝা যাবে।

"কোনও এক ঘটনার পর আমার এক উৎকট মানসিক রোগ জন্মে। বহু অদ্ভুত চিন্তা এবং ভয় আমাকে পেয়ে বসতো এবং আমি আমার নিজের আয়ত্তের বাইরে এসে পড়তাম। এই অভাবনীয় রোগের কথা আমি কাকেও বলি না। বললে হয়তো কেহ তা বিশ্বাস করতো না। তা ছাড়া বলতেও আমার লজ্জা হতো। একদিন আমার ইচ্ছা হলো, দ্বিতল হ'তে নীচে লাফিয়ে পড়ি। আমি নিজেকে সংযত করতে না পেরে শেষে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে চাবিটা বাইরে ফেলে দিই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এর সঙ্গে সঙ্গে আমার এই দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছারও উপশম ঘটে।"

গভীর রাত্রে কেহ যদি কোনও বৃহৎ জলাশয়ের ধারে বসে জলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তা'হলে সে একটী বিশেষ অনুভূতি লাভ করবে। তার মনে হবে যে ঐ জল যেন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। এই ক্ষণস্থায়ী চিন্তা যদি উগ্র ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহ'লে ঐ ব্যক্তির পক্ষে অকারণে জলে ডুবাও অসম্ভব নয়।

মানসিক কারণের ন্যায় স্নায়বিক কারণেও মানুষ উন্মাদ হতে পারে। এই সময় তার মনের সকল প্রতিরোধ শক্তি লোপ পায়। এখানে অন্তর্দ্বন্দের প্রশ্ন উঠে না। এখানে প্রশ্ন উঠে প্রকৃত উন্মাদনার। অন্তর্দ্বন্দ্বের বহু ইচ্ছাকে আংশিক বা পূর্ণভাবে প্রদমিত করা যায়, কিন্তু স্নায়বিক উন্মাদনা

বুদ্ধি বিবেচনা বা প্রতিরোধ শক্তির পূর্ণ বিনাশ ঘটায়। এইরূপ অবস্থায় কোনও ইচ্ছা উপগত হওয়া মাত্র সে তাকে কার্য্যকরী করে। এই ভাবে বহু উন্মাদ উন্মাদনার কারণে অতর্কিতভাবে আত্মহত্যা করেছে।

যে সকল উন্মাদ আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাদের সাবধানে নজরবন্দী রাখা উচিত। এই সম্পর্কে এরা অত্যন্ত ধূর্ত্ততা দেখিয়েছে। ধাপ্পা দ্বারা ভুলিয়ে কিংবা চালাকির সহিত বহু ব্যক্তির নজর এড়িয়ে এরা আত্মহত্যা করতে সক্ষম। সামান্য একটু সুযোগ পাওয়া মাত্র এরা উহার সদ্ব্যবহার দ্রুত গতিতে করে থাকে। অতি সামান্য দ্রব্যের সাহায্যেও এরা আত্মহত্যা করতে সক্ষম হয়েছে।

এই উন্মাদনা প্রায়ই বংশগত হয়ে থাকে। এইজন্য একই পরিবারের দুই তিন পুরুষে বহু ব্যক্তিকে অকারণে আত্মহত্যা করতে দেখা গিয়েছে।

ভারতীয়গণ আবহমানকাল এই আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলে স্বীকার করে এসেছেন। এমন কি এই অপঘাত মৃত্যুর কারণে উহাদের শ্রাদ্ধ শান্তিও দ্বাদশ দিন বা এক মাসের পর না করে তিন দিন পর উহা সমাধা করা হয়।

অলৌকিক ব্যাপার সম্পর্কে জ্ঞানার্জ্জন বা পরীক্ষার্থে বহু লোক মানসিক রোগগ্রস্ত হয়েছে। এদেশে শব-সাধনা * বা পিশাচ-সিদ্ধ হবার কাহিনী শুনা গিয়েছে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে মানুষ না'কি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হয়। এই অলৌকিক সংস্কারে বিশ্বাসী মানুষ এইরূপ পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ ক'রে বহুক্ষেত্রে উন্মাদ হয়েছে।

ভূত নামাতে গিয়ে ভয় পেয়ে বহু অবিশ্বাসী সাহসী মানুষও রোগগ্রস্ত

(*) মৃত শব ক্রোড়ে নিয়ে সাধনা ক'রে পিশাচ-সিদ্ধ হবার পদ্ধতি না'কি এদেশে একদিন প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমি মনে করি যে উহা সম্পূর্ণরূপে গল্প বা কাহিনী মাত্র।

হয়েছে। এই ব্যাপারে মূল মস্তিষ্ক স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় এরা অনেক কিছু ক'রেও মনে করে তা তারা করেনি; অনেক কিছু জেনেও তারা ভেবেছে তারা তা জানেনি।

[তিন পায়া টেবিলের সাহায্যে ভূত নামানোর কথা শুনা গিয়েছে, কিন্তু উহা ফাঁকি বা ধাপ্পা মাত্র। এই ব্যাপারে তিন ব্যক্তি টেবিলের তিন দিকে বসে টেবিল চেপে রাখে। দুই বা তিন ব্যক্তির হাতের চাপ সমানভাবে বা একই সময় পড়ে না। মানুষের পেশীর সঙ্কোচন (Mascular Contraction) ও হাতের কমবেশী চাপে টেবিল উঠা নামা করে। এমন কি ঐ টেবিল কিছুটা দূর সরেও যেতে পারে। এই ব্যক্তি ত্রয়ের একজন এই যন্ত্রের অযৌক্তিকতা ও মিথ্যাচরণ সম্বন্ধে সচেতন এবং সে ইচ্ছে ক'রেই এ বিষয়ে সাহায্য ক'রে থাকে। বহুক্ষণ হাত তুলে রাখার কারণে পেশীর সঙ্কোচন ঘটে ইহার ফলে হাত ভেরে যায় এবং উহা ভয়ের কারণে উঠা নামা করে।

এই যন্ত্রের একজন ধারক এই সম্বন্ধে জোর ক'রে অপরকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে নিজেরা এতে বিশ্বাস না করেও। এই বিশ্বাস করানোর মধ্যে এরা পুলক অনুভব করে। অপরকে ভয় দেখানোর মধ্যেই এদের যা কিছু বাহাদুরী বা আনন্দ। বহুক্ষেত্রে নিজেদের অশান্তি অপরের মনেও এরা এনে দিতে চেয়েছে। য়ুরোপীয় বালকেরা এই সকল যন্ত্র নিয়ে খেলা করে মাত্র। উহা তাদের নিকট একটা খেলার বস্তু। অতীব দুঃখের বিষয়, বিদেশের বালকেরাও যা খেলনা মনে করেছে, এদেশে বহু বৃদ্ধও তাতে গুরুত্ব আরোপ করে।]

ভূত বলে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। বাইরের ভূতে কখন কাহাকেও ভয় দেখায়নি। মানুষের মনেরই এক বিচ্ছিন্ন অংশ বাইরে বেরিয়ে তাকে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু

মানুষের মন এই ভাবে বিচ্ছিন্ন হয় কেন? এই সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করবো। মনের অজ্ঞতা এবং দুর্ব্বলতার জন্য এই বিচ্ছিন্নতা আসে। এবং ইহার কারণ আশৈশব পরিবেশ ও অবহেলা। বহু ব্যক্তি শিশুদের শান্ত করবার জন্যে ভয় দেখায়। কিন্তু তাতে তারা তাদের সর্ব্বনাশ করে মাত্র। কোনও বালক আশৈশব অবহেলা ও তাচ্ছিল্য পেয়ে থাকে। এতদ্বারা তারা তাদের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করতে পারেনি। কোনও কোনও বালককে পাগলা পাগলা বলে অবহিত করা হয়েছে। এইরূপ সম্বোধন ঐ বালক আদপেই পছন্দ করেনি। তার চেতন মন হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠেছে 'না কক্ষণো না, আমি পাগলা বা বোকা নই, কিন্তু তার অবচেতন মন ক্ষুব্ধভাবে বলেছে, কিন্তু তা'হলে অতোগুলো লোক কেবলমাত্র আমাকেই বা এইরূপ বলে কেন? এই ভাবে হাঁ ও না'র দ্বন্দ্ব সর্ব্বপ্রথম তার মনে উপগত হয় এবং তার মূল মন ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতার জন্য তৈরী হয়।

এইরূপে দুর্ব্বল-চেতা হয়ে বহু মানুষ সহজেই মনোরোগগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় সমগ্র জাতিও আত্মহত্যা করতে সক্ষম। ভাবপ্রবণ জাতি যদি অলস ও দাম্ভিক হয়, তা'হলে এইরূপ আত্মহত্যা তারা সহজেই করতে পারে। অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা গণ-হিষ্ট্রিয়া বা উন্মাদনার নামান্তর মাত্র। অলসতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, বাস্তব জ্ঞান এবং সহনশীলতার অভাব, ভাবপ্রবণতা, শ্রম-বিমুখতা, অভিমান, ভীরুতা ও আত্মধ্বংশী রাজনীতির কারণে পূর্ব্বকালীন বহু জাতি বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে।

শ্রমবিমুখতা ও পরনির্ভরশীলতা এইরূপ আত্মনাশের এক অন্যতম কারণ। এই সম্বন্ধে পৃথিবীর এক পুরানো জাতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জাতি একদিন বুদ্ধি ও বাহুবলে শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন

করেছিল। কিন্তু তাদের বংশধরগণ কালক্রমে শ্রমবিমুখ হয়ে পড়ে। এদের প্রত্যেকটী পরিবার অপর এক দাস-জাতির লোকেদের আপন আপন বাটীতে নিযুক্ত করে তাদের দ্বারা যাবতীয় কার্য্য করিয়ে নিতো। এক এক পরিবার এইরূপ বহু দাস জাতীয় বিজিত লোকেদের দাস্য কার্য্যের জন্য স্ববাটীতে মোতায়েন রেখেছিল। কোনও এক সময় এই দাস জাতীয় লোকেরা পরস্পর পরস্পরের সহিত সলা ক'রে একরাত্রে প্রভু জাতীয় পুরুষদের অতর্কিতে আক্রমণ করে, হত্যা করে স্ব স্ব প্রভুপত্নী ও প্রভু-কান্যাদের বল পূর্ব্বক বিবাহ ক'রে এক মিশ্র জাতির সৃষ্টি করেছিল। এদেশে আজও বহু দেশীয় রাজ্য আছে যেখানে রাজা ও সামন্তগণ এই কারণে অন্য জাতীয় বহু দাসী রাখলেও কখনও প্রাসাদে ঐ জাতীয় পুরুষ দাস রাখেন নি। এই সকল মানুষরা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্বেও সকল প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য আজও পর্য্যন্ত স্বহস্তে করে থাকেন।

চাষের কাজের এবং সৈনিকের জন্য যে জাতি অন্য জাতির বা শ্রেণীর মানুষ নিযুক্ত করেছে, তারা আখেরে আত্মহত্যা করবে। ব্যবসায়ী শ্রেণীকে এরা হটিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু ভূমির এবং শৌর্য্যের অধিকারীদের বিতাড়িত করা অসম্ভব। ভূমির অধিকারী বা শস্য উৎপাদনকারী যারা, দেশ তাদেরই। বরং ইচ্ছা করলে এরাই ভিন্ন জাতীয় শাসকদের বিতাড়িত করতে কিংবা তাদের নিজ দেশেও পরদেশী-রূপে বাস করতে বাধ্য করতে পারে। জাতীয় আত্মহত্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দেখা গিয়েছে যে এই আত্মহন্তারক জাতি তাদের দেশের ভূমি ও শ্রমশিল্প ধীরে ধীরে অন্য জাতি বা শ্রেণীর হাতে স্বেচ্ছায় বা শ্রমবিমুখতার কারণে তুলে দিয়ে নিজেদের পরগাছা-জাতিতে পরিণত করেছে। এই সকল কারণে পৃথিবীতে বহু আত্মাভিমানী বিলাসী গর্ব্বিত সভ্যজাতি

যুগে যুগেঃবিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত সভ্যতা ও ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ, যে জাতিকে পার্থীব সুখ সম্ভোগ হ'তে দূরে নিয়ে গিয়েছে বা আন্তর্জ্জাতিক মনোভাবাপন্ন করেছে, আখেরে তারাও জাতিত্ব বজায় রেখে বেঁচে থাকতে পারেনি।

জাতীয় জীবনে এমন এক একটী সময় আসে যখন নেতারা জাতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে অক্ষম হয়। বস্তুতঃপক্ষে এই সময় জাতি কাহাকেও নেতা রূপে স্বীকার করে না। একজনকে একদিন তারা নেতৃত্বে বরণ ক'রে পর দিনই তাকে দূরীভূত ক'রে দেয়। নেতাকে জনতার মুখাপেক্ষী হয়ে জনতার উন্মাদনায় যোগ দেওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না। সমগ্র জাতি এই সময় গণ-হিষ্ট্রীয়া বা গণ-উন্মাদনায় ভুগে আত্মহত্যা করে। এই সময় এরা সমধিক শক্তি সঞ্চয় না ক'রে অকারণে প্রবল শত্রুর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, স্বজাতির নিশ্চিত ধ্বংস উপলব্ধি করেও। একই সাথে এরা বহু মানব গোষ্ঠীকে শত্রুতে পরিণত করেছে। সকলেই তাদের নিকট মন্দরূপে প্রতীত হয়েছে। এর উপর তারা এনেছে দ্বেষ, হিংসা এবং অকারণ অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই সময় এদের একজন অপর জনকে বিশ্বাস করে না। যে ডুবছে তাকে আরও ডুবিয়ে দেওয়া হয়। দেশ-প্রেম অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থই বড় হয়। এরা তখন ভুলেও এমন কাজ করে না, যাতে দেশ বা জাতি বড় হ'তে পারে। আত্মধ্বংশী রাজনীতি থাকে তাদের একমাত্র চিন্তা। এই সময় এরা সতীর সতীত্ব হেলায় লুণ্ঠন করে। উহাকে তখন এই সব মানুষ মনে করে কুসংস্কার। এর ফলে নির্বিচার যৌন-মিলনে বন্ধ্যাত্ব আনে বা দুর্ব্বল শিশুর জন্ম দেয়। এইরূপে জাত—শিশুরা প্রায়শঃক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণও হয়েছে।

জাতি এইরূপ অবস্থায় উপনীত হ'লে প্রায়ই প্রবল শত্রুর আক্রমণ সহ্য করতে পারে নি। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ তারা মিশ্র বা

দাস জাতিতে পরিণত হয়েছে, না হয় চিরতরে তারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

[এইবার আমার স্বশ্রেণী বাঙ্গালীদের কথা বলবো। সাধারণতঃ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষরা শ্রম বা চাষ করে না। এরা পরগাছা-জীবন যাপনে অভ্যস্ত। চাকুরীই এদের একমাত্র সম্বল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীর পক্ষে ইহা অতীব সত্য। কিন্তু চিরকাল এইরূপ ছিল না। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রদের সহিত সমভাবে ক্ষেত্র-কর্ষণ বা শ্রমিকের কাজ করিয়াছে। পশ্চিম বাংলার ব্রাহ্মণ কায়স্থদের সেইদিনও ক্ষেতে মাঠে চাষ করতে দেখা যেতো। নিজেরা লাঙ্গল না ধরুন এঁরা কোদলী ধরেছেন। শব্জীক্ষেত্রের জন্য মজুর নিয়োগ এঁরা কমই করেছেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে এঁরা কেরাণীকূলে পরিণত হয়ে পড়েন। জাতিভেদ প্রথার জন্য এঁরা চাষী সমাজের সহিত বৈবাহিক বন্ধন স্বীকার করেন নি। এমন কি সামাজিক ব্যবহারেও এই উভয় শ্রেণী পৃথক থেকেছেন। এই অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক ব্যবধানের কারণে এঁরা জাতির মধ্যে উপজাতির স্থষ্টি করে মূল জাতিকে দুর্ব্বল করে দিয়েছেন। কিন্তু এঁদের একটী দল যদি ঐ চাষী সমাজের পাশাপাশি ক্ষেত্র-কর্ষণ করতো তা'হলে সমস্যা অন্ততঃ এতোটা জটিল হতো না। বহির্বাংলায় আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও ছত্রী চাষীর সন্ধান পাই। এরা শ্রেণীগত ভাবে পরগাছা-জীবন যাপন করে না। মধ্যবিত্ত সমাজে এক ভাইকে আমরা জেলা হাকিম বা প্রধান শিক্ষকরূপে দেখি, কিন্তু তাঁর সহোদর ভাইটী তখনও চাষ করছে বা ভঁইসা চরাচ্ছে। কিন্তু এতে এরা লজ্জা অনুভব করে না বরং গর্ব্ববোধ করে। বহুক্ষেত্রে শ্রমিক ভাইটীর সাংসারিক অবস্থা শিক্ষিত ভাইদের অপেক্ষা স্বচ্ছল দেখা গিয়েছে। প্রায়শঃক্ষেত্রে একই

পরিবার ভুক্ত থেকে এরা এই উভয়বিধ কার্য্য সুষ্ঠুভাবে করে গিয়েছে। এইজন্য এদের সমস্যা কোনও কালেই জটীল হ'তে জটীলতর হবে না। এই বিশেষ সত্যটী এই উভয় প্রকার প্রদেশের সাহিত্য পর্য্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট হবে। বহির্বাংলার সাহিত্যে ধনী নায়ক পথ হারা হয়ে কোনও দিনমজুরের বাড়ী অতিথি হয়েছে। চাষীর মেয়ে তাকে সানকী ভরে অন্ন দিচ্ছে এবং পরে উভয়ের বিবাহও হচ্ছে। কারণ অর্থ-নৈতিক ব্যবধান থাকলেও উভয় পরিবারের মধ্যে কোনও সামাজিক ব্যবধান নেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এইরূপ ক্ষেত্রে ধনী বা শিক্ষিত নায়ককে ঐ চাষী বলবে, "তা দা'ঠাউর তুমি বরং ঐ বামুন বাড়ী যাও, এখানে কষ্ট হবে।" এর পর বামুন বাড়ী পোঁছিলে তবে কোনও কন্যার সহিত মিলিত হবার সম্ভাবনা হবে, তা না হলে গল্পটী শেষ করা সম্ভব হয় না।

আজ এই প্রদেশের চাষী সমাজও ব্রাহ্মণ-কায়স্থের অনুকরণে ইংরাজী শিখে পরগাছা শ্রেণীতে পরিণত হ'তে চলেছে এবং তাদের স্থান পূরণ করছে দ্রুত গতিতে ভিন্ প্রদেশের চাষী মজুররা। এইরূপ কিছু দিন চললে দেখা যাবে বাঙ্গালী মাত্রই পরগাছা-জীব এবং অবাঙ্গালী মাত্রই চাষী, মজুর ও ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত হয়ে উঠেছে। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে অশিক্ষিত বাঙ্গালীরা মিস্ত্রি বা চাষীর কাজ করতে লজ্জানুভব করে না। কিন্তু অচিরে আইন প্রণয়ন করে শিক্ষিতেদরও এই সকল কার্য্যে নামাতে হবে। অক্সফোর্ডের ছাত্রদের যদি 'কনস্‌ক্রিপট' করে চাষের কাজ করানো যায়, বাঙ্গালী ছেলেদের দ্বারাই বা তা করানো যাবে না কেন? তবে এ বিষয়ে বাঙ্গালীদের বাধ্য করতে হলে প্রথমে বাঙ্গালীর মনস্তাত্ত্বিক গঠন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। শিক্ষিত বাঙ্গালীকে যদি বলা যায়, 'তুমি ঐ নর্দ্দামা এখনই পরিষ্কার

করো ; তা'হলে হয়তো সে তা করবে না। কিন্তু তাকে যদি চামড়ার হাঁটু ঢাকা বুট, খাঁকি প্যাণ্ট ও সার্ট এবং গ্যাসমাস্ক পরিয়ে দিয়ে তা করতে বলা হয় তা'হলে তা সে খুসী মনেই করবে। যে কোনও শিক্ষিত যুবক রৌদ্র নিবারণী সোলার হ্যাট ও নীল গগ্‌লস চশমা পরে গলায় চা'য়ের ফ্লাস্ক ঝুলিয়ে খাঁকি উর্দ্দী পরে বা প্রয়োজন মত ওয়াটার প্রুফ পরে রৌদ্র ও বৃষ্টির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাকটার চালাতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই ব্যক্তি হাঁটুর উপর কাপড় পরে গামছা বা টোকা মাথায় লাঙ্গল ঠেলতে রাজী নাও হ'তে পারে। অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে দিয়ে কাজ করাতে হ'লে তাকে উর্দ্দী ও সম্মান (uniform and status) দিতে হবে। আরও তাকে দিতে হবে সুসঙ্গ বা এসোসিয়েসন। সমকৃষ্টি সম্পন্ন যুবকদের সহিত তারা শ্রমের কাজ করতে রাজী থাকলেও 'আনকালচার্ড' ব্যক্তিদের সহিত তারা কিছুতেই কাজ করবে না। বাঙ্গালী মাত্রের মধ্যে শিক্ষালাভ ও জ্ঞানর্জ্জনের এক দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। এইজন্যই চাষী সমাজও লেখাপড়া শিখে পরগাছা-জীবনে অভ্যস্ত হচ্ছে। এই অবস্থা হ'তে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের স্বজন করতে হবে সভ্য ও শিক্ষিত চাষী সমাজ, তা না হলে বাঙ্গালীর এবং এই ধরণের অন্যান্য ভারতবাসীর রক্ষা নেই।

অর্থ-নৈতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করবার জন্যে আমাদের পারিবারিক কাঠামোরও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টী বুঝা যাবে।

"প্রায়ই দেখা যায় বাঙ্গালীরা স্বকীয় বেতনে বা অবস্থায় খুসী নয় এবং সুবিধে পেলে তারা বেতন বাড়ানোর জন্যে আন্দোলন করে। এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য একজন বাঙ্গালী শ্রমিককে প্রশ্ন

করলাম, 'আচ্ছা, তুমি পাও কতো?'—'আজ্ঞে, আশী', সে উত্তর দিল, 'কিন্তু আমাকে খেতে দিতে হয় সাত আট জনকে, তারা হচ্ছে আমার স্ত্রী, দুই কুমারী এবং এক বিধবা ভগ্নি, মা, বাপ, পিসী' দুই ভাই।' বুঝলাম মাথা পিছু এদের উপার্জ্জন গড়ে ১০৲ টাকা মাত্র, কারণ ঐ শ্রমিক ব্যতীত এই পরিবারের সকলেই বসে বসে শুধু খায়। এও বুঝলাম যে বাঙ্গালীদের পক্ষে ফিসিওলজিক্যালি এবং সাইকোলজিক্যালি সন্তুষ্ট বা 'অনেষ্ট' থাকা সম্ভব নয়। এই বাঙ্গালী শ্রমিককে যদি ২০০৲ টাকাও বেতন দেওয়া যায় তা'হলেও তার পরিবারে মাথা পিছু আয় হবে মাত্র ২০৲ টাকা, কিন্তু তাতেও অতোগুলো লোকের ভরণপোষণ সম্ভব নয়। এর পর আমি একজন দেশাবালী শ্রমিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে, তার পরিবারে সাত ব্যক্তি আছে, যথা, দুই ভাই, তিন বহিন বাপ, মা, চাচী ও একজন ভাতিজা। এরা সকলেই ঐ একই কারখানা-তেই কাজ করে এবং এদের প্রত্যেকেই ৭০৲ হ'তে ৮০৲ পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পায়। এদের পারিবারিক আয় সর্ব্বসমেত ৮০০৲ টাকার উপর, কারণ সে নিজে এবং তার বাপ, মা, ভাই, বোন সব্বাই কাজ করে। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যদি ঐ পরিবারের প্রত্যেককে ৮০৲ টাকার পরিবর্ত্তে যদি ৪০৲ টাকাও বেতন দেওয়া হতো, তা'হলে তাদের সমবেত আয় হতো ৪০০৲ টাকার উপর এবং এতেও তাদের ভালোভাবেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হতো। এ-ছাড়া তাদের জীবনধারণের মানও বাঙ্গালীদের অপেক্ষা অনেক কম। এইজন্য এদের অল্পতেই সন্তুষ্ট করা সম্ভব।"

অনেকে এইবার বলবেন, তা বলে কি ভদ্রঘরের মেয়েরা ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে যাবে?' এর একমাত্র উত্তর, 'তা না হলে জীবন-সংগ্রামে তারা টীকেও থাকবে না।' কিন্তু এইরূপ কথা আমি বলবো না। কারণ আমি স্বীকার করি মনের

আভিজাত্য ছাড়া আজ বাঙ্গালীর আর কিছুই নেই। এই মেণ্টাল এ্যারিস্ট্রোকেসী তারা হারাতে প্রস্তুত নয়। এস্থলে আমাদেব একমাত্র উপায় কুটীর শিল্পে নেমে আসা। এই ক্ষেত্রে কুটীরশিল্প বলতে আমি "পাওয়ার প্রপেল্ড" কুটীর শিল্পের কথাই বলছি। আমাদের বাড়ীতে যদি তিনখানি ঘর থাকে তা'হলে দুইখানি ঘর ব্যবহার করে তৃতীয় খানিতে আমাদের বসাতে হবে গেঞ্জির কল বা অনুরূপ কোনও শিল্পায়তন। এই সকল কল চালাবার ভার নিতে হবে আমাদের মেয়েদের। সাংসারিক কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে ফ্যাক্টরীর বহু আনুসঙ্গিক কাজ এই ছোট ছোট শিল্পায়তনে হ'তে পারে। বড় বড় ফ্যাক্টরীর সহিত যুক্ত থেকে বহু প্রাথমিক বা আনুসঙ্গিক কাজ এরা করে দিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গেঞ্জি সেলাই বা পটারীর অঙ্কন কার্য্যের কথা বলা যেতে পারে। বড় বড় কারখানা থেকে কাপড়ের সিট এনে উহা তারা সেলাই করে ঐ কারখানাতেই পাঠিয়ে দিতে পারে। ফ্যাক্টরী সমূহের যে সকল কাজ মেয়েদের দ্বারা বাড়ীতে বসে করা সম্ভব, সেগুলি মালিকরা বাড়ী বাড়ী ট্রেণার পাঠিয়ে যদি মেয়েদের এই বিষয় তাঁরা শিক্ষিত করে কাঁচামাল সরবরাহ করেন এবং পরে তাঁরা লোক মারফৎ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তা সংগ্রহ করে আনেন, তা'হলে তারা শ্রমিক বিভ্রাট হ'তে রক্ষা তো পাবেনই তা ছাড়া প্রোডাকসনও সুলভ করে তুলতে তাঁরা সক্ষম হবেন। যে গেঞ্জির ডজন কারখানার শ্রমিকরা ১২৲ টাকায় তৈরী করবে, বাড়ীর মেয়েরা তাদের অবসর সময়ে তা ছয় টাকায় তৈরী করে দিতে পারবে। জাপানে, লুধিয়ানায়, এইরূপে এখনও কাজ হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের গুটীপোকার চাষ, বা হাওড়ার চিকণ শিল্প এখনও এই পদ্ধতিতে বেঁচে আছে। এইরূপ পদ্ধতিতে পল্লীগ্রামের বাঙ্গালী মেয়েরা ইহার সহিত বাড়ীতে বাড়ীতে পোলট্রি প্রভৃতি স্থাপন করতে পারেন।

একজন শ্রমিক কারখানায় গিয়ে যে কাজের জন্য ৮০৲ টাকা পেয়ে থাকে, সেই কাজ সে যদি বাড়ীতে বসে মা বোন ভাইদের সাহায্যে করে তা'হলে ১০০৲ টাকা উপায় করবে। অথচ প্রত্যুষে উঠে নাকে মুখে ভাত গুঁজে তাকে দৌড় দিতে হবে না। মধ্যবিত্ত পরিবার মাত্রেরই এ কথা ভাববার প্রয়োজন হয়েছে।

সর্ব্বদা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা এক অপরাধ। এই প্রদেশে বাঙ্গালী ছাড়া আর কেউ 'ষ্টেট্ হেল্প' চায় না, পায়ও না। এই শহরে সহস্র সহস্র চীনা আছে তারা সকলেই ধনী লোক, কিন্তু ষ্টেট্ হেল্পের তাদের প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন প্রদেশের লক্ষ লক্ষ লোক এই প্রদেশে আছে এবং আসছে, কিন্তু কেহ ষ্টেট্ হেল্পের প্রত্যাশী নয়। তাদের সাংসারিক গঠন অর্থ-নৈতিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, এইজন্য এরা কষ্ট পায় না। এরা মেয়ে পুরুষে কাজ করে। বাংলার চাষী সমাজের মতই এদের প্রত্যেক বাড়ীতেই দেখা যাবে গরু, মহিষ, এক পাল মুরগী ও হাঁস। বাড়ীর বালক বালিকাদের পরিত্যক্ত ভুক্তাবশেষ যা আমরা পয়সা খরচ ক'রে বাইরে ফেলে দিই তাই দিয়েই তারা দশটী মুরগী পালন করেছে এবং ডিম খেয়েছে ও বিক্রয় করেছে। দুধ সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা বলা যেতে পারে। এরা শহরের বাইরে জমি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত, কিন্তু আমরা শহর ছেড়ে অন্যত্র যেতে রাজী নই। এ কথা সত্য যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর পুণ্যে আমরা বেঁচে আছি। ঐ যুগে আমরা দেখেছি বাঙ্গালী ষ্টেট্ হেল্প তো চান-ই নি বরং নিজেরা বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তা ষ্টেটের হাতে তুলে দিয়েছে। কলিকাতার মিউজিয়াম, ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী, মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, টাউন হল, কলিকাতা ইয়ূনিভারসিটি তার অমর দৃষ্টান্ত। বাঙ্গালীরা চাঁদা তুলে এইগুলি একদিন স্থাপন করেছিল। রাষ্ট্রের সহিত পরামর্শ না করেও যে জাতি

'লঙ্‌টারম্ প্রোগ্রাম' রাষ্ট্রের জন্য রেখে, 'সর্ট টারম্ প্রোগ্রাম' সমূহ স্বহস্তে গ্রহণ করে তারাই পৃথিবীতে বড় হয়েছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে ইহা বুঝা যাবে।

এইবার আমি আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কীয় আলোচনায় ফিরে আসবো। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মনোরোগীরা মনে করেছে তাঁর জন্যে পৃথিবীতে, সংসারে বা পরিবারে বহু অমঙ্গল ঘটছে বা ঘটবে। কল্পিত অমঙ্গলের আশঙ্কা তাদের এমনি অভিভূত করে যে প্রিয়জনের মঙ্গলার্থে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমার ভাইএর ঠিকুজি ও কুষ্ঠিতে বিশেষ আস্থা ছিল। কোনও এক গণনার দ্বারা তিনি জানতে পারেন তার জীবনদশাতে তাঁর কন্যা বিধবা হবে। এদিকে আমরা ঐ কন্যার বিবাহও স্থির করে ফেলেছি। বিবাহের রাত্রে আমার ভ্রাতা হঠাৎ গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন। এর দুই দিন পর উড়িষ্যা পুলিশ সংবাদ দিলে যে তাঁকে মৃত অবস্থায় ট্রেণের কামরায় পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ আমাদের একটী পত্রও পাঠিয়েছিল। ঐ পত্রে ভ্রাতা জানিয়েছেন যে কন্যা জামাতার মঙ্গলের জন্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন।"

কয়েকদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ব কলিকাতায় একজন ষোড়শী কন্যা আত্মহত্যা করার পূর্ব্বে নিম্নোক্তরূপ একটী পত্র লিখেছিলেন—

"আমি একজন অপয়া কন্যা। আমার জন্মের পরই আমার বড় ভাই মারা গেল। অতি কষ্টে রেডিওতে প্রোগ্রাম পেলাম, কিন্তু যেদিন আমার গান সেইদিন মহাত্মা গান্ধী নিহত হলেন। অবশ্য প্রোগ্রাম একদিন মহাত্মার সম্মানার্থে বন্ধ রাখা হয়েছিল। এর পর হতে যে কাজে মন দিয়েছি অমনি অমঙ্গল এসেছে। পৃথিবীর ভালোর জন্যে

আমি আত্মহত্যা করলাম। আমার অবর্ত্তমানে খুকু মনুর যেন অযত্ন হয় না, ইত্যাদি।"

এই সম্পর্কে অপর একটী অনুরূপ পত্রের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো। "আমার স্ত্রীর অনুরোধে অতি কষ্টে চার জোড়া সোনার চুড়ি গড়িয়ে দিই। কিন্তু এর পর তিনি একটী নেকলেশ চেয়ে বসলেন। ঐ রাত্রিতে নেকলেশটী আনবার কথা ছিল, কিন্তু টাকা যোগাড় করতে পারি নি। প্রতিবাদে স্ত্রী তার হাতের চুড়ি কয়টী ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আমি স্ত্রীকে জব্দ করবার জন্মে এই আফিমটুকু খেয়ে ফেললাম।"

এতদ্ব্যতীত স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্মেও বহু ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। অদম্য ভালবাসার প্রতিদান না পেয়েও বহু ব্যক্তি আত্মনাশ করে থাকে।

ব্যক্তিগত এবং জাতিগত আত্মহত্যার কথা বলা হলো। এইবার আত্মহত্যার ব্যাপারে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বা ধারা আছে কি'না সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবো। কেহ কেহ বলেন গ্রহবৈগুণ্যের কারণে আত্মহত্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। গ্রহ বিশেষের আবির্ভাবে মণি ও রত্ন বিশেষের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু এর মধ্যে কতোটা সত্য আছে তা বলা শক্ত। আত্মহত্যার পরিসংখ্যা অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে একটী বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী আত্মহত্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয় তো ঘটে থাকে।

এই আত্মহত্যা সম্বন্ধে অপর একটী বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"এই মেয়েটী থাকে ঐ পাশের ফ্ল্যাটে, তার পিতা মাতার সঙ্গে। কিন্তু গোপনে রাত্রে প্রতিদিনই সে আমার শয্যায় এসে মিলিত হয়েছে। প্রতিদিন সে আমাকে অনুযোগ করতো, 'কতোদিন এইভাবে থাকবো, তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি'না?' প্রতিবারে

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি, 'হ্যাঁ করবো গো, করবো! অতো ব্যস্ত কেন!' আসলে, কিন্তু, তাকে আমি বিয়ে করতে রাজী ছিলাম না। বোধ হয় মেয়েটী আমার মনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। প্রতিদিনের মত এই দিনও সে আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করে শুয়ে পড়লো, কিন্তু প্রত্যুষে উঠে অন্য দিনের মত চলে গেল না। আমি কল্পনাও করি নি যে সে আমার আলিঙ্গনে বদ্ধ অবস্থাতেই সাইনায়েড্ খেয়েছে! এই হিম শীতল মৃত দেহ সরাবারোও কোনও উপায় ছিল না। হয়তো লোকে মনে করবে আমিই ওকে খুন করেছি। শেষে নাচার হয়ে আফিম কি'নে আমিও তা খাই, কিন্তু মরি না। এখন আপনাদের বিচারে যা হয় তা করুন।"

মানসপটের চিন্তা সমূহের তিনটী বিশেষ দিক আছে, যথা, (১) গুণ বা কোয়ালিটী (২) পরিমাপ, ও (৩) চাপ। গুণ অর্থে আমরা নিরানন্দ বা আনন্দদায়ক চিন্তা প্রভৃতি বুঝি পরিমাপ অর্থে কতোটা স্থান ঐ চিন্তা জুড়ে আছে। এবং চাপ অর্থে বুঝি উহার উগ্রতা। এই চিন্তার সহিত আলোকের তুলনা করা চলে। আলোক ব্যাপ্ত হয়ে বা ছড়িয়ে থাকলে উহার উগ্রতা অনুভূত হয় না। কিন্তু আতস কাঁচের সাহায্যে একীভূত হলে উহা দণ্ডায়মান হয়। সেইরূপ একীভূত হয়ে চিন্তার চাপ অধিক ঘটলে ঐ চাপ আমরা অনুভব করে থাকি। ঐ চাপ এবং তৎজনিত উগ্রতার কারণে সামান্য চিন্তা সমূহও আমাদের পাগল করে তুলতে সক্ষম হয়। এই উন্মাদনা ও মনোরোগের কারণে মানুষ বহুক্ষেত্রে আত্মহত্যা করেছে।

সামাজিক দেহ-বিজ্ঞানের "আত্মহত্যা" একটী উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। আত্মহত্যা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে হয় না। তথ্যতালিকা (Statistical research) হ'তে প্রমাণিত হবে যে সামাজিক অবস্থা ও

ব্যবস্থাও এই জন্য দায়ী। কোনও এক বিশেষরূপ সামাজিক ব্যবস্থায় বা অবস্থায় একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে আত্মহত্যা করতেই হবে। এখন এই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে? এইটেই হচ্ছে প্রশ্ন, আমার মতে ইহা সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত একটী বিশেষ নিয়ম এই সাধারণ নিয়মের শক্তি এমনই যে মানুষ ইহলোক বা পরলোকের—কোনও ভয়েই আত্মহত্যা হতে বিরত হয় না। হেনরী মরসেলী সাহেবের "সুইসাইড" নামক পুস্তকটী পড়লে বিষয়টী বুঝা যাবে। যে সকল দেশে এই প্রকার নৈতিক পরি-সংখ্যা গৃহীত হয়েছে সেই সকল দেশে তথ্যতালিকা হতে পরিদৃষ্ট হয়েছে যে ঐ সকল দেশে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ প্রতি বৎসর আত্মনাশ করে থাকে। আত্মহত্যা, হত্যা বা খুন, বিবাহ প্রভৃতি ইচ্ছাকৃত কার্য্যের ন্যায়, জন্ম, অবৈধ জন্ম, মৃত্যু, দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার সম্বন্ধেও এই কথা সত্য।

হেনরী টমাস্ বাকেল সাহেবের 'হিস্‌টরী অব্ সিভিলেজেসন্ ইন্ ইংল্যাণ্ড' পুস্তকটীও এই সম্বন্ধে আমি পাঠকদের পড়তে অনুরোধ করবো। এই পুস্তক পাঠে জানা যাবে যে প্রায় ২৪০ জন ব্যক্তি লণ্ডন সহরে প্রতিবৎসরে আত্মহত্যা করে থাকে। কিন্তু সহরে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ঐ সকল বৎসরে ২৬৬ হতে ২১৩ ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। ১৮৪৬ সালে রেইল-ওয়ে ভীতির কারণে লণ্ডন সহরে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই কারণে ঐ বৎসর আত্মহন্তারকের সংখ্যা হয় ২৬৬। ১৮৪৭ সালে অবস্থার উন্নতি ঘটে। এই বৎসর আত্মহন্তারকের সংখ্যা ছিল ২৫৬। ১৮৪৮, ১৮৪৯ এবং ১৮৫০ সালে উহাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪৭, ২১৩।এবং ২২৯।

শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ বসু, B. L., ব্যাঙ্কশাল কোর্ট, কলিকাতা, এই

সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করেছিলেন। এদেশে একমাত্র তিনিই এই ব্যাপারে কার্য্য করেছেন। কলিকাতা পুলিশের বাৎসরিক শাসন তান্ত্রিক বিবরণ হ'তে তিনি এই সব তথ্য তালিকা সংগ্রহ করেছেন। ১৮৭৮ সাল হ'তে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত বিবরণ হ'তে তিনি আত্ম-হত্যা জনিত মৃত্যুর সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু '৮৮০, ১৮৮১ এবং ১৮৯৩ সালে ঐরূপ কোনও সরকারী বিবরণ প্রকাশিত না হওয়ায় ঐ বৎসর সমূহের কোনও পরিসংখ্যা তিনি দিতে পারেন নি। নৃপেন্দ্র-বাবুর সংগৃহীত তালিকাটী নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকাটী হ'তে বহু অজানা তথ্য প্রকাশ পাবে।

তালিকা

বৎসর	আত্মহত্যা-সংখ্যা	জনসংখ্যা	বৎসর	আত্মহত্যা-সংখ্যা	জনসংখ্যা
১৮৭৮	৬০	—	১৮৮৯	৮৩	—
১৮৭৯	৫৯	—	১৮৯০	৮৫	—
১৮৮০	—	—	১৮৯১	৬৬	৬,৮২,৩০৮
১৮৮১	—	৬,১২,৩০৭	১৮৯২	৮৭	—
১৮৮২	৪৫	—	১৮৯৩	—	—
১৮৮৩	৬০	—	১৮৯৪	৬৯	—
১৮৮৪	৫১	—	১৮৯৫	৬৬	—
			১৮৯৬	৭৩	—
১৮৮৫	৫৪	—	১৮৯৭	১০১	—
১৮৮৬	৭১	—	১৮৯৮	৮৯	—
১৮৮৭	৬৫	—	১৮৯৯	৯৯	—
১৮৮৮	৮৪	—	১৯০০	১০২	—

বৎসর	আত্মহত্যা-সংখ্যা	জনসংখ্যা
১৯০১	১০৪	৯,৪৯,১৪৪
১৯০২	১৩৪	—
১৯০৩	১১০	—
১৯০৪	১১৯	—
১৯০৫	১২১	—
১৯০৬	১১৩	—
১৯০৭	১১৫	—
১৯০৮	১৩৬	—
১৯০৯	১১৭	—
১৯১০	১১৫	—
১৯১১	১২৯	১০,৪৩,৩০৭
১৯১২	১০৭	—
১৯১৩	১১৬	—
১৯১৪	১৫৪	—
১৯১৫	১৩১	—
১৯১৬	১৩৫	—
১৯১৭	১৩২	—
১৯১৮	১০৩	—
১৯১৯	১০১	—

বৎসর	আত্মহত্যা-সংখ্যা	জনসংখ্যা
১৯২০	১০০	—
১৯২১	৯৫	১০,৭৭,২৬৪
১৯২২	১০৫	—
১৯২৩	১০৮	—
১৯২৪	৯৮	—
১৯২৫	৯৩	—
১৯২৬	৯২	—
১৯২৭	৯৮	—
১৯২৮	৯৮	—
১৯৯২	১১৩	—
১৯৩০	৮৯	—
১৯৩১	১০৪	১১,৯৬,৭৩৪
১৯৩২	১২৩	—
১৯৩৩	১০৯	—
১৯৩৪	১১৫	—
১৯৩৫	৭৪৪	—
১৯৩৬	১২৬	—
১৯৩৭	১১৩	—
১৯৩৮	—	—

উপরি উল্লিখিত পরিসংখ্যা হ'তে বুঝা যাবে গুটী বসন্ত রোগের ন্যায় আত্মহত্যারও ছয় বৎসর অন্তর তারতম্য ঘটে। জনসংখ্যার বর্দ্ধনের

সহিত আত্মহত্যার সংখ্যা বর্দ্ধিত হলেও উহার মধ্যে একটী নির্দিষ্ট হার ও নীতি দেখা যাবে।

কলিকাতা সহরে নিম্নোক্ত বৎসরের মধ্যে আত্মহত্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে

১৮৭৯—১৮৮৪	৪৫—৬০
১৮৮৫—১৮৯০	৬৫—৮৫
১৮৯১ – ১৮৯৬	৬৬—৮৭
১৮৯৭—১৯০২	৮৯—১৩৪
১৯০৩—১৯০৮	১১০—১৩৬
১৯০৯—১৯১৪	১০৭—১৫৪
১৯১৫—১৯২০	১০০—১৩৫
১৯২১—১৯২৬	৯২—১০৮
১৯২৭—১৯৩২	৮২—১২৩
১৯৩৩—১৯৩৭	১০৯—১৪৪

উপরোক্ত সময়ের মধ্যে বাৎসরিক পরিসংখ্যা গড়ে নিম্নোক্তরূপ দেখা গিয়েছে—

কাল বা সময়	গড়ে (Avarage)	জনসংখ্যা
১৮৭৯—১৮৮৪	৫৩.৭	৬,১২,৩০৭
১৮৮৫—১৮৯০	৭৩.৬	
১৮৯১—১৮৯৬	৭২.২	৬,৮২,৩০৩ (?)
১৮৯৭—১৯০২	১০৪.৮	
১৯০৩—১৯০৮	১১৯.০	৯,৪৯,১৪৪
১৯০৯—১৯১৪	১২৩.০	১০,৪৩,৩০৭

কাল বা সময়	গড় (Avarage)	জনসংখ্যা
১৯১৫—১৯২০	১১৪.৫	
১৯২১—১৯২৬	৯৮.৫	১০, ৭৭,২৬৪
১৯২৭—১৯৩২	১০৩.০	১১,৯৬,৭৩৪
১৯৩৩—১৯৩৭	১২১.০	

১৮৯৬ হ'তে ১৮৭৯ সালে কলিকাতার জনসংখ্যা ছিল ৬ হ'তে ৭ লক্ষ। এই সময় আত্মহত্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে ৬৩ হ'তে ৭৩। ১৮৯৭ হ'তে ১৯৩৭ সালের মধ্যে কলিকাতার জনসংখ্যা ১৩ হ'তে ১১ লক্ষ বর্দ্ধিত হয়। এই সময় আত্মহত্যা সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয় গড়ে ৯৬ হ'তে ১২৩ এর উপরে।

প্রথম তালিকা হ'তে আরও একটী বিশেষ সত্য প্রতীত হবে। অর্থাৎ দেখা যাবে যে প্রতি ১২ বৎসর অন্তর আত্মহত্যা জনিত মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। ১৮৭৯ হ'তে ১৮৯০ সালের পরিসংখ্যা পরিদর্শন করলে ইহা বুঝা যাবে। ১৮৮২ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা সর্ব্ব নিম্ন সংখ্যা ছিল ৪৫ এবং ১৮৯০ সালে উহার সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ৮৫ দেখা যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে ১২ বৎসর বা এক যুগ পরে আত্মহত্যার সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা দেখা গিয়ে থাকে। ১৮৯১ হইতে ১৯০২ সালের পরিসংখ্যা হ'তেও এই একই সত্য উপলব্ধি হবে। ১৮৯১ সালে সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা ছিল ৬৬ এবং ১৯০২ সালে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ১৩৪ ; অর্থাৎ ১২ বৎসর পূর্ণ হলে ঐ সংখ্যার এইরূপ বৃদ্ধি ঘটেছিল। এইক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে ১৯১৪ হইতে ১৯৩৩ সালে পৃথিবীতে প্রথম মহাযুদ্ধ চলছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ের দারুণ উত্তেজনার জন্য এইরূপ বৃদ্ধি ঘটেছিল।

১৮৭৮ হ'তে ১৯৩৭ সালের মধ্যকালে ১৫৪ জন ব্যক্তি কলিকাতাতে আত্মহত্যা করে—এই সংখ্যাটীই কলিকাতার আত্মহত্যার তালিকায় সর্ব্বোচ্চ সংগৃহীত সংখ্যা। ১৯১৪ সালেও সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ১৫৪ এবং তার পর হতেই এই সংখ্যার ক্রমিক হ্রাস ঘটেছে। ১৯১৫ হ'তে ১৯২৬ মধ্যকার তালিকা দেখিলে প্রতীত হয় যে ১৯১৫ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল, ১৩১ এবং উহা ক্রমশঃ কমে এসে ১৯২৬ সালে ৯২টীতে দাঁড়িয়েছে। এই সময় হতে এই সংখ্যার ক্রমিক বর্দ্ধন ঘটে। উহা ১৯২৭ সালে হয় ৯৮টী, এবং ১৯৩৫ সালে হয় ১৪৪টী। তবে ১৯৩৮ সালের সংখ্যা লিপিবদ্ধ হয় নি। ইহা সংগৃহীত হলে হয়তো দেখা যাবে যে এই বারো বছরের শেষেও আত্মহত্যার সংখ্যা হয়েছে সর্ব্বোচ্চ।

এই আত্মহত্যার পরিসংখ্যা অনুধাবন করতে হলে নৈতিক কার্য্য-কারণের সহিত ব্যবহারিক বহির্বিকাশের তুলনা মূলক আলোচনা দরকার। এ ছাড়া আবহাওয়া ও শীত বা গ্রীষ্মের আধিক্য, ঋতুর পরিবর্ত্তন, গ্রহ উপগ্রহের এবং চন্দ্র সূর্য্যের পরিক্রমণের সহিত এই পরিসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির কোনও সম্বন্ধ আছে কি'না তাও জানা দরকার।

মানুষের পাপ বা পুণ্য কার্য্য, উত্থান বা পতনের হ্রাস বা বৃদ্ধি একই রীতিতে চক্রাকারে ঘটে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হত্যা অপরাধের কথা বলা যেতে পারে। এই অপরাধের হ্রাস বৃদ্ধি অবিকল জোয়ার ভাঁটার ন্যায় ঘটে এসেছে। পণ্ডিতপ্রবর এম্ কুইটেলেট, বিবিধ দেশের পরিসংখ্যা সংগ্রহ করে ১৮৩৫ সালে এইরূপ এক অভিমত দিয়েছেন। তাঁর মতে নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হওয়ার পর সমসংখ্যক অপরাধের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

বস্তুতঃপক্ষে সংগৃহীত পরিসংখ্যা হ'তে ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটলে, অর্থাৎ উহা

একই প্রকার থাকলে, নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হওয়ার পর একই প্রকার অপরাধের একইরূপ সংখ্যার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। এই পরিসংখ্যা মানুষের ব্যক্তিগত পাপ বা পুণ্যের উপর নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থার উপর, যে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে উহারা লালিত পালিত বা বর্দ্ধিত হয়েছে।

[বেশী সংখ্যক আত্মহত্যা যে মনোবিকারের কারণে সংঘটিত হয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই মনোবিকার হতে মনো-রোগীদের মুক্ত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি প্রবন্ধের উপরাংশে বিবৃত করেছি। সাধারণভাবে বাক্-প্রয়োগ (Suggestion) এবং কারণ নির্ণয়ের দ্বারা এই সকল রোগীদের নিরাময় করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে ক্ষেত্র বিশেষে রোগীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে সহজে মুক্ত করা যায় নি। কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা তা তারা বুঝেও বুঝে উঠতে পারে নি। এর কারণ এই সময় স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের কারণে তাদের মন এতই অবনমিত (depressed) থাকে যে সহজে বাক্-প্রয়োগগুলি তাদের মনের মধ্যে সক্রীয়ভাবে কার্য্যকরি হয় না। এইজন্য এদের অহেতুক সন্দেহ সমূহের নিরসনও হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথমে দৈহিক এবং স্নায়বিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে থাকে। পুষ্টিকর প্রোটিন খাদ্য দ্বারা এদের লো-ব্লাড-প্রেসার হতে মুক্ত করে তাদের দেহ ও মনকে প্রথমে সতেজ করতে হবে। এর পর এদের যদি নার্ভাস্ ব্রেক ডাউন হয়ে থাকে তা'হলে বিভিন্ন গ্রুপের হরমন ইনজেকসন দ্বারা এদের নিরাময় করতে হবে। বহুক্ষেত্রে মনের অবনমন (depressed) অবস্থায় কোনও একটী পূর্ব্বভীতি বা দুঃশ্চিন্তা মনের মধ্যে কোনও এক কারণে সহসা ঢুকে গেলে উহাকে তাড়ানো শক্ত হয়ে পড়ে। এইক্ষেত্রে তাকে আনন্দদায়ক কথাবার্ত্তা বলে বা ভিন্ন পরিবেশে এনে নিরাময় করা

সম্ভব। কিন্তু তা না হলে ঐ চিন্তার কারণ নির্ণয় করার পর যুক্তি তর্ক দ্বারা তার সকল সন্দেহের নিরসন করা দরকার। তবে পূর্ব্বাহ্নে দৈহিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হতে রোগীকে পুষ্টিকর পথ্য ও খাদ্য এবং ঔষধ দ্বারা নিরাময় করে মনকে সবল না করে দিলে বাক্-প্রয়োগ সমূহ কার্য্যকরী না হওয়ারই সম্ভবনা অধিক।]

দাঙ্গাহাঙ্গামা—অপরাধ

হাঙ্গামাকে ইংরাজিতে বলা হয় Affray. এবং দাঙ্গাকে ইংরাজিতে বলা হয় Riot. পাঁচ ছয় বা ততোধিক ব্যক্তি যদি একই উদ্দেশ্যে কোনও স্থানে সমবেত হয় এবং উহারা যদি কোনও হিংসাত্মক কার্য্য করতে উপক্রম করে তাহ'লে উহাকে বলা হবে বে-আইনী জনতা; কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহাদের একজনও যদি কোনও ব্যাপারে বল-প্রয়োগ বা হিংসাত্মক আচরণ করে তাহ'লে উহাকে দাঙ্গা বা Riot বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে এক হইতে চার ব্যক্তি যদি কোনও ব্যাপারে মারপিঠ স্বরু করে তাকে বলা হয় হাঙ্গামা বা হুজ্জত।

দাঙ্গা বা Riot দুই প্রকারের হয়, যথা—অসাম্প্রদায়িক এবং সাম্প্রদায়িক। অসাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক সাধারণ পর্য্যায়ের অপরাধ। সমাজে বাস করতে হ'লে বহু লোকের সহিত বহু প্রকার বিরোধ ঘটে। এই বিরোধের ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা হওয়া অসম্ভব নয়। বল প্রকাশ দ্বারা আপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা এক প্রাচীন ও সনাতন নীতি। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবৃদ্ধি এবং রাষ্ট্র গঠনের পর এই নীতি পরিত্যক্ত

হয়েছে। এ যুগে অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রগ্রহণ না করে মানুষ রাজদ্বারে অভিযোগ জানায়। রাজশক্তিও ত্বরায় এই সকল বিচার প্রার্থীদের অন্যায়কারী ও প্রবল ব্যক্তিদের অত্যাচার হতে রক্ষা করে। মানুষের সভ্যতা অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, হিংসার উপর নয়। পশু-শক্তি এই যুগে একান্তরূপে অসহায়। নৈতিক শক্তির নিকট সে পরাজয় স্বীকার করেছে। তা না হ'লে দৈহিক বলে বলীয়ান পশুরা মাত্র এখানে বাস করতো এবং সভ্য মানুষ তার বহুবিধ অবদান সহ পৃথিবী হ'তে নিশ্চয় বিদায় নিতো। রিপু সমূহ মানুষের প্রতিরোধ শক্তির হ্রাস ঘটিয়ে তাকে মধ্যে মধ্যে পুনর্বার পশু করে দেয়। এই অবস্থায় মানুষ সমুদয় রাষ্ট্রীয় বিধি লঙ্ঘন করে নিজেদের মধ্যে হানাহানি সুরু করে।

এদেশে সম্পত্তি দখল, ভাগাভাগী এবং জমীদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায়শক্ষেত্রে দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছে। প্রথমে দুই ব্যক্তির পরস্পর বিরোধী স্বার্থের কারণে এই বিরোধ সুরু হয়। পরে উহাদের বেতন বা করুণা-ভোগ্য ব্যক্তি এবং সমর্থকরা এই উভয় ব্যক্তির পক্ষে যোগ দেয়। এর পর এই উভয় দলের মধ্যে সুরু হয় রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামা। এই হাঙ্গামাকে ছোট-খাটো সংগ্রামও বলা চলে।

সামান্য কলহ বা রেষারেষির ফলেও এইরূপ হাঙ্গামা সুরু হয়েছে। একটী অপরিসর পাঁচিল বা মাত্র এক বিষত পরিমিত জমির জন্যও এই হাঙ্গামা হয়ে থাকে। এখানে একমাত্র প্রশ্ন থাকে জেদ বা সম্মানহানীর।

দাঙ্গাহাঙ্গামা বা যুদ্ধ মানুষের আদিম বৃত্তি। তাই মানুষ এখনও দাঙ্গাহাঙ্গামা ভালবাসে। মারামারি থামাতে আসে কম লোক, কিন্তু তা দেখবার জন্য বহু লোকই ভীড় করে। হাঙ্গামা দর্শনের মধ্যে এরা পুলক ও শিহরণ অনুভব করে। কারণ মানুষ এখনও সভ্যতার শেষ স্তরে

উপনীত হয় নি। মধ্যে মধ্যে সে আত্মবিস্মৃত হয়ে আদিম মানুষ হয়। কিন্তু সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান যুক্তিতর্ক, মানুষকে পুনরায় আত্মস্থ করে দিতে সক্ষম। এ সম্বন্ধে নিম্নে আমার একটী মোস্লেম বন্ধুর বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমি দেশে এসে দেখি আমার পুত্রেরা পরিজনবর্গ সহ আমার বাল্য বন্ধু হরিদাসের সহিত হাঙ্গামা করার জন্য প্রস্তুত। হাঙ্গামার কারণ ছিল উভয় পরিবারের জমির মধ্যস্থ মাত্র ছয় হাত পরিমাণ ভূমির দখলী-সত্ব। আমি তখন হরিদাসকে ডাক দিয়ে বললাম, 'ভাই, আমি মুসলমান। আমি মারা গেলে তবুও দৈর্ঘ্যে ছয় এবং প্রস্থে তিন ফুট জমির দরকার হবে। কিন্তু তুই তো হিন্দু! তোর তো এটুকুরও আর প্রয়োজন হবে না। কিসের জন্যে তাহ'লে এই বিরোধ? এই তত্ব কথা শুনে হরিদাস প্রকৃতস্থ হয়ে বিষয়টী মিটমাট করেছিল।"

পূর্ব্বকালে এক জমীদার অপর জমীদারের সহিত জমির দখলী-সত্ব নিয়ে প্রায়ই দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হতেন। এ'জন্য বড় বড় লাঠিয়ালকে তাঁরা কাছারী সমূহে নিযুক্ত রাখতেন। এই লাঠিয়ালগণ ছিল জমীদারের মাসিক বেতনে প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত "রেগুলার আর্ম্মি"। এ ছাড়া এঁদের প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত "ইরেগুলার আর্ম্মিও" ছিল। প্রজাসাধারণ ছিল এঁদের ইরেগুলার বা অনিয়মিত ফৌজ। হাঙ্গামার সময় সবল ও সাহসী প্রজারা স্ব স্ব জমীদারদের পক্ষে দাঙ্গা করে প্রাণ দিয়েছে। এইরূপ সাহায্যের জন্য জমীদারগণ বহু সাহসী প্রজাদের নিষ্কর ভূমিদানও করেছেন।

এই দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে কোনও জাত পচ বা সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। বহুক্ষেত্রে হিন্দু প্রজারা মুসলমান জমীদার এবং মুসলমান প্রজারা হিন্দু জমীদারের পক্ষে যে যোগ দেয় নি তা'ও নয়। তবে বাংলা দেশে

হিন্দু জমীদারদের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় এ প্রশ্ন কখনও উঠে নি। হিন্দু জমীদারের পক্ষে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রজারা প্রয়োজন মত যোগ দিয়েছে। সাধারণতঃ চর দখল নিয়ে এই দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু হয়েছে। উভয় জমীদারের জমির সীমানায় নদীর বুকে চর উঠলে এই চরের মালিকানা নিয়ে বিরোধ বাধে। বলবান পক্ষ গায়ের জোরে এই চর দখল করে নেয়। চর দখল নিয়ে জমীদারের ন্যায় প্রজাদের মধ্যেও বিবাদ হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে চরের উপর মুসলমান এবং হিন্দু নমঃশূদ্র—এই উভয় সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। এইজন্য নূতন চর উঠলে উহার দখলী-সত্ব নিয়ে জমীদারদের অগোচরে এই উভয় সম্প্রদায়ও দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই দাঙ্গা অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক নয়। অসংশ্লিষ্ট হিন্দু মুসলমান এই দাঙ্গায় আগ্রহশীল হয় নি। পল্লী অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী প্রায়শক্ষেত্রে দেখা যায় নি। ইহা সম্রাজ্য-বাদীদের সৃষ্ট এক অধুনাতম বিষ-ফল। এই দাঙ্গার স্বরূপ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"আমি খুলনা, ফরিদপুর এবং বরিশাল অঞ্চলে জমি ও চরের দখলী-সত্ব নিয়ে বা কোনও সামাজিক কারণে এই মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের বহু দাঙ্গাহাঙ্গামা পরিদর্শন করেছি। উভয় দল গ্রামের বাহিরে কোনও এক উন্মুক্ত স্থানে দাঙ্গার জন্য সমবেত হয়েছে, কিন্তু এ'জন্য তারা কখনও গ্রামের শান্তি নষ্ট করে নি। বহুক্ষেত্রে এই দাঙ্গা মাসাধিককাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছে। দাঙ্গার খবর গ্রামবাসীরা প্রায়ই পুলিশে জানায় নি বরং তা তারা দূর থেকে উপভোগ করেছে। পুলিশ খবর পেয়ে অকুস্থলে এসেছে, কিন্তু উহা রোধ করতে পারে নি। বহু পরে সশস্ত্র বাহিনী এসে দাঙ্গাকারীদের ছত্র ভঙ্গ করেছে।

দাঙ্গার খবর পেয়ে বিভিন্ন স্থান হতে জোয়ান পুরুষরা ঢাল, সড়কী ও

চিঁড়ে-মুড়কীর পুঁটলি হাতে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে যোগ দিতো। বহু লোক আহত এবং নিহতও হতো, কিন্তু তা সত্বেও সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমরা যা বুঝি তা এদের মধ্যে দেখি নি। দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া সাম্প্রদায়িক কারণে অপর কারো ক্ষতি এরা চিন্তাও করে নি। এমন কি এই দাঙ্গার মধ্যেও এরা মনুষ্যত্বও দেখিয়েছে। কারো কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করে কেঁচা (বর্শা) ছুঁড়ে মুসলমান সর্দ্দার চেঁচিয়ে উঠেছে, রাধূ ভায়া ও-ও-মণ্ডলের পো! গলা-আ, গলা বাঁচা, এই ছুঁড়লাম। সঙ্কেত পাওয়া মাত্র হিন্দুর ছেলে রাধু মণ্ডল বাঁশের, চামড়ার বা বেতের তৈরী ঢাল দিয়ে গলা বাঁচিয়ে প্রত্যুত্তর করেছে, 'সাবাস দিনু মিঞা! এখন নাক, নাক বাঁচাও, এই দিলাম ছুঁড়ে। এই বলে মণ্ডলের বেটা রাধু, কানা ভাঙা এক থালি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলে। সুদর্শন চক্রের ন্যায় এই থালি ঘুরতে ঘুরতে মানুষের গলা দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। অবশ্য সব কিছু নির্ভর করে হাতের তাগ বা ছোঁড়ার কায়দার উপর। সতর্ককৃত হয়ে প্রতিরোধ না করলে উহা নিশ্চয় মোছলমানের ছাওয়াল দিনু মিয়ার মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করে দিত।"

[এই ধরণের আধা-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও সংঘটিত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাঞ্জাবের গুরগাঁও জিলার এই প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা বলা যেতে পারে। সেখানে সেরপ নামক মোসলেম চাষী সম্প্রদায় এবং হিন্দু জাঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ বাৎসরিক দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রায়ই ঘটে থাকে। এই সময় এরা উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের কখনও ক্ষতি সাধন করে নি। বরং এদের নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আনাগোনা করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষ যোদ্ধৃদের আহার্য্য ও পানীয় সরবরাহ এবং প্রয়োজনবোধে শুশ্রূষাও করে এসেছে।]

এই কেঁচা, বর্শা, ঢাল, কাতান, দাও, ছোরা ও লাঠি ছাড়া এরা একপ্রকার অস্ত্র ব্যবহার করে। একটী ইট দড়ীর গিঁটের মধ্যে রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন করে ছুঁড়ে দেয় যে ঐ ইষ্টক খণ্ড গুলির ন্যায় ছুটে শত্রুকে বিদ্ধ করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তীর ধনুকও ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ তীরের সহিত অগ্নিশলাকাও ব্যবহৃত হতো। তীরের ফলায় তৈলসিক্ত কাপড় জড়িয়ে অগ্নি সংযোগ করে এই অগ্নিশলাকা তৈরী করা হতো। তবে প্রায়শক্ষেত্রে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লাঠিই একমাত্র অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। নিপুণ খেলোয়াড়ের হাতে এই লাঠি পড়লে উহা দুর্জ্জয় শক্তি আনয়ন করে। ঘূর্ণায়মান বংশযষ্টি রাইফেলের গুলিও প্রতিরোধ করে। এই সময় ইহা তরোয়াল বা সড়কী ভেঙ্গে দুইখান করে দেয়। এইজন্য এই দেশের লাঠিয়ালরা যত্ন করে লাঠি ও কোস্তা খেলা শিক্ষা করে থাকে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের মতে ইহা বাঙ্গালীর মান, ধান ও ধন রাখতে সমভাবে সক্ষম ছিল।

দাঙ্গাহাঙ্গামায় বন্দুক কদাচিত ব্যবহৃত হয়েছে। এদেশে সাধারণ দাঙ্গাহাঙ্গামায় নীলকুঠির সাহেবরা দেশীয় জমীদারদের বিরুদ্ধে প্রথম আগ্নের অস্ত্র ব্যবহার করে ছিলেন। এর প্রত্যুত্তরে কোনও কোনও জমীদার বন্দুক ব্যবহার করে ছিলেন। কিন্তু বন্দুক অপেক্ষা নদী মাতৃক বাঙ্গলা দেশে সড়কী ও লাঠিই অধিক উপযোগী ছিল। বাঙ্গলার দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধ শ্রেণী রায়বেঁশেরা লাঠি এবং সড়কীর উপর অধিক নির্ভরশীল ছিলেন।

প্রাচীন দাঙ্গাকারীরা অত্যন্তরূপ দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির ছিল। স্ব স্ব জমীদার বা রাজার জন্য এরা সকল সময় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। দাঙ্গার সময় ক্ষত চিকিৎসার জন্য এরা বহু গাছ-গাছড়া, শিকড় ও পাতা সঙ্গে নিতো। এগুলো আহত ব্যক্তিদের অব্যর্থ ঔষধ ছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ

কালে এদের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য্য। প্রকৃত যুদ্ধের সময়, আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ও গরিলা যুদ্ধের জন্য এরা শাসক শ্রেণী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে। এরা চিরকালই জমীদারদের তাঁবেদার প্রজা। এইজন্য জমীদারগণ রাজকীয় বা নবাবী ফৌজের সাহায্যে এদের প্রেরণ করেছে। 'রণ-পা', ঢাল, সড়কী ও লাঠিই ছিল এদের প্রধান অস্ত্র। এই 'রণ-পা' সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে।

এই দাঙ্গা সকল যে স্থলেই হয়েছে তা নয়। জলের উপর ছিপ ও নৌকা সাহায্যেও এই দাঙ্গা সাধিত হয়েছে। এইরূপ দাঙ্গায় দাঙ্গাকারীদের হুঙ্কার দিয়ে বলতে শুনা গেছে, 'দশ হাত জলের তলে মাছ রয়। তাকেই গেঁথে তুল্‌ছি। তোরে তো হালা দেখা যায়, তোকে তো গাঁথ্‌মুই, ইত্যাদি।' তবে যারা জলে দাঙ্গা করে তারা যে স্থলেও তা না করে এ নয়। এই দাঙ্গাকারীরা ভীষণ প্রকৃতির হয়ে থাকে। মানুষের মুণ্ড বিচ্ছিন্ন ক'রে এরা আঁজলা ভরে রক্ত পান করেছে, মুণ্ড সহ নৃত্যও। ক্রোধ ও প্রতিহিংসা এদের উন্মাদ করে পশুতে পরিণত করে। অকাজ কুকাজ এই সময় এরা অকুণ্ঠ চিত্তে ক'রেছে।

এই দাঙ্গাহাঙ্গামায় শত শত লোকও যোগ দিয়েছে। সাধারণতঃ পঞ্চাশ হ'তে একশো লোক দাঙ্গাহাঙ্গামায যোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু শহরাঞ্চল রক্ষী বহুল হওয়ায় এইখানে অতো লোকের পক্ষে একত্রে হামলা করা সম্ভব হয় না। এইজন্য শহরাঞ্চলে মাত্র ২০।২৫ জন লোককে দাঙ্গাহাঙ্গামা করতে দেখা গিয়েছে। অবশ্য রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। এইরূপ ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র লোক এই দাঙ্গায় যোগ দিয়েছে।

ডাকাতি আদির ন্যায় দাঙ্গা পূর্ব্ব কল্পিত নয়। এই অপরাধ বহু ক্ষেত্রে সহসা ঘটে যায়। পল্লী অঞ্চলে জমীদারদের স্বার্থ রক্ষার্থে বড়

বড় দাঙ্গা হয়। এইজন্য মামলায় জমীদারদেরও জড়িয়ে দেওয়া হয়। সাক্ষাৎ ভাবে এঁরা দাঙ্গায় লিপ্ত না থাকলেও বিপক্ষ পক্ষ প্রায় এঁদের এইজন্য দায়ী করেছে। এই কারণে জমীদারগণ বিশেষ চাতুর্য্যের সহিত এই অভিযোগ হতে অব্যাহতি পেতেন। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"আমাদের জমীদারীর সীমানায় ঐ চরটী দখল করবার আমার প্রয়োজন হয়। আমি বাছা বাছা লাঠিয়াল এইজন্য নিয়োগ করি। আমি কিন্তু এই সময় গ্রামেই হাজির থাকি না। আমি অশ্বারোহণে দ্রুত বিংশ মাইল পথ অতিক্রম করে মহকুমা হাকিমের সঙ্গে দেখা করি। অন্যদিকে এই সময়েই নির্দ্দেশ মত আমার লোকেরা দাঙ্গা সুরু করে দেয়। হাকিমের বাঙলায় ঐ দিন বহুক্ষণ হাজির থাকায় আমাকে এই ব্যাপারে আর জড়ানো যায় নি। প্রতিপক্ষ অগত্যা আমার ম্যানেজারের নামে মামলা দায়ের করে। ম্যানেজার অরাজী ছিলেন না। তিনি জানতেন যে মেয়াদ হলে তাঁর পরিবারবর্গকে আমি ভরণপোষণ করবো এবং তজ্জন্য তাকে থোক টাকাও কিছু দেবো।"

জমীদারদের কল্যাণে এই দাঙ্গা জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। জমি বা চর দখলের জন্য প্রতিদ্বন্দী জমীদারগণ এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রায়শঃই লিপ্ত থাকতেন। এইজন্য এই প্রদেশের জমীদারগণ বহু লাঠিয়াল এবং বরকন্দাজগণকে আজীবন পোষণ করেছেন। নদী বক্ষ হ'তে চর সমূহ জেগে উঠার পর উহাদের দখলি-সত্ব নিয়ে এই দাঙ্গাহাঙ্গামার অবতারণা হতো। প্রতি বৎসর আপন আপন জমীদারদের স্বার্থ এবং সম্মান রক্ষার জন্য বহু বাঙ্গালীকেই জীবন দিতে হয়েছে। এই সকল দাঙ্গাকারীদের সকলেই যে বেতন ভুক্ত পাইক বা বরকন্দাজ ছিল তা নয়। প্রজাদের মধ্য হতেও বহু জোয়ান লোক এই

দাঙ্গায় যোগ দিতে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়ে এসেছে। এই দাঙ্গাহাঙ্গামাকে ছোট-খাটো গৃহ-যুদ্ধ বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাঙ্গালী জাতি যে চিরকালই শান্তিপ্রিয় ছিল না, তা এই সকল বাৎসরিক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রাচুর্য্য হতে প্রমাণিত হবে। এই সকল দাঙ্গাহাঙ্গামায় তীর, ধনুক, সড়কী, তরোয়াল, লাঠি, এমন কি গোলা বারুদও সমভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অর্দ্ধ স্বাধীন জমীদারদের এই যুদ্ধপ্রিয়তা দমন করতে নবাব সরকার কোনও দিনই এগিয়ে আসেন নি বা এগিয়ে আসতে সাহসী হন নি। ক্ষেত্র বিশেষে মাসাধিক কাল ধরেও এই সকল উপযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এমন কি বহু জোয়ান লোকের এতে মৃত্যুও ঘটেছে। এইরূপ হানাহানি ব্রিটিশ শাসনের প্রথম এবং মধ্যভাগেও সমভাবে চলে এসেছিল। কিন্তু এতো সত্বেও জমীদারদের মধ্যে অসদ্ভাব কখনও চিরস্থায়ীরূপে প্রকাশ পায় নি। মধ্য যুগে এই সকল জমীদার এবং তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গগণ এমনই দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন যে বাংলার নবাবদেরও তাদের ভয় করে চলতে হয়েছে। একত্র হয়ে এঁরা যদি চেষ্টা করতেন তা'হলে একদিনেই বিদেশী শাসকদের এঁরা দূরীভূত করে দিতে সক্ষম হতেন। কিন্তু নানাকারণে তা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠে নি। মহারাজ প্রতাপাদিত্য একা বাংলা দেশের একাংশ বিদেশী কবল হতে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। অন্যান্য জমীদারেরা এই সময় তাঁর সহিত যোগ দিলে বাংলা দেশের ইতিহাস অন্যরূপে লিখিত হতো। বাঙ্গালীর এই দাঙ্গাপ্রিয়তা আজও কমে নি। তাই প্রায়ই একদলকে অপর এক দলের সহিত দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হতে আজও দেখা যায়।

সহরাঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামায়, লাঠির সহিত লৌহ ডাণ্ডা, ছোরা, ছুরি এবং সময় বিশেষে আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনও কোনও স্থলে এ্যাসিড্ বাল্বও (এ্যাসিড ভরা বাল্ব) দাঙ্গাকারীরা ব্যবহার

করেছে। পল্লী অঞ্চলের দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রায়শঃই অসাম্প্রদায়িক হয়ে থাকে এবং সহরে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক দাঙ্গাহাঙ্গামা অধিক ঘটে।

এদেশে পূর্ব্বকালে বিবাহ বাসরে বর পক্ষ এবং কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও বহু দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে গিয়েছে। বরযাত্রী মাত্রেই তা তিনি যে-কোনও স্তরের মানুষই হোন না কেন, বরযাত্রীরূপে তাঁরা নিজেদের একজন বিজয়ী বীর রূপেই মনে করে থাকেন। কারণে এবং অকারণে কন্যাযাত্রীদের এঁরা প্রায়ই অপমান ক'রে দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণ ঘটিয়েছেন। পূরাকালে বরকে যুদ্ধ করে কন্যা জয় করে বিবাহ করতে হতো —তাই বাংলার বরযাত্রীরা আজও হয়তো এই যুদ্ধের মহড়া দিয়ে থাকেন। কন্যাপক্ষীয়দের মনোবৃত্তিও এই সময় পরাজিতদের ন্যায় হয়ে থাকে। এইজন্য এঁদের মনোভাব আত্ম-রক্ষামূলক হয়। এঁদের মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভাব খুব কম ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সহিত ভারতবর্ষ বহুকাল হ'তে পরিচিত। মধ্য-যুগে এদেশে বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের মধ্যে এই দাঙ্গা ঘটেছে। বাঙ্গালা দেশ এই সময় বৌদ্ধ প্রধান ছিল। ঐ সময়কার কোনও কোনও বাংলা সাহিত্য হ'তে এই বিদ্বেষের কথা জানা যায়। হিন্দুদের প্রতি একদল বৌদ্ধদের আক্রোশ এতো অধিক হয়েছিল যে মোসলেম আক্রমণ সুরু হ'লে এদের কোনও এক অবিবেচক কবি লিখেছিলেন, 'বৌদ্ধের দেবতা আসে চাঁদ মাথায় দিয়ে'। তবে এইরূপ মনোবৃত্তি সম্পন্ন

বৌদ্ধের সংখ্যা নগণ্য ছিল। বৌদ্ধগণ হিন্দুদের সহিত এই সময় দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে। কেহ কেহ বলেন যে হিন্দুদের অত্যাচারে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারত হ'তে বিলুপ্ত হয়। এই অত্যাচারে না'কি অতিষ্ঠ হ'য়ে অবশিষ্ট ভারতীয় বৌদ্ধদের কেহ কেহ হিন্দুদের অধীনে থাকা অপেক্ষা বিদেশী রাজত্বও পছন্দ করেছিল। কিন্তু একথা সত্য ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। এই বৌদ্ধরাই এই বিধর্ম্মী বিদেশীদের হাতে অধিক নিগৃহীত হয়। ঐ সময় পূর্ব্ববাংলা,* সিন্ধু, কাশ্মীর, পশ্চিম পাঞ্জাবে মাত্র বৌদ্ধরা অধিক সংখ্যায় বাস করতেন। ভারতের অন্যান্য অংশ হতে এই ধর্ম্ম প্রায় বিদূরিত হয়েছিল। মোস্‌লেম আক্রমণকারীরা হিন্দুদের ধর্ম্মান্তরিত করতে পারে নি। তারা এই বৌদ্ধদের এবং নিম্ন শ্রেণীর কিছু সংখ্যক হিন্দুদেরই মাত্র মুসলমান করে। বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধ হতেই মুসলমান হয়েছে বেশী। হিন্দু হ'তে মুসলমান কমই হয়েছে। হিন্দুরা 'জু'দের ন্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত রক্ষণশীল। প্রাণ দিয়েও তাদের প্রিয় ধর্ম্ম তারা রক্ষা করেছে। অহিংসা মন্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা এই সময়ে বৌদ্ধদের দুর্ব্বল করে তুলে। এইজন্য এরা প্রায়শক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। বৌদ্ধরা সাধারণতঃ মাথা নেড়া রাখতো। এইজন্য বাংলায় মুসলমানকে হিন্দুরা আজও "নেড়ে" বলে। কারণ তাদের চক্ষের সম্মুখেই এই নেড়েরা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই "নেড়ে" শব্দটী

---

* প্রকৃত বাংলা বা বঙ্গ অর্থে পূর্ব্বকালে পূর্ব্ববঙ্গকেই বুঝাত। পশ্চিম বঙ্গকে রাঢ় দেশ এবং উত্তর বঙ্গকে বরেন্দ্র ভূমি বলা হতো। সমগ্র রাঢ় দেশ ও বরেন্দ্র ভূমির উত্তরাংশ হিন্দু বহুল ছিল। বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র, উৎকল ও বিহারকে পরবর্ত্তীকালে সুবা বাংলা বলা হতো।

হিন্দু ও বৌদ্ধদের পূর্ব্ব-অসদ্ভাবের লুপ্ত প্রতীক। দেশীয় মুসলমানদের লুঙ্গি বৌদ্ধদের অবদান। বর্ম্মা ও মগ দেশীয় বৌদ্ধরা আজও লুঙ্গি পরে। মুসলমানরা উহা আরব, পারস্য বা আফগান দেশ হ'তে সংগ্রহ করে নি।

এই হিন্দু ও বৌদ্ধদের কলহ ও দাঙ্গা নিবারণ করতে বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজাদের বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। এক সময় প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্ম দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও উহারা পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে অতি অল্পদিনের মধ্যে পুনর্দীক্ষিত হয়। কিন্তু এইরূপ অসাধ্য সাধন যে মাত্র প্রচার দ্বারা সম্ভব হয়েছিল তা মনে হয় না। বহুক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে বল প্রয়োগের কথাও শুনা গিয়েছে।

প্রাক্‌-ব্রিটিশকালে বাংলা দেশে বৈষ্ণব এবং শাক্তদের মধ্যেও বহু কলহ ও দাঙ্গা ঘটে গিয়েছে। পূজা পদ্ধতি ও আমিষ বা নিরামিষ খাদ্য ছিল এই কলহ ও দাঙ্গার কারণ। এখনও এইরূপ দাঙ্গা বহুস্থানে ঘটে। শাক্তধর্ম্মী হিন্দুরা বৈষ্ণবদের মাথায় পচা ডিম ফেলে বা তাদের টিকি কেটে দিয়ে অপমান করে বলেছে, 'নেড়া নেড়ী' 'ডিম খাবি' ইত্যাদি।

এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই সকল ধর্ম্মীয় কলহ আধুনিক সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা দুষ্ট ছিল না। হিন্দু, বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, শিখ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্ম এই দেশেই উদ্ভূত হয়েছে এই দেশের মনীষীদেরই দ্বারা। একই পরিবারের এক ভাই ছিল বৌদ্ধ, অপর ভাই ছিল হিন্দু। স্বামী ঘোরতর শাক্ত এবং তার স্ত্রী ছিল একজন পরম বৈষ্ণব। একই গৃহে একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি আপন আপন বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী ধর্ম্মাচরণ করেছে। বাহিরে কদাচ কলহ দেখা দিলেও তা ছিল একান্তরূপে সাময়িক এবং উহা গৃহের, পল্লীর বা দেশের শান্তি কম ক্ষেত্রেই ব্যাহত করেছে। ব্যক্তিগতভাবে এক একজন এক এক পদ্ধতিতে

উপাসনা করলেও প্রত্যেক মতবাদীদের ধর্ম্মোৎসবে সকলে সমভাবেই যোগ দিয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এইখানে। বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান মাত্র এই দেশেই আমরা পাই। বস্তুতপক্ষে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম উপরোক্ত বিবিধ সংখ্যালঘু ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের একটী সুসংবদ্ধ ফেডারেশন মাত্র। হিন্দুধর্ম্ম কোনও একটী সম্প্রদায় বা ইন্‌ষ্টিটিউসন নয়। বরং উহাকে একটি ইউনিভারসিটি বা ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলা যেতে পারে।

[চীন দেশে অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ও কুনফুসাস। ঐ দেশে কিছু ক্রীশ্চান এবং বহু মুসলমানও আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ দেশে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। কারণ চীন দেশ বিদেশ হতে আগত বৌদ্ধ, মোস্‌লেম ও ক্রীশ্চান ধর্ম্ম অবলম্বন করলেও চীনেরা তাদের সংস্কৃতি বা কৃষ্টি হারায় নি। তারা তাদের "চৈ-নিক" নামে আজও পরিচিত, আরবী নামে নয়। বহুস্থলে একই পরিবারের একজন বৌদ্ধ এবং একজন মুসলমান বা ক্রীশ্চান দেখা গেছে। মুসলমান ধর্ম্মকে ঐ দেশের জল মাটীর উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃত মোস্‌লেম ধর্ম্ম এইখানে দেখা যায় না। এদের অবস্থা আবেসেনীয়াস্থ ক্রীশ্চান ধর্ম্ম বা তিব্বতের বৌদ্ধ বা লামা ধর্ম্মের এবং ইণ্ডোনিয়াস্থ মোসলেম ধর্ম্মের সহিত তুলনা করা চলে। কেহ কেহ এই অবস্থাকে বিকৃত ক্রীশ্চান, মোস্‌লেম বা বৌদ্ধধর্ম্ম বলেন, কিন্তু তা বলা অন্যায়। বলিদ্বীপের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। বিদেশাগত ধর্ম্ম এই সকল দেশের জলবায়ু ও মনুষ্য প্রকৃতির উপযোগী করে গ্রহণ করা হয়েছে, এই যা! এবং তা তারা করেছে তাদের জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রেখে। এদের পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মের সহিত নবাগত ধর্ম্মের কোনও বিরোধ নেই বরং উহারা উহাদের শ্রদ্ধা করে থাকে।]

ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের কলহ দাঙ্গা এই প্রকৃতির ঝগড়া নয়। উহা যথার্থরূপে সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট দাঙ্গা। অন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ প্রচলিত না থাকায় এই ধর্ম্মীয় কলহ বিজাতীয় বিদ্বেষ প্রসূত হয়। ধর্ম্মীয় ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিদেশী মতবাদ গ্রহণ করলে ফল এইরূপই হয়ে থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধরা পরস্পর পরস্পরের দেবতা বা মন্দিরকে ধ্বংস করে নি বরং তারা সমভাবেই উহাদের সম্মান করেছে, ঠিক যেমন ক'রে একজন 'ফিজিকস্'এর পণ্ডিত একজন 'কেমিষ্ট্রী'র পণ্ডিতকে সম্মান দেখায়। কিন্তু পূর্ব্বকালীন মুসলমানগণ সকল সময়ই নিজেদের বিদেশী ভেবেছে, তা না' হলে তাদের দেশীয় নাম পরিত্যাগ করে আরব দেশীয় নাম গ্রহণ করতো না। অপর দিকে বহু হিন্দু এদেশে খৃষ্টান হয়েছে, কিন্তু মুখার্জ্জী, মিত্র প্রভৃতি বংশের পরিচয় ও ভারতীয় নাম তারা হারায় নি। এক কথায় তারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলেও কৃষ্টি বা কালচার হারায় নি। তাই আজও আচার-ব্যবহারে একজন ভারতীয় হিন্দু ও একজন দেশীয় খৃষ্টানকে চেনা যায় না। আধুনিক হিন্দুরাও, গীর্জ্জায় গিয়ে মাদার মেরীকে প্রণাম করতে দ্বিধাবোধ করে নি। খৃষ্টানরাও হিন্দুদের গীর্জ্জায় প্রবেশে বাধা দেয় নি। খৃষ্টানদেরও আজকাল সর্ব্বজনীন পূজামণ্ডপে এবং বিখ্যাত হিন্দু মন্দির সমূহে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। একথা স্বীকার্য্য যে ক্যাথালিক ক্রীশ্চান এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় সেই সাদৃশ্য শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে দেখা যায় নি।

কারণ দেশীয় খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ও শিখেরা ধর্ম্মমতে ভিন্ন হলেও একই কৃষ্টির অধিকারী। এইজন্য আচার-ব্যবহার এবং পোষাক-পরিচ্ছদ এবং চিন্তাধারা এদের বিভিন্ন নয়। এই দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় এবং ইংরাজগণ ধর্ম্মের কারণে এক জাতিত্বের দাবী করে নি। এদেশে বহু দেশীয় মুসলমানও আছে যারা ধর্ম্মের কারণে নিজেদের ভিন্ন

দেশীয় মনে করে না। এরা সত্যপীরের অর্চ্চনা করে, পীরপয়গম্বরের দরগায় সিন্নি দেয়, কবরে কবরে প্রদীপ জ্বালে। মোসলেমদের এই উপাসনা পদ্ধতিতে হিন্দুরাও সানন্দে যোগ দেয়। বহু মুসলমানকে আমরা তারকেশ্বর তীর্থে এসে হত্যা দিতে দেখেছি। সাধু সন্ন্যাসী, দরবেশ এবং ফকিরকে হিন্দু মুসলমান সমভাবেই শ্রদ্ধা করে। বহু মুসলমান আজও হিন্দু নাম ব্যবহার করে। যারা তা করে না তারা তাদের নামের আগে 'শ্রী' ব্যবহার ক'রে উপলব্ধি করে যে তারা এই দেশেরই মানুষ। এদেশের চিত্রকর নামক মোস্‌লেম সম্প্রদায় আজও পদবীসহ হিন্দুনাম ব্যবহার করে থাকে। যথা, বাসুদেব চিত্রকর, ইত্যাদি। বহু উপাসনা পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহার, হিন্দু এবং মুসলমান সভ্যতার সংমিশ্রণে ঘটেছে। এইরূপ সংমিশ্রণ না ঘটলে এক-জাতিত্ব-বোধ ঘটে না। একই দেশে একই জাতির অংশরূপে বাস করতে হলে মুসলমানদেরও ভাবতে হবে যে তারা ধর্ম্মে মোস্‌লেম হলেও জাতিতে হিন্দু। সত্যকে সত্য রূপে স্বীকার করার মধ্যে লজ্জাই বা কি আছে। দুঃখের বিষয় বহু শিক্ষিত মুসলমান এই সত্য স্বীকার করতে চান না। নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টী বুঝা যাবে।

"আমাদের পরিবারে বহু হিন্দু প্রথা বর্ত্তমান থাকায় আমি প্রায়ই অবাক হতাম। একদিন আমাদের সাত পুরুষের ভিটায় 'পাতকো' খোঁড়ার সময় বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি উত্তেলিত হয়। আমার বাবা ও কাকা তাড়াতাড়ি ঐগুলো সরিয়ে ফেলে আমাদের সাবধান করে দেন যাতে একথা কাউকে আমরা না বলি। তাদের ভয় পাছে লোকে মনে করে যে আমরা পূর্ব্বে হিন্দু ছিলাম এবং আমরা বিজেতারূপে আরব দেশ থেকে আসি নি।"

ভুল পথে চিন্তাধারা প্রবাহিত হওয়ার কারণে এইরূপ মনোবৃত্তি

স্থান পেয়েছে। এবং এইরূপ মনোবৃত্তিই আধুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণ। এইরূপ চিন্তাধারা হিন্দুদেরও ক্ষতি করেছে। বহু হিন্দুরও ধারণা যে এদেশীয় মুসলমানদের পূর্ব্ব পুরুষরাই বুঝি ভারত আক্রমণ করে তাদের ধর্ম্ম ও দেব মন্দির বিনষ্ট করেছিল। এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়েও বহু হিন্দু দেশীয় মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়েছেন। বরং যে সকল কারণে হিন্দুদের একাংশ মুসলমান হয়েছে সেই কারণগুলির কথা ভেবে তাদের লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

ধর্ম্ম মাত্রই একই কথা বলে। পথ আলাদা হলেও মত একই। লক্ষ্য বস্তুও তাদের একই থাকে। ধর্ম্মমতগুলির সংমিশ্রণে মানুষের ভালোই হবে। তুলনা মূলক ভাবে পৃথিবীর ধর্ম্মমতগুলি মানুষ মাত্রেরই আলোচনা করা উচিত। মোস্‌লেম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদ ভারতবর্ষে জন্মালে কিংবা বিজেতাদের সহিত এই ধর্ম্মের আগমন না হ'লে হয়তো এতো গোলযোগ দেখা যেতো না।

দুর্ভাগ্য বশতঃ একশ্রেণীর লোক কোনও এক শুভ বা অশুভ মুহূর্ত্তে দ্বিজাতিত্ব-বোধ এদেশের মুসলমানদের মধ্যে এনে দেওয়ায় মুসলমান রাজত্বের কাল হতে যে কৃষ্টিগত সংমিশ্রণ ঘটছিল তা ব্যাহত হয়ে যায়। নানক এবং কবির পন্থী, পীর পন্থী, সুফিইজম্ প্রভৃতি সংযোজক ধর্ম্ম আর এদেশে কার্য্যকরী হতে পারে না। বলা বাহুল্য এই অপপ্রচার বিদেশীদের ইঙ্গিতেই হচ্ছিল। পুনঃ পুনঃ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা ইহার কুফল সুদূর-প্রসারী হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ প্রকৃত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতে মুহুর্মুহুঃ সংঘটিত হয়েছে।

যতক্ষণ হিন্দু এবং মুসলমান ভাববে যে দেশীয় মুসলমানরা আরব দেশীয় লোক ততক্ষণ এই দ্বিজাতিত্ব-বোধ যাবে না। হয়তো কোনও কোনও

প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিদেশী রক্ত আছে, কিন্তু তা কি কোনও কোনও হিন্দুদেরও মধ্যে নেই? বহু জাতি বহু ধর্ম্ম এদেশে এসেছে এবং এই হিন্দুত্বের মধ্যে তা বিলীন হয়ে গিয়েছে। এদেশের দেশীয় ক্রীশ্চানদের যেমন ইংরাজদের কোনও দুষ্কৃতির জন্য দায়ী করা যায় না, তেমনি দেশীয় মুসলমানদেরও মোগল বা পাঠানদের কোনও দুষ্কৃতি বা পররাজ্যলিপ্সার জন্য দায়ী করা চলে না। বিদেশী আক্রমণ যারা প্রতিরোধ করতে পারে নি তারা ছিল এই দেশেরই হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধদের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁদের এই পরাজয়ের গ্লানি আমাদের সকলকে সমভাবে বহন করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে মুসলমান ভারত আক্রমণ করে নি, ভারত আক্রমণ করেছিল পাঠান ও মোগল জাতি। এই আক্রমণের সহিত কোনও ধর্ম্মকে যুক্ত করা অতীব অন্যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আক্রমণকারী মোগল পাঠানদের যা কিছু অপরাধ তা দেশীয় মুসলমানদের স্কন্ধে চাপানো হয়। দেশীয় মুসলমানগণও তাদের আক্রমণকারীদের যা কিছু দোষ তা মিথ্যা দ্বিজাতীত্ব-বোধের কারণে নিজ স্কন্ধে বহন করে আনন্দ পান। হিন্দু মুসলমানদের যা কিছু বিরোধ তা এইখানে। একথা আজ স্বীকার্য্য যে এদেশের মুসলমানদের শতকরা ৯৯ জনের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন হিন্দু। নানা কারণে তাঁরা মোসলেম ধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন কিংবা তা তাঁরা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্ত্তমান হিন্দুদের পূর্ব্ব-পুরুষরা নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করলেও তাদের ঐ ধর্ম্মান্তরিত ভ্রাতাদের ধর্ম্ম রক্ষা করতে পারেন নি। এজন্য বরং হিন্দুদেরই লজ্জা অনুভব করা উচিত। যাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিদেশীরা বিনষ্ট করতে পেরেছে তাদেরও লজ্জা কম নয়। তবে এদের মধ্যে যাঁরা এই মোস্‌লেম ধর্ম্ম ইচ্ছা করে গ্রহণ করেছে তাদের কোনও দোষ দেওয়া চলে না। প্রকৃতপক্ষে এই ধর্ম্ম দ্বারা এদেশের কোন ক্ষতি হয় নি।]

পূর্ব্বে বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাত্র ঢাকা এবং কলিকাতাতে সীমাবদ্ধ ছিল। পল্লী অঞ্চলে বা ছোট ছোট শহরে ইহা দৃষ্ট হয় নি। এই দাঙ্গা নবাগত দেশবাসী হিন্দু মুসলমানদের মধ্যেই [তাদের পূর্ব্বাপর ঐতিহ্য-বোধের কারণে] ঘটেছে। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান এ দাঙ্গায় কখনও অংশ গ্রহণ করে নি। পোষাক, পরিচ্ছদ, চেহারা ও ভাষা হ'তে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানকে চেনা যায় না। এইজন্য এইরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বাঙ্গালী হিন্দু এবং বাঙ্গালী মুসলমানকে চিনতে না পেরে দাঙ্গাকারিগণ এদের সমভাবে নিগৃহীতও করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সাম্প্রদায়িক বিষ পরে স্বার্থান্বেষীদের প্রচারের ফলে বাংলার পল্লী অঞ্চলেও শিকড় গাড়ে।

কেহ কেহ বলেন যে ইংরাজগণ এই সাম্প্রদায়িকতার জন্য দায়ী। ভেদ নীতির দ্বারা শাসন কার্য্য সমাধা করার জন্য তারা এই বিভেদের সৃষ্টি করেন। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও দ্বেষ আনয়ন করার জন্য এরা বারেক হিন্দুদের এবং বারেক মুসলমানদের বহু সুবিধা দিয়েছেন। এঁরা কি চাকূরী ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্র বিধিতে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থাও করেছিলেন, যাতে ক'রে তারা ভুলেও না মনে করে যে তারা এক জাতীয় লোক। এইভাবে তারা তথাকথিত বর্ণ ও তপশীলী হিন্দুদের মধ্যেও কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের একবারও মনে হয় নি যে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে যতগুলি শ্রেণী আছে তার চেয়েও অধিক শ্রেণী আছে তপশীলী হিন্দুদের মধ্যে এবং তপশীলী হিন্দুদেরও এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর খাওয়া-দাওয়া ও বিবাহ চলে না। আরও সময় পেলে তারা হয়তো চাকুরী বণ্টন দ্বারা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও কায়স্থদের মধ্যেও বিভেদ আনতেন। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে হিন্দুমাত্রই একই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এইজন্য তাদের এই অপচেষ্টাও ফলবতী

হয় না। কিন্তু কৃষ্টিগত অসমতা ও দ্বিজাতিত্ব-বোধের কারণে তারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলে থাকেন যে কেবলমাত্র এজন্য ইংরাজদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। এঁদের মতে মেটিরিয়াল বা বস্তু বর্ত্তমান ছিল। ইংরাজরা এতে রূপ দিয়েছেন মাত্র। এই দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণ ঐতিহাসিক। বাল্যকাল হতে হিন্দুরা পাঠ করেছে তাদের এই পুণ্য দেশ একদা ছিল স্বাধীন ও উন্নত। কুক্ষণে মুসলমানরা এসে তাদের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও বিশাল দেবমন্দির সমূহ বিনষ্ট করেছে। তাদের জাতির একাংশের ধর্ম্ম তারা বলপূর্ব্বক কেড়ে নিয়েছে এবং বহুস্থলে ওরা তাদের কুলনারীদেরও বলপূর্ব্বক অপহরণ করেছে। সৌভাগ্যক্রমে হিন্দুদের পুনরুত্থান দ্বারা মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস না হলে তাদেরও হয়তো পারস্য ও আফগান জাতির ন্যায় সকলকেই মুসলমান হতে হতো। হিন্দু নরনারী তীর্থাদি ভ্রমণের সময় নিজ চক্ষে দেখে এসেছে এই সকল ভগ্ন মন্দির এবং তৎসহ বিজাতীয়দের দ্বারা কর্ত্তিতনাসা দেবদেবীর মূর্ত্তি সমূহ। পূর্ব্বপুরুষদের এই লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করে স্বভাবতঃই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটী বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি এই দিন বিশ্বনাথের মন্দির দর্শন করছিলাম। বিশ্বনাথের ক্ষুদ্রায়তন মন্দিরটী ক্ষুদ্রতার জন্য আমার ভালো লাগে নি। একজন বুঝিয়ে দিলেন যে প্রাচীন মন্দিরটী ভেঙে পাশের ঐ মসজিদটী নির্ম্মিত হয়েছে। পরে মোগল বাদশা হিন্দুদের আবেদনে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করতে আদেশ দেন, কিন্তু ঐ মন্দিরের চূড়াটী মসজিদের মিনারের নীচে থাকবে, এই সর্ত্তে। এর পর আমি ঐ মসজিদটী পরিদর্শন করি। মসজিদের প্রাচীর গাত্রে এখনও পর্য্যন্ত বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত দেখলাম। এই দেখে আমার মন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছিল। হিন্দুদের

শ্রেষ্ঠ তীর্থ যারা ধ্বংস করেছে, তাদের উপর আমি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠি। আমার মনের এই প্রতিক্রিয়া বাক্য দ্বারাও প্রকাশ করেছি। এই সময় এক ভ্রাম্যমান হিন্দু সাধুও ঐস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হেসে ফেলে বললেন, 'কেন দুঃখ করছেন। বাদশা মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়েছেন, নাচঘর তো গড়েন নি। একটী দেবালয় ভেঙ্গে অপর আর এক দেবালয় গড়েছেন। আমাদের উভয়ের ঈশ্বর তো একই।"

বহু হিন্দু বালক ইতিহাসের মোস্‌লেম অধ্যায় খুসী হয়ে পড়তে পারে নি, কিন্তু রাজপুত, মারাঠা, শিখ ও জাঠ জাতির অভ্যুত্থান সমাদরে পাঠ করেছে। কেহ কেহ বলেন যে মিসনারীরা যে সকল ইতিহাস রচনা করেছে তাতে মুসলমানদের অত্যাচারের কথা লিখেছেন, তাতে তাঁরা হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের ভালো ব্যবহারের কথা লিখেন নি। বাদশা ঔরংজেবও যে মন্দির নির্ম্মানের জন্য জমি দান বা বহু হিন্দু কুলনারীকে রক্ষা করেছিলেন, এই কথা তারা কোথাও লিখেন নি। বাল্যকাল হ'তে হিন্দু বালকরা পড়েছে যে মোস্‌লেম নবাবরা না'কি গর্ভবতীর পেট চীরে ছেলে বার করেছে। অমুক হিন্দু সামন্ত বা রাজার রাণীকে তারা বল-পূর্ব্বক অপহরণ করে এনেছে। দেবতার ও নারীর লাঞ্ছনা মানুষ মাত্রকেই ব্যথা দেয়। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পূর্ণ হওয়া কারো পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে মুসলমান বালককে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে তারা মোস্‌লেম বিজেতাদের বংশধর। বাহুবলে এদেশ জয় করে বহু হিন্দুকে তারা ধর্ম্মান্তরিত করেছে। মোস্‌লেম ধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই পৌত্তলিকগুলোকে নিঃশেষ করলে বেহস্তের পথ সুগম হবে, ইত্যাদি। পবিত্র কোরাণের বহু ভুল ব্যাখ্যা তাদের মুখস্থ করানো হয়েছে। তাদের ভুলেও বোঝানো হয় নি যে বর্ত্তমান হিন্দু ও মোস্‌লেমের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দুই। বহু প্রদেশ আছে যেখানে মোস্‌লেমের

সংখ্যা শতকরা একজনও নয়। অথচ ঐ সকল প্রদেশ মোস্‌লেম নবাবরা শাসন করেছেন। এই সংখ্যার অধিকাংশ মুসলমানই আবার খাঁটী আরবী বা পারসী নয়। এই থেকে তাদের বুঝা উচিত যে বহিরাগত মুসলমানরা সংখ্যায় নগণ্য ছিল এবং তাদের অধিক লোকই ছিল ভাড়া করা বা 'মারসিনারী' সৈন্য। এইজন্য হিন্দু মুসলমান সহজে তাদের পরবর্ত্তীকালে বিতাড়িত করতে পেরেছে। তাদের সংখ্যা আমাদের বর্ত্তমান শাসক ইংরাজদের ন্যায় নগণ্য ছিল। এবং তারা ইংরাজদের ন্যায় এই দেশ হিন্দু ও দেশীয় মুসলমানদের সাহায্যেই শাসন করতো।

ইংরাজ শাসনে বহু স্কুল, পাঠশালা, মক্তব ও মাদ্রাসায় হিন্দু ও মুসলমানগণ পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা পেয়েছে। এবং তাদের অধীত পুস্তকগুলিও বিভিন্নরূপে লেখা হতো। এইজন্য তাদের অবচেতন মন সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য কিছুটা প্রস্তুত ছিল। ইংরাজরা এই বোধের উন্মেষ ঘটিয়ে তাতে ইন্ধন দিয়েছেন, এ কথা স্বীকার্য্য। *

সাম্প্রদায়িকতা একটী রোগ বিশেষ। উহাকে মানসিক রোগ বলা চলে। এই অবস্থায় সে অন্তরে জলতে থাকে এবং একটু মাত্র সে শান্তি পায় না। ভয় ও ঘৃণার সংমিশ্রনে এর উৎপত্তি হয়েছে। এই ভয় ও ঘৃণা রোগ-প্রসূত বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তার সৃষ্টি হয়েছে। এই মানসিক রোগ উগ্র হলে উহা উন্মাদনার সৃষ্টি করে। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টী বুঝা যাবে।

"অমুক পাঠান ঘুম থেকে জেগে উঠেই একটা বিকট চিৎকার করে উঠল। এর পর সে আর অপেক্ষা না করে তরোয়াল হাতে বার হয়ে

---

* ভুল ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যে অন্যায় তা স্বীকার্য্য। কিন্তু ইতিহাসকে বিকৃত করা আরও অন্যায়।

পড়লো। বাইরে এসেই সে প্রথম যে হিন্দুকে দেখলো তাকেই এক আঘাতে শেষ করে দিলো। হিন্দু মুসলমান জনতা অতি কষ্টে তাকে নিরস্ত্র করে গ্রেপ্তার করে। কিছু দিন যাবৎ সে উৎকটভাবে হিন্দু-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল। এই অকারণ বিদ্বেষ শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে যায়। এই সময় হিন্দু নামও সে শুনতে পারতো না। অথচ সমস্ত হিন্দুকে একদিনে নিঃশেষ করাও সম্ভব নয়। মুসলমানদেরও তার এই বিদ্বেষের কথা সে বুঝাতে পারে নি। কেউ তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে রাজি নয়। পুনঃ পুনঃ ঐ একটী বিষয়ে চিন্তা করে সে বিকৃতমনা হয়ে পড়ে। কিছুতে সে তার ঐ ইচ্ছা মন হতে বিদূরিত করতে পারে নি। অন্ততঃ একজন হিন্দুকেও নিহত না করে সে শান্তি পাচ্ছিল না। এই কয়দিন সে স্বাভাবিক ভাবে আহার করতে বা নিদ্রা যেতেও পারে নি।"

সাম্প্রদায়িকতা যে এক প্রকার মানসিক রোগ তা বুঝাবার জন্য অপর একটী বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার ভাই অমুক হিন্দু সভার একজন বিশেষ সভ্য ছিলেন। পরে উদরস্ফীতি রোগে আক্রান্ত হয়ে সে হাসপাতালে নীত হয়। বিকারের ঘোরে সে মুহুর্মুহুঃ চিৎকার করে উঠছিল, 'ওগো কে আছো! আমি দশ জন মুসলমান ভক্ষণ করেছি। অমুকপ্রসাদ বাবুকে এক্ষুণি খবর দাও। অন্ততঃ এদের পাঁচ জনকে তিনি যেন বার করে দিয়ে যান।"

বাক্-প্রয়োগ ও প্রচার দ্বারা যে কোনও ব্যক্তিকে সাম্প্রদায়িক বা অসাম্প্রদায়িক করে তোলা যায়। এ সম্বন্ধে আশৈশব বাক্-প্রয়োগের তো তুলনাই হয় না। এইজন্য সাম্প্রদায়িক সভা সমূহে বক্তৃতা শুনে মানুষ সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক সভা সমূহে বক্তৃতা শুনে মানুষ অসাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে।

কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, বাংলা দেশে অর্দ্ধস্বাধীন গভর্ণমেণ্ট যখন প্রথম স্থাপিত হয় সেই সময় যদি বাংলার কংগ্রেসীদল মাননীয় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করে মোস্‌লেম লীগকে অপোজিসনের কোঠায় ঠেলে দিতেন তা'হলে তাঁরা ধীরে ধীরে ফজলুল হক প্রবর্ত্তিত প্রজাপার্টির মোস্‌লেমদের সহযোগীতায় বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন করে তুলতে পারতেন। কংগ্রেসপার্টির এই ভুলের সুযোগ গ্রহণ করে লীগপার্টি প্রজাপার্টির সহিত সংযুক্ত হয়ে তাকেও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন করে তুলতে পেরেছিল। ভারতের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস বাংলা, পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর পৃথক অবস্থার কথা চিন্তা করে কেন ভিন্ন ব্যবস্থা করেন নি তা বলা দুষ্কর। আদ্যোপান্ত বিবেচনা করলে মনে হবে তারা নীতি ও ধর্ম্মের কথা ভেবেছিলেন কিন্তু মনোবিজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথা ভাবেন নি। এঁদের এই ভুল অচিরেই কুফল প্রসব করতে সুরু করে। কংগ্রেসকে অসাম্প্রদায়িক রাখবার জন্যে উহার মধ্যে মোস্‌লেম উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ফজলুল হকের প্রজাপার্টিকে অসাম্প্রদায়িক রাখবার জন্যে ঐ দলে উপযুক্ত সংখ্যক (Indispensible) হিন্দু ছিল না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ আখেরে বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভক্ত হয়েছে। এই দিক হ'তে আমরা ব্রিটিশ সরকারের ভেদনীতির প্রতিবন্ধক হইনি বরং তাতে আমরা ইন্ধন জুগিয়েছি।

মাত্র কয়েক বৎসরের চেষ্টায় লীগ শাসন বাংলাদেশকে মনের দিক হতে বিভক্ত করে তুলেছিল। মোস্‌লেমদের অর্থনৈতিক অনুন্নত অবস্থা এই ব্যাপারে তাদের সহায়ক হয়। এই একই কারণে কোনও কোনও নেতা ব্রিটিশ সরকারের নির্দ্দেশে ও সহযোগিতায় হিন্দুদের মধ্যেও তপশীলী সম্প্রদায়ের স্থষ্টি করতে পেরেছিলেন। আরও কিছু সময় পেলে

হয়তো তাঁরা বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও বিভাগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হতেন। মোমিন এবং সিয়া সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণ বা পৃথক নির্ব্বাচনের প্রচলন করলে মোস্‌লেম সমাজও দ্বিধা বা ত্রিধা বিভক্ত হতো। এই উপায়ে বর্ণহিন্দুর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক প্রভৃতি সমাজের মধ্যেও বিভাগ আনা অসম্ভব ছিল না।

ব্রিটিশ শাসন ভারতের যে কোনও উপকার করে নি তা নয়, কিন্তু তাদের এই এক দোষ—ভেদনীতির জন্য ভারতীয়েরা আজও তাদের শ্রদ্ধা করতে পারছে না। এই ভেদনীতির কারণে অচিরে শাসন ব্যবস্থা কলুষিত হয়ে উঠে। এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, প্রতিটী অফিস এবং কাছারী হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একজন হিন্দু অফিসার তাঁর অধস্তন মোস্‌লেম অফিসারকে এবং একজন মোস্‌লেম অফিসার তাঁর অধস্তন হিন্দু অফিসারকে শাসনতান্ত্রিক কারণে ভর্ৎসনা পর্য্যন্ত করলেও তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আরোপ করা হয়েছে। পরিশেষে মোস্‌লেম এবং হিন্দু অফিসারগণ একই গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন। এমন কি একদল যেখানে খোস্ মেজাজে গালগল্প করতো সেখানে অপর দলের কেউ ইচ্ছা করেই যেতো না। কারণ তার ধারণা হতো যে, হয়তো তার স্ব-সম্প্রদায়কে ঐ স্থানে গাল দেওয়া হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির শেষ ফল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণা। এই সংগ্রাম কলিকাতার ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের নামান্তর মাত্র। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ব্রিটিশ সরকার কতটা দায়ী ছিলেন তা ঐতিহাসিকরা বিচার করবেন। কেহ কেহ মনে করেন যে কলিকাতাকে এই দাঙ্গার জন্য বিশেষ করে বেছে নেওয়া হয়েছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মহড়া

ভারতের সর্ব্বত্রই হয়েছিল। কিন্তু কুত্রাপি দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধতে দেওয়া হয় নি। এমন কি কলিকাতার চতুর্দ্দিকের শিল্পাঞ্চলেও ইহা প্রসার লাভ করে নি। এই দাঙ্গা কেবলমাত্র কলিকাতা মহানগরীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর কারণ সম্বন্ধে আমার জনৈক বন্ধু নিম্নোক্তরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন।

"এই দাঙ্গা যে পূর্ব্বকল্পিত ছিল এবং উহা যে কুচক্রীদের চক্রান্তে সংঘটিত হয়েছে তা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। কুচক্রীদের প্রকৃত ইচ্ছা ছিল সারা ভারত ব্যাপী হিন্দু-মোস্‌লেমে দাঙ্গা বাধানো। কিন্তু তার আগে "ফিলার" দ্বারা তাঁরা উহার ফলাফল সম্বন্ধে অবগত হতে চেয়েছিলেন। এইরূপ পরীক্ষার জন্য কলিকাতাকে বেছে নেওয়ার কারণ ছিল এই যে কলিকাতা ভারতের এক ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। এই শহরে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ এবং মোস্‌লেমের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ। সারা ভারতবর্ষের হিন্দু-মোসলেমের সংখ্যার অনুপাত বা হারও ঐরূপ। কলিকাতা মহানগরীতে ভারতের সমুদয় প্রদেশের হিন্দু-মোস্‌লেম বহু সংখ্যায় বাস করে। এই শহরের দাঙ্গা বাধাবার কারণ নিম্নোক্ত কয়টী সত্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

(১) অতর্কিতে আক্রান্ত হলে কত অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় সংখ্যাগুরু হিন্দুগণ, প্রতিশোধার্থে বা প্রতিরোধার্থে প্রস্তুত হতে পারে?

(২) বিভিন্ন প্রদেশীয় ও ভাষাভাষী হিন্দুগণ, বর্ণ এবং তপশীলী হিন্দুগণ একত্রে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। না, পূর্ব্বকালীন হিন্দুদের ন্যায় এক প্রদেশের হিন্দুদের বিপদে অপর প্রদেশীয় হিন্দুরা চুপ করে বসে থাকবে। বর্ণহিন্দু এবং তপশীলী হিন্দুরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি কিরূপ আচরণ করবে?

(৩) খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায় এই দাঙ্গায় কোনও পক্ষ অবলম্বন করবে কি'না? ইত্যাদি—

(৪) ধন সম্পত্তি এবং জীবন-নাশ কোন সম্প্রদায়ের কিরূপ হবে? অর্থাৎ এই মহা আহবে কোন সম্প্রদায় জিতবে, কোন সম্প্রদায়ই বা হেরে যাবে?

(৫) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সরকারী কর্ম্মচারীরা এই আহবে কিরূপ আচরণ করবে?"

এই দাঙ্গার ফলাফল সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছেন। এইজন্য এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি না। বন্ধুর মতে ইহা মোস্‌লেমদের অনুকূল না হওয়ায় সারা ভারত ব্যাপী দাঙ্গাহাঙ্গামা পরিকল্পিত হয় নি,—কেবলমাত্র পাকিস্থানকেই মেনে নেওয়া হয়েছিল। বন্ধুর মতে পরবর্ত্তী পাঞ্জাবের দাঙ্গাহাঙ্গামা পূর্ব্ব পরিকল্পিত ছিল না। এক দল বা জাতি অপর জাতি বা দলের অধীনে বাস করার অনিচ্ছার জন্য এই দাঙ্গাহাঙ্গামা পাঞ্জাবের উভয় অংশে সংঘটিত হয়েছে।

ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা বা যুদ্ধের মধ্যে যেরূপ নিষ্ঠুরতা দেখা যায় সেরূপ নিষ্ঠুরতা এক জাতির সহিত অপর জাতির যুদ্ধে দেখা যায় নি। কলিকাতার এই মহা নিধন-যজ্ঞ এই মতবাদটীকে প্রমাণিত করবে। কিরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত উন্মত্ত দাঙ্গাকারিগণ কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে এই মহা-দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে তা নিম্নের বিবৃতিটী হ'তে বুঝা যাবে।

"কয়েকটী পরিবারকে নারী ও শিশুসহ বিপজ্জনক স্থান হ'তে উদ্ধার করে ফিরে আসছিলাম। এমন সময় লক্ষ্য করলাম, একটী অসহায় লোককে ম্যান-হোলের গর্ত্তের মধ্যে গলদেশ পর্য্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ঐ গলদেশ ঘেঁসে ঐ ম্যান-হোলের আবরণী বা লৌহ চাকৃতিটা (ঢাকনী) ঐ ম্যান-হোলের মুখটাতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উন্মত্ত জনতার উল্লাস ধ্বনির মধ্যে এক ব্যক্তি ঐ চাকৃতি বা ঢাকৃনার উপর দাঁড়িয়ে নাচতে সুরু করে দিলে এবং ধীরে ধীরে চাকৃতির কাণার আঘাতে ঐ ব্যক্তির গলদেশ কর্ত্তিত হতে লাগলো। পরে এও শুনেছিলাম যে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্রকেও ইতিপূর্ব্বেই ঐ ম্যান-হোলের গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর কি-ই বা হতে পারে।"—"অপর আর একদিনের ঘটনার কথা বলবো। এইদিন পথ চলতে চলতে সহসা লক্ষ্য করলাম মাত্র দশ বারো জন বালক আমার স্বসম্প্রদায়ের একজন যুবককে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে পথের উপর শুইয়ে দিচ্ছে। উপর্য্যুপরি যষ্ঠীর ঘায়ে ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে মাটীতে পড়ে গেলেন। আমারও ধারণা হয়েছিল যে ভদ্রলোক বোধহয় মারাই গেলেন। এমন সময় একজন বালক চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে ভাই আভি তক্ নড়তা হ্যায়।' নিকটেই একজন যুবক দাঁড়িয়েছিল। ছুটে এসে সে ভদ্রলোকের বুকে ধারালো ছুরিকা আমূল বসিয়ে দিলে। এইভাবে যেটুকু প্রাণ তার তখনও পর্য্যন্ত বাকি ছিল তা'ও শেষ হয়ে গেল। প্রথম প্রচেষ্টায় ভদ্রলোক হয়তো মাত্র কয়েকজন বালকের হাত হ'তে নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু বিরোধী ব্যক্তিদের পাড়ায় বাধ্য হয়ে বাস করায় তার স্নায়ুর শক্তি তিরোহিত হয়েছিল। এজন্য একটুমাত্রও তিনি বাধা দিতে পারেন নি এবং এই একই কারণে আমিও তাকে উদ্ধার করতেও সমর্থ হয় নি। উভয় সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই একথা সত্য ছিল।"

স্থান এবং কাল মাহাত্ম্য মানুষের স্নায়ুর শক্তি হরণ করে নেয়। এদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সমূহ ইহার অন্যতম প্রমাণ। স্বপল্লীতে বা স্বরাষ্ট্রে যারা সিংহবিক্রমে পদক্ষেপ করে থাকে, তাদেরই অন্যত্র আমরা মেষের ন্যায় আচরণ করতে দেখেছি। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বক্তব্য বিষয়টী বুঝা যাবে।

"আমি এইদিন কর্ত্তব্যরত অবস্থায় নয়া সড়ক ও কলাবাগানের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সহসা আমি লক্ষ্য করলাম আমার পরিচিত যুবক চিত্রকর অমুক গাঙ্গুলী কলাবাগান হতে বার হয়ে আসছেন। তাঁর পরণে ঝলঝলে প্যাণ্ট ও আলখাল্লা থাকায় এই বাবরী চুলওয়ালা আর্টিষ্টকে ঐখানকার লোকজন বিরোধী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরূপে চিনেও চিনে উঠতে পারে নি। তারা ভীড় করে অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। এদের কেউ বিশ্বাস করতেও পারে নি যে এই সময় এই স্থান দিয়ে এই রকম কোনও লোক যেতে পারে। যুবক আর্টিষ্ট্টী বাঙ্গলার বাহিরে মানুষ হয়েছিলেন, সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় এসেছেন। এই কলাবাগান সম্বন্ধে তিনি বিভীষিকাময় বহু গল্প ইতিমধ্যেই শুনেছেন, কিন্তু ঐ স্থানটীর প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে তিনি একটু মাত্রও অবগত ছিলেন না। আমি অবাক হ'য়ে যুবকটীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ্যাঁ, একি ? কোথা থেকে তুমি আসছো ?' উত্তরে যুবকটী বললে, 'কলেজ ষ্ট্রীটে গিয়েছিলাম, একটু সর্টকাট করে চিৎপুর রোডে যাচ্ছি।' আমি ভৎর্সনা করে তাকে বললাম, 'কিন্তু তুমি জান ? কোন্ রাস্তা দিয়ে এসেছো। এখনো বেঁচে আছো, এই যথেষ্ট। তুমি এসেছো কলাবাগান বস্তীর মধ্য দিয়ে। "এ্যাঁ! যুবক আর্টিষ্ট অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে উঠলো, 'এই সেই কলাবাগান!' এবং তারপর তিনি সহসা জ্ঞান-হারা হয়ে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন।"

পূর্ব্বতন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সমূহ সাধারণতঃ রাজপথেই সংঘটিত হয়েছে। এমন কি প্রধান রাজপথ সমূহ অতিক্রম করে উহা কখনও গলির পথে অগ্রসর হয় নি। কিন্তু কলিকাতার ইতিহাসে এইবার সর্ব্বপ্রথম মানুষ অন্তঃপুরের পবিত্রতাও বিনষ্ট করতে সুরু করে দিয়েছিল। গৃহ আক্রমণ, অগ্নিপ্রদান, হত্যা এবং লুণ্ঠন ছিল এই দাঙ্গার বৈশিষ্ট্য। যে

কোনও কারণেই হোক সম্প্রদায় বিশেষের ধারণা হয়েছিল যে এই দাঙ্গার পিছনে সরকারী সমর্থন আছে এবং এই কারণে এই সব অপরাধ করার জন্য তাদের কোনওরূপ শাস্তি পেতে হবে না। কিন্তু যখন তারা বুঝেছিল যে তাদের এই ধারণা একান্তরূপে ভুল, তখন এই মহা দাঙ্গা সহসা মধ্য পথে থেমে গিয়েছিল। এই দাঙ্গার প্রতিরোধ ভদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বারা স্থরু করা হয়েছিল। এই ভদ্রলোকেরা বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার্থে বা প্রতিরোধার্থে এই দাঙ্গায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু অপরপক্ষের দাঙ্গা শেষ পর্য্যন্ত গুণ্ডাগণ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। গুণ্ডা ব্যক্তি মাত্রেই অন্তরে অন্তরে ভীরু হয়ে থাকে। দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারে সদা তৎপর হ'লেও প্রবলের নিকট এরা সর্ব্বদাই মাথা নীচু করেছে। এই কারণে যারা আত্মরক্ষার্থে এদের নিকট করজোড় করেছে, তাদেরই সপরিবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু যারা সাহস করে নীচে নেমে বা এগিয়ে এসে তাদের প্রতিরোধ করেছে, তাদের কাউকেই আবালবৃদ্ধ-বণিতা নির্ব্বিশেষে নির্ম্মূল হতে হয় নি। বহুক্ষেত্রে মাত্র দশ বারো জন যুবক সহস্র সহস্র গুণ্ডাদের মাত্র ইষ্টক বর্ষণ দ্বারাই বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল।

পল্লীতে পল্লীতে অসহায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের এই দাঙ্গায় শৃগাল কুকুরের মতই নিহত করা হয়েছে। বহুস্থলে নির্দ্দোষ নারী এবং শিশুদেরও প্রাণ এবং সম্মান আততায়ীদের হাত হ'তে রক্ষা পায় নি। এক বিরাট গণ-উন্মাদনা সমগ্র জাতিকে যেন পেয়ে বসেছিল। বহুদিনের পুঞ্জীভূত অবিশ্বাস এবং দ্বেষ আবদ্ধ অবস্থা থেকে বুঝিবা আজ সর্ব্বপ্রথম ছাড়া পেলো। অবিশ্বাস এবং দ্বেষের মূল কারণ দূরীভূত না করে উহা জোড়াতালি দিয়ে এযাবৎকাল কৃত্রিম উপায়ে চেপে রাখার কারণেই সাম্প্রদায়িক আগ্নেয়গিরি হতে এই সভ্যতা বিধ্বংসী দাঙ্গায়

অগ্নি উদ্গার সম্ভব হয়েছিল। অনেকে একথাও বলেন যে বহুদিন ধরে স্বার্থান্বেষী নেতারা পুনঃ পুনঃ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা জনগণের স্থূল বৃত্তি সমূহকে শনৈঃশনৈঃ জাগ্রত করে তাদের ভুল পথে চালিয়ে দেওয়ার কারণেই দেশব্যাপী এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এজন্য কেবলমাত্র তৎকালীন নেতাদের দোষ দিলে অন্যায় হবে। আমার মতে এই সময়কার প্রচলিত সাম্প্রদায়িক শিক্ষা প্রণালীই এইজন্যে দায়ী। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে সভা-সমিতি, বিদ্যালয়, ক্লাব ও সাহিত্যের মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের শিশুরা জঘন্য সাম্প্রদায়িক শিক্ষাই পেয়ে এসেছিল। এই সকল ব্যাপারে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষিত মানুষদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এই কারণে জাতি ও সম্প্রদায়ের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক বিষ অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল।

প্রদেশে প্রদেশে এই বিষ মজুতই ছিল—সাম্প্রদায়িক নেতারা মাত্র এই বিষকে প্রয়োজন মত কাজে লাগিয়েছিলেন। পরিশেষে ইহা শাসন বিভাগকে পর্য্যন্ত কলুষিত করে দিতে পেরেছিল। বিষয়টি নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি যখন দেখতে পেলাম যে অমুক সম্প্রদায়ের ঐ কর্ম্মচারী সান্ধ্য আইন ভঙ্গের অজুহাতে কেবলমাত্র আমার স্ব-সম্প্রদায়ের লোকদেরই ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এলেন, তখন আমিও তাড়াতাড়ি আমার স্বসম্প্রদায়ের লোকজনদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঐ কর্ম্মচারিটীর সম্প্রদায়ভুক্ত ৭০ জন লোককে গ্রেপ্তার করে থানায় এনে কেস লিখিয়ে দিয়েছিলাম।" তবে গুলিচালনা সম্পর্কে এইরূপ রেষারেষির কোনও সংবাদ তখনও পর্য্যন্ত আমি শুনি নি। এই সময় এইরূপ কোনও ঘটনা ঘটেছিল কিনা তা জানি না।

এই সময় হিন্দু অফিসারদের কেউ কেউ মুসলমান মৃতদেহকে হিন্দু বলে এবং মুসলমান অফিসারদের কেউ কেউ হিন্দু মৃতদেহকে মুসলমান বলে সৎকার করিয়ে দিয়েছিলেন—এঁদের উদ্দেশ্য ছিল স্ব স্ব সম্প্রদায়ের লোকেরাই যে এই দাঙ্গায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা প্রমাণ করা। তবে এই ধরণের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির সংখ্যা শান্তিরক্ষী বাহিনীতে খুব কমই ছিল। এই সম্বন্ধে অপর আর একটী বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার স্ব-সম্প্রদায়ের লোকেরা অমুক স্থানে একটী বস্তি নানা কারণে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এই অন্যায় কার্য্য যে কে বা কারা করেছে তা জানা এই সময় সম্ভব ছিল না। কারণ হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মোস্লেম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মোস্লেম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং কোনও ব্যক্তিই এই সময় সাক্ষ্য দিতে স্বভাবতঃই নারাজ ছিল। এইজন্য এক সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে ক্ষতির গুরুত্ব বুঝে অপর সম্প্রদায় হতে বহু ব্যক্তিকে দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বিশেষে গ্রেপ্তার করে আনার রীতি ছিল। এইরূপ ধরপাকড়ের মূল উদ্দেশ্য দোষী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ঐ অপকার্য্য হ'তে বিরত রাখা। এইরূপ গ্রেপ্তারকে বলা হ'তো শাসনতান্ত্রিক গ্রেপ্তার। এই অগ্নিদহনের জন্য এইদিন আমার নিজ সম্প্রদায়ই মূখ্যতঃ দায়ী ছিল। এই কারণে আমি স্ব-সম্প্রদায়ের লোকজনদের ডাক দিয়ে বললাম, 'দেখ বাপু। তোমরা ভয়ানক অন্যায় করেছো। তবে কে যে তা করেছো তা যখন বুঝতে পারছি না, তখন তোমাদের এই পাড়া হ'তে আমি বিশ জন যুবককে গ্রেপ্তার করতে চাই ; শুধু চাকুরী বজায় রাখার জন্য। যাকে তাকে আমার ধরবার ইচ্ছে নেই। এখন তোমরাই এই বিশ জন লোক আমাকে বেছে দাও।' বলাবাহুল্য জনসাধারণ নিজেদের মধ্য হ'তে বেছে বেছে

জন বিশেক লোককে আমার নিকট এনে দিয়েছিল। কিন্তু এদের থানায় আনার পর একজন নেতা এসে আমাকে জানালেন, এই ছেলেটীর মা বড়ো কান্নাকাটী করছে, ওকে বদলে আর একটী ছেলেকে দিয়ে যাবো স্যার। বলাবাহুল্য ভদ্রলোকের এই প্রস্তাবে আমি সম্মতি প্রদান করে ধরপাকাড়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যাটী অক্ষুণ্ণ রেখেছিলাম।"

কলিকাতার বিগত দিনের এই সাম্প্রদায়িক মহা-দাঙ্গাকে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা 'ক্যালকাটা কিলিঙ' (কলিকাতার নিধন-যজ্ঞ) নামে অভিহিত করেছিলেন। কতকাংশে ইহা যে সর্ব্বোতভাবে সত্য তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই মহা-দাঙ্গা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে কলিকাতা মহানগরীকে মূলতঃ তিনটী ভাগে বিভক্ত করতে হবে। যথা, (১) 'মিশ্র' অর্থাৎ শহরে যে সকল অংশে হিন্দু মোস্‌লেম প্রায় সম-সংখ্যায় বাস করে, (২) 'হিন্দু' অর্থাৎ যেখানে হিন্দুগণ অধিক সংখ্যায় বাস করে, (৩) 'মোস্‌লেম' অর্থাৎ যেখানে মোস্‌লেমগণ অধিক সংখ্যায় বাস করে।

মহা-নিধন বা গ্রেট্ কিলিঙ বলতে যা বুঝায় তা শহরের এই হিন্দু বা মোস্‌লেম অংশেই সম্ভব হয়েছিল। কলিকাতার মিশ্র অংশ সমূহে সংঘটিত ঘটনা সমূহকে প্রকৃত দাঙ্গা বলা গেলেও উহাকে 'নিধন' বলা যেতে পারে না।

এই মহা-দাঙ্গা কলিকাতা মহানগরীর পল্লীতে পল্লীতে ব্যাপক ভাবে সংঘটিত হয়েছিল ; এইজন্য অপরাধীদের প্রত্যেককে ধৃতিকরণ এবং শাস্তি দেওয়াও সম্ভব হয় না। এই সময় মানুষের ধারণা হয় যে তারা হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ প্রভৃতি মহা অপরাধ সকল নির্ভয়ে সমাধা করতে পারে। এই সময় হিন্দুগণ হিন্দু-অপরাধীদের বিরুদ্ধে এবং মোস্‌লেমগণ মোস্‌লেম-অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী হয় নি। স্ব-সম্প্রদায়ের

ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এরা নারাজ থাকলেও বিরোধী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এরা মিথ্যা কথা অনর্গল ভাবে বলে যেতে কুণ্ঠা বোধ করে নি। এই কারণে সহস্র ব্যক্তির সম্মুখে হত্যাকাণ্ড সমাধিত হলেও হত্যাকারী সাধারণতঃ ধৃতিকৃত হয় নি। এবং ধৃতিকৃত হলেও আদালতের বিচারে সে মুক্তি পেয়েছে। কারণ বিরোধী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সাক্ষ্য সাম্প্রদায়িক কারণে বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে কিরূপভাবে মিথ্যাপ্রবণ করে তুলে তা নিম্নের বিবৃতি হ'তে বুঝা যাবে।

"বিশেষ পরিকল্পনার সহিত এই সময় ঐ বিশেষ সম্প্রদায়ের কোনও কোনও নেতা কলিকাতার মিশ্র অংশ সমূহ হতে আমাদের উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট ছিল। তারা দল বেঁধে শান্তি স্থাপনের অছিলায় বিরোধী সম্প্রদায়ের বাড়ীগুলির চতুস্পার্শ্বে ঘুরাফিরা করতো এবং স্ব-সম্প্রদায়ের পুলিশসহ ট্রাক দেখামাত্র তাদের নিকট এসে ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-মুখর হয়ে উঠতো। সম্মুখে বিরোধী পক্ষীয় যাকে দেখত তাকে লক্ষ্য করে এরা বলে উঠতো—ঐ মোটাবাবু আউর ঐ চশমাওয়ালাবাবু। এহি আদমী লোক ইটা পটকা ফেকৃতা থা, ইত্যাদি। কোনও একটী ঘটনা ঘটলে তার পরমুহূর্ত্তে অকুস্থলে এদের আবির্ভাব হয়েছে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বিরোধী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সনাক্ত করে তাদের হাজাত পাঠানো।"

এই মিথ্যা-ভাষণ স্পৃহা পরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যায়। এই দিক দিয়ে বিচার করতে হলে এই দাঙ্গা জাতিকে নৈতিক অবনতির পথে দ্রুততর নামিয়ে আনছিল। আত্মরক্ষা এমন এক স্পৃহা, যার জন্যে মানুষ যে কোনও পথে নামতে পারে। এইজন্য ভাল লোক মন্দ হলে তাকে দোষ দেওয়াও যায় নি। নিকৃষ্টতম অপরাধ বিরোধী—

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃত হ'লে স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা বরং তাতে বাহবা প্রদান করেছে। এই মিথ্যা-ভাষণ আমাদের কতদূর অধঃপাতে নিয়ে গিয়েছিল তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"অমুক মহাপুরুষ অমুক বিদগ্ধ বস্তিটী পরিদর্শন করতে এলে আমরা চালাকীর সহিত তাঁকে বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট হই। আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নামাঙ্কিত নেম্‌প্লেট সমূহ অর্দ্ধদগ্ধ করে বিরোধী সম্প্রদায়ের অর্দ্ধদগ্ধ বাড়ীগুলির দরজায় লাগিয়ে দিই। বিরোধী সম্প্রদায়ের অমুক নেতা মহাপুরুষকে অকুস্থলে নিয়ে এসে ইংরাজীতে লেখা অর্দ্ধদগ্ধ নেম্‌প্লেটগুলি মোস্‌লেমদের বাড়ীগুলির দেওয়ালে আঁটা রয়েছে দেখে হতভম্ব হয়ে যান। তাঁর ধারণা হয়েছিল হয়তো বা তিনি ভুল পথে এসেছেন। এইগুলি দেখে মহাপুরুষ কি ভেবেছিলেন তা জানি না।"

এই মিথ্যা-ভাষণ সম্বন্ধে অপর আর একটী বিবৃতি নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

"আমাদের অমুক উর্দ্ধতন অফিসার যে দারুণ সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন তা আমাদের জানা ছিল। শান্ত্রীদলসহ তাঁহার সহিত টহল দিতে দিতে পরিলক্ষ্য করলাম একদল সশস্ত্র লোক হাল্লা করতে করতে এগিয়ে আসছে। ঐ লোকগুলি যে ঐ উর্দ্ধতন অফিসারের সম্প্রদায়ভুক্ত লোক তা স্থানীয় অফিসার বিধায় আমার জানা ছিল। আমি এই সুযোগে ঐ উর্দ্ধতন অফিসারটীকে বুঝিয়ে দিলাম যে ঐ লোকগুলো তাঁর স্ব-সম্প্রদায়ের লোক নয়। উহারা তাঁর বিরোধী সম্প্রদায় অর্থাৎ আমার স্ব-সম্প্রদায়ের লোক এবং তাঁকে আমি এ-ও বুঝালাম, যে উহারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির ব্যক্তি। আমার ঐ উর্দ্ধতন অফিসার আমার কথায় বিশ্বাস করে নির্ম্মমভাবে গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছিলেন। পরে তাঁর

স্ব-সম্প্রদায়ের এতোগুলি লোককে নিহত হতে দেখে ভদ্রলোকের অনুতাপের আর সীমা ছিল না। তবে তাঁর যা করা উচিত ছিল তা'ই তিনি করেছিলেন এবং এজন্য আমাকে তাঁর কিছু বলবারও ছিল না।'

নিছক হিন্দু এবং নিছক মোস্‌লেম অংশ হ'তে দাঙ্গার প্রথম দুই দিনের মধ্যেই বিরোধী সম্প্রদায়েরা বিতাড়িত হয়েছিল, কিন্তু শহরের মিশ্র অংশ সমূহে এই দাঙ্গা বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ইহার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে মোসলেমদের দ্বিজাতিত্ব বোধ এবং হিন্দুদের পাকিস্থান স্বীকারে ও স্থান ত্যাগের অনিচ্ছা। কিন্তু যাহারা স্বাধীনতার প্রথম দিবসে ভারতীয় ইউনিয়নের শহরগুলির অবস্থা পরিলক্ষ্য করেছেন, অন্ততঃ তাদের পক্ষে এই মতবাদে বিশ্বাস করা সুকঠিন। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টী সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি একজন ভারতীয় শান্তিরক্ষী। নিয়মতান্ত্রিকতা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য। নিয়োগকর্ত্তাদের নির্দ্দেশে আমরা পিতা, পুত্র এবং ভ্রাতাদের বিরুদ্ধাচরণ করতেও কখনও কুণ্ঠা বোধ করিনি। কিন্তু যেদিন বুঝলাম এই সভ্যতা বিধ্বংসী মহা-দাঙ্গা আমাদের ধর্ম্ম আমাদের সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তুলছে, যেদিন আমরা দেখলাম কোনও রাজনৈতিক নেতাই এই মহাতাণ্ডব উপেক্ষা করে আমাদের সম্প্রদায়কে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসতে সাহসী হচ্ছে না, যে দিন আমরা উপলব্ধি করলাম যে, আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করবার জন্য একটী সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করাল হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে, যে দিন আমরা উপলব্ধি করলাম যে, আমরা ছাড়া আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীদের রক্ষা করবার অপর আর কেহ বিদ্যমান নেই, তখনই আমরা নিয়মতান্ত্রিকতার কঠোর নাগপাশ হ'তে নিজেদের গোপনে মুক্ত ক'রে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয়ে উঠি। তাই যখনই আমরা

সুবিধা পেয়েছি, তখনই আমরা ওদের ষড়যন্ত্রের বিষয় জনসাধারণের গোচরীভূত করতে কুণ্ঠা বোধ করে নি। কেহ কেহ কর্ম্মে ইস্তফা দিয়ে শহরের পত্রিকা সমূহে এই সকল গোপন কাহিনী প্রকাশিত করে জনসাধারণকে সাবধানও করে দিয়েছে। ছোট বড় সকল কর্ম্মচারী জীবন ও চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ করে স্ব-সম্প্রদায়ের লোকেদের রক্ষা করতে প্রয়াস পেয়েছে। দাঙ্গার প্রথম দিকটায় আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, অধিকন্তু নিজেরাই এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা পরিলক্ষ্য ক'রে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কয়দিনের মধ্যেই আমরা আত্মস্থ হয়ে দৃঢ়তার সহিত আমাদের সম্প্রদায়কে নিশ্চিত ধ্বংস হ'তে রক্ষা করতে পেরেছিলাম। আমাদের ঐ সময়কার প্রচেষ্টা সমূহের কাহিনী গোপন রাখায় কোনও দিনই জনসাধারণ তা অবগত হবে না। কিন্তু বহির্জগতের যে সকল মানুষ আমাদের সহিত এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা আজও এইজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে থাকেন। এ কথা যারা জানে না, তারা মানে না, কিন্তু যারা জানে তাঁরা তা মানে। স্বদেশের মুক্তিকামী যে জনসাধারণ কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী পুলিশ বাহিনীতে মোতায়েন থাকার জন্য শত্রু মনে করেছে, এই সময় তারাই আমাদের একমাত্র বন্ধু মনে করে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে গর্ব্ব অনুভব করছিল। এমন কি পল্লীতে পল্লীতে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল যুবক 'প্রতিরোধ দল' সৃষ্টি করেছিল, তারাও আমাদের নিকট নির্ভয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। আমাদের বুদ্ধিমত্তা, সাময়িক একতা এবং সাহস, পাকিস্থান-প্রার্থী বিপক্ষ পক্ষীয়দের আশ্চার্য্যান্বিত করে দিয়েছিল। আমরা এইরূপ সাহসিকতার সহিত এগিয়ে না এলে কলিকাতার ইতিহাস ভিন্ন রূপে লিখিত হতো।

পরিশেষে নিরীহ নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র গুণ্ডাদের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে আমি সাময়িক ভাবে বরখাস্ত হই এবং ইহার কয়দিন পরই আমাদের এই দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এই দিন আমি ক্ষুণ্ণ মনে বাটীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করি। যে সকল ব্যক্তিদের রক্ষা করবার প্রয়াসে আমি প্রাণপণ করে বর্ত্তমান দূরবস্থা বরণ করে নিয়েছি, তাদের কিন্তু আজ পূর্ব্ব কথা একটুমাত্রও স্মরণ নেই। যাদের নিকট পূর্ব্ব রাত্রেও আমি 'ত্রাণকর্ত্তা'রূপে বিবেচিত হয়েছি, তাদের নিকট আজ আমিও বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গিয়েছি। এই দিন তারা এই বিরোধী পক্ষীয় ব্যক্তিদেরই সহিত গলাগলি করে ত্রিবর্ণ পতাকা হস্তে এক অপূর্ব্ব শোভা-যাত্রা বার করেছে। পূর্ব্ব দিন রাত্রেও যারা কাটাকাটি হানাহানি করেছে, অন্ধকার রাত্রি শেষে বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেও যারা কলিকাতায় পাকিস্থান স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছে, তারাই ভোরের আলোকে নূতন মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তা না হ'লে তাদের মুখ হ'তে মুহুর্মুহুঃ 'হিন্দুস্থান কি জয়' ধ্বনি এমন সুন্দর ভাবে নির্গত হ'তে পারতো না। এই দিন আমি বারে বারে চিন্তা করেছিলাম 'সত্যই কি দেশীয় মোস্‌লেমরা দ্বিজাতিত্বে বিশ্বাস করে ? নিশ্চয় মনে প্রাণে তা তারা করে না। তা করলে তারা এমন করে আজ আমাদের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিতে পারত না।"

ভারতের অর্দ্ধেকের উপর দেশীয় মুসলমান আজ পাকিস্থানে তথা দ্বিজাতিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ব্বে তারা তা করতো বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করলে বুঝা যাবে যে এতদিন আমরা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে এসেছি। যা কোনও কালে সত্যি ছিল না, তাকে সত্য বলে এতদিন আমাদের বিশ্বাস

করানো হয়েছে। ধীরে ধীরে বাক্-প্রয়োগ দ্বারা যে কোনও এক জাতিকে যে দ্বিধা বা ত্রিধা বিভক্ত করা যায় এবং বিপরীত বাক্-প্রয়োগ দ্বারা পুনরায় তাদের একটী জাতিতে পরিণত করা যায় ভারতীয় ইতিহাস তাহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণ করেছে।

কলিকাতার মহা দাঙ্গার ব্যাপকতার অপর কারণ ছিল, মিথ্যা গুজবে বিশ্বাস। নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টী বুঝা যাবে।

"এই দিন ছিল লীগ ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন। জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে এই ঘোষণার পিছনে সরকারী সমর্থনও আছে। এই কারণে অশুভ ঘটনা সমূহের সম্ভাবনায় আমরা সকলে চিন্তিত আছি। বহুব্যক্তি এইদিন তাদের বাটীর বাহির পর্য্যন্ত হতে চাইছিল না। মহিলারা গৃহের দ্বার ও জানালা বন্ধ করে রাখা সমীচীন মনে করছিল। সকাল বেলায় আমি বারান্দায় বসে ভাবছিলাম যে এই দিন কি হবে? এমন সময় দূরে এক বাদ্য ধ্বনি শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করলাম একটী লীগ পরিচালিত শোভাযাত্রা। লোকেরা তারস্বরে ধ্বনি তুলছিল, 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান'। আমরা শিশুকাল হ'তে অখণ্ড ভারতের পূজক, ভারতমাতা ছিল আমাদের স্বপ্ন। ঘরে ঘরে ভারতমাতার প্রতিকৃতি টাঙান থাকতো। পূর্ব্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাবকে মাতার দুই অঞ্চলরূপে এই প্রতিকৃতিতে দেখানো হয়েছে। মাতার এই অঞ্চল দুইটী সাম্প্রদায়িক কারণে কর্ত্তিত হয়ে যাবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নি। এই কারণে আমাদের উত্তেজিত করবার জন্য 'পাকিস্থান' শব্দটীই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমরা মনে প্রাণে ছিলাম সুসংযত। এইজন্য মনের দুঃখ মনে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। ইতিমধ্যে কয়েকজন স্থানীয় বালক ঐ শোভাযাত্রার পিছন হ'তে চেঁচিয়ে উঠলো, 'নেই দেঙ্গা পাকিস্থান।' দুই পক্ষ হতেই ধ্বনি উঠছিল, যথা,—'লড়কে লেঙ্গা

পাকিস্থান', 'নেহি দেঙ্গা পাকিস্থান।' এই সময় কয়েকজন স্থানীয় লোককে হিন্দু বালকদের ভৎর্সনা করে বিতাড়িত করতেও দেখলাম। এদের মধ্যে কেহ কেহ নিরাপদে শোভাযাত্রাটীকে অগ্রসর হ'তে দেবার জন্য জনতাকে অনুরোধও জানালেন।

দুই ঘণ্টা পরে খবর এলো, যে মধ্য ও পূর্ব্ব কোলকাতায় হানাহানি সুরু হয়ে গিয়েছে। এই সকল খবর যে অতিরঞ্জিত তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যানবাহনের অভাবে কেহ কাহারও খোঁজ খবর নিতে অক্ষম ছিল। যে যা বলে লোকে তা'ই বিশ্বাস করতে সুরু করে। আত্মীয় বন্ধুর বিয়োগ আশঙ্কা এবং নারীর উপর অত্যাচারেদ সংবাদে মানুষ ক্রমশঃই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।"

সর্ব্বপ্রথম একজন বিরোধী সম্প্রদায়ের ব্যক্তির উপর জনৈক স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে আমি আক্রমণ করতে দেখলাম। আমার স্ব-সম্প্রদায়ের বহু পথচারী তাকে উদ্ধার করে ঐ আততায়ীকে পাকড়াও করে থানাতে নিয়ে এলো। এর পর ঐ পথচারীরা বহু বিরোধী সম্প্রদায়ের লোককে উদ্ধার করলো। কিন্তু আততায়ীদের কাউকেই এজন্যে পূর্ব্বের মত আর ধরপাকড় করলো না। কারণ ইতিমধ্যে সত্য মিথ্যা গুজব তাদের মনকে বিষিয়ে তুলতে সুরু করেছে। এর পর এই সকল রক্ষাকর্ত্তারা দুষ্কৃতিকারীদের তাদের কার্য্যের জন্য মাত্র ভৎর্সনা করে বা তা হতে তাদের বিরত থাকতে অনুরোধ করে কর্ত্তব্য সমাধা করলো। এরও কিছু পরে পরিলক্ষ্য করলাম যে এই সকল রক্ষাকর্ত্তারা কেবলমাত্র নির্ব্বাক দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করতে সুরু করেছে। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে এই সকল রক্ষাকর্ত্তাদেরও কাউকে কাউকে আততায়ীদেরও সহিত যোগ দিতে দেখেছি। এইদিন আমি বুঝেছিলাম যে গুজব ধীরে ধীরে ভালো লোকদেরও সাম্প্রদায়িক দানবে

পরিণত করতে সক্ষম। যারা কাউকে কুকথা বলে নি বা কারুর উপর হাত তুলে নি, যারা স্বভাবতঃ ভীরু প্রকৃতির তারাও এইদিন হত্যাকারীতে পরিণত হয়েছে।

সন্ধ্যার পর অমানুষীক অত্যাচারের বহু কাহিনী প্রমাণসহ পল্লীতে পল্লীতে পৌঁছুতে সুরু করলো, কিন্তু তার পূর্ব্বেই আত্মরক্ষামূলক মহা সংগ্রাম সুরু হয়ে গিয়েছে।

[সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপকতা বন্ধ করতে হ'লে সর্ব্বপ্রথমে গুজব বন্ধ করা দরকার। একমাত্র সত্য সংবাদের আশু প্রচার দ্বারা গুজব বন্ধ করা সম্ভব। যানবাহন চালু রাখা অপর এক উপায়। এতদ্বারা মানুষ আত্মীয়স্বজনের খবর নিজেরা সংগ্রহ করতে সক্ষম। সংবাদ সকল গুজব না হ'য়ে সত্য ঘটনা হ'লে উপরোক্তরূপ কোনও ব্যবস্থা প্রয়োগ না করাই ভালো।]

একথা স্বীকার্য্য যে পূর্ব্বে বাংলা দেশের দাঙ্গা সমূহ পশ্চিমা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙ্গালী হিন্দু মোস্‌লেম এই সকল দাঙ্গায় প্রায়ই অংশ গ্রহণ করে নি। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এরূপ কোনও দাবী আমরা করতে পারি নি।

দাঙ্গা বা যুদ্ধ সংখ্যা লঘু বা ক্ষুদ্র জাতি দ্বারাই পৃথিবীতে মুহুর্মুহুঃ ঘটেছে। এর কারণ তাদের অহেতুক ভীতি, লোভ এবং তৎজনিত সামরিক প্রস্তুতি। সংখ্যা গুরু বা বৃহৎ জাতিরা তাদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও তৎজনিত অপ্রস্তুতি এবং উদারতার জন্য বারে বারে আক্রান্ত হয়ে দুঃখ ক্লেশ ভোগ করেছে। বৃহৎ জাতি এবং সম্প্রদায় সকল প্রাচীন সভ্য জাতির বংশধর এবং মানবতার প্রতীক। তাদের প্রাচুর্য্য, উন্নততর জীবনযাত্রা, সৌন্দর্য্য এবং কৃষ্টি, ক্ষুদ্রতর জাতি সকলকে মুগ্ধ না করে প্রায়শক্ষেত্রে প্রলুব্ধ করেছে।

অন্যান্য বহু কারণসহ এই সত্যটীও ছিল কলিকাতা দাঙ্গার অন্যতম কারণ।

এদেশের প্রতিটী গ্রাম, জনপদ, নদী, পর্ব্বত আজও হিন্দু নামে পরিচিত। পাকিস্থান যে হিন্দুস্থানেরই অংশ এবং মোস্‌লেমগণ ধর্ম্মে মোস্‌লেম হ'লেও জাতিতে যে তারা হিন্দু তা এই হিন্দু নামগুলি আজও প্রমাণিত করছে।

এই দিক হতে বিচার করতে হ'লে যারা পাকিস্থান সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছিলেন তাদের দোষ দেওয়া যায় না। অপর দিকে দেশের মোস্‌লেম অধ্যুষিত স্থানগুলির স্বতন্ত্র হবার ইচ্ছাকেও কেহ অন্যায় বলতে পারে নি। অন্তরে অন্তরে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেছে এবং অর্দ্ধেক বাংলায় পাকিস্থান স্থাপনে তারা বাধা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে নি। হিন্দুমাত্রেরই একমাত্র আশঙ্কা ছিল পাছে সমগ্র বাংলায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঁচবার ইচ্ছা মানুষ মাত্রেরই থাকে, তাই বাঙ্গালী হিন্দুরাও বাঁচতে চেয়েছিল। বাঙ্গালী হিন্দুরা অর্দ্ধেক বাংলা নিজেদের বাসভূমিরূপে দাবী করেছিল, কিন্তু অপরপক্ষ এতে রাজী হয় নি। তারা চেয়েছিল কলিকাতাসহ সমগ্র বাংলা ও আসাম। এই অস্বীকৃতিই বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতিরোধ সৃষ্টির একমাত্র কারণ।

[অর্দ্ধেক বাংলা বাঙ্গালী হিন্দু লাভ করলে বাঙ্গালী হিন্দু বা বাঙ্গালী মোস্‌লেম বাংলার উভয়াংশে সগৌরবে বাস করতে পারতো। অন্ততঃ পক্ষে আজ বাস্তহারা সমস্যা এমন নিদারুণরূপে দেখা দিত না। অর্দ্ধেক বাংলা লাভ না করে বাংলা বিভাগে বাঙ্গালীদের রাজী হওয়া উচিত হয় নি। সমগ্র ভারতের মঙ্গলের কথা ভেবে যদি তাঁরা রাজী হয়ে থাকেন সে কথা স্বতন্ত্র।]

হিন্দুদের পাকিস্থান সৃষ্টির অস্বীকৃতি এই মহা দাঙ্গার কারণ ছিল

বলে আমি মনে করি না। এই মহা দাঙ্গার কারণ ছিল মোস্‌লেমদের হিন্দু বাংলা সৃষ্টির অস্বীকৃতি। এই অস্বীকৃতির কারণে মহাল্লায় মহাল্লায় হিন্দু বালক, যুবক এবং বৃদ্ধগণ বহু প্রতিরোধ দলের সৃষ্টি করে। এই দলগুলিকে প্রতিরোধ দল বা রেসিস্‌টেণ্ট গ্রুপ বলা হতো। তার কারণ প্রথমে এরা আত্মরক্ষা ছাড়া কখনও আক্রমণ করে নি। বিস্ময়কর ভাবে এই দল সকল আত্মরক্ষায় সুপটু হয়ে উঠেছিল। পরিশেষে তারা আক্রমণও যে সুরু না করেছে, তা'ও নয়। প্রথমে ভদ্র ঘরের যুবক এবং বালকগণ এ দলগুলির সৃজন করে কিন্তু পরে পল্লীর গুণ্ডা শ্রেণীর ব্যক্তিরাও এই সকল দলে স্থান পেয়েছিল। যে সকল ব্যক্তিকে ভদ্র বা গৃহস্থ বাটীর ত্রিসীমানাতেও আসতে দেওয়া হয় নি, তাদের এই সময় আদর করে গৃহের মধ্যেও স্থান দেওয়া হয়েছিল। ভদ্র ঘরের কন্যা ও বধূগণও এই সময় এদের সহিত বাক্যালাপ করেছে। এমন কি তারা এদের আদর আপ্যায়িত করে খেতেও দিয়েছে। সৎআদর্শ অসৎ ব্যক্তিদেরও সৎ রাখতে সক্ষম। এবম্বিধ দাঙ্গার মধ্যে এরা আদর্শের সন্ধান পাচ্ছিল। বিরোধী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং প্রাণ হরণের মধ্যে তারা তাদের সঞ্চিত অপঃস্পৃহা বহিষ্কৃত করেছিল। স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ধন-সম্পত্তি এবং প্রাণ মান রক্ষা করে তারা অন্তর্নিহিত সুপ্ত সূক্ষ্ম বৃত্তিসমূহের উন্মেষও ঘটাচ্ছিল। অপর দিকে বহু সৎ ব্যক্তি এবং নিরপরাধী এই দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হয়ে তাদের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহার বহির্বিকাশও ঘটিয়েছে। এজন্য দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট বহু অপরাধীকে নিরপরাধী এবং বহু নিরপরাধীকে অপরাধী হ'তে দেখা গিয়েছে। তবে এই মতবাদ মাত্র দৈব এবং অভ্যাস অপরাধীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। মধ্যম এবং স্বভাব অপরাধী সম্বন্ধে ইহা আদপেই সত্য নয়। এমন কি বহু অভ্যাস অপরাধীদের

সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে না। বস্তুতঃপক্ষে আদর্শবিহীন গুণ্ডাদল এবং অপরাধীদের সাহায্যে কোনও জাতি কখনও উপকৃত হ'তে পারে নি। সাময়িকভাবে উহারা কিছুটা উপকার করলেও আখেরে উহারা জাতির ক্ষতি করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পল্লীর প্রতিরোধী দলগুলিতে এদের আধিপত্য কম ছিল না। এই জীবনমরণ সংগ্রামে কাহারও সামান্য সাহায্যও প্রত্যাখ্যান করা যায় নি। ফলে অচীরে ইহার কুফল সুদূর প্রসারী হয়ে উঠেছিল। নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টী বুঝা যাবে।

"অমুককে আমরা চিরকাল গুণ্ডা বলে ঘৃণা করে এসেছি। বহুবার আমরা দরখাস্ত করে একে পুলিশেও সোপর্দ্দ করেছি। কিন্তু দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার পর আমরা এই প্রকৃতির লোকেরও সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এদের আমরা অর্থ দিয়ে বশীভূত করে বিরোধী সম্প্রদায়ের আক্রমণ প্রতিরোধার্থে নিযুক্ত করেছিলাম। যতদিন আমরা এদের অর্থ দিতে পেরেছি ততদিন এরা জীবনপণ করে আমাদের রক্ষা করেছে। কিন্তু বেশী দিন আমরা এদের নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে পারিনি। পরিশেষে স্ব-সম্প্রদায়ের লোকেদের নিকট দাঙ্গা নিবারণের অছিলায় এরা বলপূর্ব্বক অর্থ আদায় সুরু করে দিলে। একদিন এদের একজন এ'ও বলেছিল, 'কি দেবেন না টাকা? আচ্ছা, তা'হলে হিন্দু পাড়াতে পটকা ফাটাবো।' যে পল্লীতে পটকা ফাটে সেই পল্লী হ'তেই যুবকদের পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। এইজন্য ঐ গুণ্ডা ব্যক্তি আমাদের পাড়াতে ফটকা ফাটাবে বলেছিল। পরিশেষে আমরা এই লোকটীর বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দিতে বাধ্য হই।"

হিন্দু পল্লীর ন্যায় মুসলমান পল্লীগুলিরও এইরূপ অবনতি ঘটেছিল। যে সকল মোস্‌লেম ভদ্রলোক নিরাপত্তার কারণে মোসলেম পল্লীতে

আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের নিকট হতে মোস্‌লেম গুণ্ডারা এই অজুহাতে নিয়মিত অর্থ আদায় করেছে। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের কাউকে কাউকে পরে হিন্দু পল্লীতে ফিরে আসতে হয়েছিল।

দাঙ্গা নিবারিত হওয়ার অব্যবহিত পরে পল্লীগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠে। গুণ্ডামীর জন্য বারে বারে বাহবা পেয়ে ভদ্র ব্যক্তিরাও গুণ্ডায় পরিণত হয়েছিল। গুণ্ডামী এবং উৎপীড়ন এতদিনে এদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এই অভ্যাস এরা সহজে পরিত্যাগ করতে পারে নি। দাঙ্গার অবসানের পর নাগরিকদের নিকট এদের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। এদের অনুরূপ ভাবে আদরও কেহ করে না, অর্থ প্রদান তো দূরের কথা। এই অবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এরা স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদেরই উপর উৎপীড়ন সুরু করেছে। একদিন যে কার্য্যের জন্য স্ব-সম্প্রদায়ের জনসাধারণ তাদের বাহবা দিয়েছে। পরবর্ত্তীকালে সেই কার্য্য যে এই গুণ্ডাদল তাদের উপর সমাধা করবে তাহা কেহ পূর্ব্বে কল্পনাও করে নি। পূর্ব্ব-উপকার ভুলে এই জন্য এদের বিরুদ্ধে বহু লোকই মামলা রুজু করেছিল। এই গুণ্ডাগণও এই দিন ভেবেছিল যে এ কি হলো? তাদের জীবনপণ প্রত্যুপকারের প্রতিফল কি এই? অন্তর্য্যামীর নিকট তাদের এই অভিযোগ পোঁছেছে কিনা জানি না। তবে একথা আমি জানি যে আজও তারা পূর্ব্বের ন্যায় ঘৃণ্য জীবন যাপন করছে। তাই মধ্যকার কয়েক মাসের সুখ-স্বপ্ন ফিরিয়ে আনতে আজও তারা চেষ্টা করে। এইজন্য সুবিধা পেলে তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার জন্য আজও চেষ্টা করে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে পোষ্ট-রায়ট বা দাঙ্গা-হাঙ্গামোত্তর কোনও পরিকল্পনা সরকার বাহাদুর করলে আমাদের পূর্ব্বেকার উপকারী বন্ধুদের অনেকে পরবর্ত্তীকালে সাধু জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে পারতো।

এই দাঙ্গায় মাতা ও ভগ্নীদের সম্মান রক্ষার্থে বহু গৃহস্থ যুবক নিহত এবং আহত হয়েছিল, কিন্তু দাঙ্গার অবসানে কাউকে এদের খোঁজখবর নিতে দেখি নি। এমন বহু অঙ্গহীন সাহসী বালক ও যুবককে আমি জানি, যারা না থাকলে বহু পল্লীই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো। কিন্তু তা সত্বেও আজ তারা অকর্ম্মণ্যভাবে অর্দ্ধাহারে কালযাপন করছে। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট বা জনসাধারণের নিকট আজ তাদের কোনও স্থান নেই। যারা একদিন কলিকাতা রক্ষা করেছে, কলিকাতাবাসীর নিকট আজ তাদের কোন প্রয়োজন নেই। একেই বলে বিধাতার নির্ম্মম পরিহাস। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"আমি মাত্র ছয়জন সশস্ত্র শান্ত্রীসহ অকুস্থলে পৌঁছিয়ে দেখলাম পল্লীটী প্রায় সহস্র সশস্ত্র গুণ্ডাদল দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। নারী ও শিশুগণের চীৎকারে এবং গুণ্ডাদের হুঙ্কারে সারা পল্লী বিদীর্ণ প্রায়। এমন কি আমরাও এই গুণ্ডাদল দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়েছি। এমন সময় মাত্র তুইটী বালক এগিয়ে এসে গুণ্ডাদিগকে রুখে দাঁড়ালো। এর পর যা ঘটেছিল তা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য আমার নেই। গুণ্ডাদল বিতাড়িত হবার পর আহত যুবকদ্বয়কে আমি উঠিয়ে নিয়ে হাসপাতালে দিয়ে আসি। হাসপাতালে এদের তুজনেরই দক্ষিণ হস্ত কর্ত্তিত করে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে বহুবার এদের সহিত আমার দেখা হয়েছে। তাদের এই তুরবস্থায় ব্যথিত হয়ে জিজ্ঞেসা করেছি, 'কি হে, পাড়ার কেউ তোমাদের জন্য কিছু করলো না?' মৃত্ব হেসে বালক তুইটী উত্তর করেছিল, 'পাড়ায় পুরানো লোক কোথায়? ওদের তাড়িয়ে যাদের জন্য স্থান করে দিয়েছি তারা সকলেই নবাগত। আমাদের কোনও খবরই তারা জানে না।'—'কিন্তু ওখানকার পুরানো বাসিন্দারা?' আমি জিজ্ঞেসা করলাম, 'তারা তো তোমাদের জানে।'—'তা তারা জানে,

কিন্তু মানে না', বালকদ্বয় মৃদু হেসে উত্তর করলো, 'তারা আমাদের আজ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ভেবে অবজ্ঞা করে। সরকার বাহাদুরও নানা কারণে আমাদের পছন্দ করেন না। তাই আমরা এ পর্য্যন্ত কারুর কাছে কোনও সাহায্য পাই না। আজ আমরা আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহ হয়ে আছি। মাত্র একইটুকুই হয়েছে আমাদের পুরস্কার।"

দাঙ্গার সময় মিশ্র পল্লীগুলির সমাজ-ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছে। কিংবা ক্ষেত্রবিশেষ এই সমাজ নূতনভাবে গড়ে উঠেছে। বহু স্থলে পর্দ্দা প্রথা রক্ষা করাও সম্ভব হয় নি। পল্লীর একাংশ আক্রান্ত হলে বা তা হওয়ার সম্ভাবনা হলে নারী ও কন্যাগণ অপরিচিত পুরুষদের সহিত এ-বাড়ী বা ও-বাড়ীতে আশ্রয় নিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। সমস্ত পল্লীর নরনারী এই সময় এক পরিবারভুক্ত জনগণের মত হয়ে উঠেছিল। যে সকল নারীরা পরপুরুষের সম্মুখে বার হয় নি তারাও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে পুরুষদের সাহায্য করেছে। পল্লীতে পল্লীতে কিরূপ ভাবে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা নিম্নের বিবৃতি হ'তে বুঝা যাবে।

"আমরা মেয়েদের ছাদ হ'তে টর্চ্চ লাইটের সঙ্কেত দ্বারা জানাতে অনুরোধ করেছি, পুলিশের গাড়ী দূর হ'তে তারা দেখতে পেয়েছে কি'না ? এই সময় আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রাস্তায় ও মোড়ে মোড়ে পাহারা দিতাম। সান্ধ্যআইন প্রযুক্ত থাকায় এরা রাস্তায় পেলে আমাদের গ্রেপ্তার করতে পারে। এইজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাস্তায় পাহারা না দিলে যে কোনও মুহূর্ত্তে আমরা আক্রান্ত হ'তে পারতাম। কারণ পুলিশের পক্ষে সকল সময় অকুস্থলে হাজির থাকা সম্ভব ছিল না। তাদের অবর্ত্তমানে বিরোধীদলের যারা সীমানার পরপারে বা এখানে ওখানে বস্তীতে বাস করে, তারা যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের উপর হামলা করতে পারতো। একজন বাড়ীর বার হ'লে

অক্ষত অবস্থায় সে যে ফিরবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং যে কোনও মুহূর্ত্তে তার ছুরিকাহত হবার সম্ভাবনা আছে। এইজন্য আমরা সশস্ত্র অবস্থায় ট্রাম রাস্তা হ'তে 'অফিস এবং স্কুল ফেরতা' লোকদের এগিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছি। প্রতিটী গৃহ আমরা ছোটখাটো দুর্গে পরিণত করেছিলাম। ছাদে ছাদে আমরা আত্মরক্ষার্থে ইষ্টক সংগ্রহ করে রাখতাম। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা আইনত এই সময় অন্যায় ছিল। এজন্য আমরা হাল্কা গাঁথুনির ইষ্টক নির্ম্মিত তুলসীমঞ্চ প্রতিটী ছাদে তৈরী করতাম। ছাদের আলিসারও অংশ বিশেষে এইভাবে আমরা উঁচু করে রাখতাম। আইনত পুলিশের এতে কিছু বলবার অধিকার ছিল না। আক্রান্ত হ'লে আমরা এই মণ্ডপ এবং আলিসা ভেঙ্গে প্রতিরোধার্থে ইষ্টক সংগ্রহ করেছি। মেয়েরা এইগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে এবং আমরা তার সদ্ব্যবহার করেছি। স্ত্রী পুরুষের সমবেত চেষ্টায় এইভাবে আমরা আত্মরক্ষা করেছি। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে একদিনের জন্যও পিতৃপুরুষের বাসস্থান পরিত্যাগ করি নি।

এই সময় প্রতিটী গুপ্তস্থান অস্ত্রাগার এবং দেশী পদ্ধতিতে অস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানায় পরিণত হয়েছিল। কলের জলের পাইপ কেটে ও তাতে ফুটা করে উহাতে ঘোড়া (ট্রিগার) বসিয়ে আমরা পাইপ গান তৈরী করতাম। লাইসেন্স-ধারী বন্ধুদের নিকট হতে কার্ত্তুজ এবং রাইফেলের গুলি আমরা এই দেশীয় বন্দুকের জন্য সংগ্রহ করতাম। লাইসেন্স-ধারী ব্যক্তিদের মধ্যে শিকারী ব্যক্তিগণ গুলির হিসাবে গোঁজা মিল দিতে সক্ষম ছিল। এইজন্য আমরা বিপদে পড়লেও তারা কখনও বিপদে পড়েন নি। এই সকল পাইপ গান, কার্ত্তুজ এবং ঘরে তৈরী বোমা আমরা এয়ার টাইট্ বাক্সে করে খালের জলে ডুবিয়ে কিংবা মাটির তলায় পুঁতে রাখতাম। প্রয়োজন হওয়া মাত্র ঐ গুলি উঠিয়ে নিতে আমাদের একটুও দেরী হয়

নি। আমরা প্রতিবেশীদের কখনও বাসস্থান ত্যাগ করতে দিই নি। কেহ উহা ত্যাগ করা মাত্র আমরা ঐ বাড়ীতে তখুনি অন্য এক পরিবারকে বসিয়ে দিয়ে আমাদের স্থানীয় সংখ্যার গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছি। দিবারাত্র আমরা পালা করে পল্লীগুলি পাহারা দিতাম। পরিবার বিশেষের জন্য দৈনিক খাদ্যাদিও আমরা সংগ্রহ করে দিয়েছি। এইভাবে প্রাণপণ পরিশ্রম না করলে সাহায্য-পুষ্ট বিরোধী সম্প্রদায়ের চাপে মিশ্র পল্লীগুলি আমাদের পরিত্যাগ করতে হতো এবং আমরা পূর্ব্ব কলিকাতা চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলতাম। সংখ্যাগুরু বারাসাত মহকুমার সহিত সংযুক্ত হয়ে উহা হয়তো পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হতো কিংবা সমগ্র কলিকাতাই আমরা হারিয়ে ফেলতাম।

আত্মরক্ষার্থে অস্ত্ররূপে আমরা দেশী বন্দুক এবং বোমা, ইষ্টক, এ্যাসিডবাল্‌ব প্রভৃতি ব্যবহার করেছি। আমাদের কোনও দল অবৈধ ভাবে বিদেশী পিস্তল বা বন্দুকও আমদানি করেছে। কোনও কোনও মহল হ'তে পল্লীর প্রতিরোধক দলগুলিকে এগুলি গোপনে সরবরাহ করা হতো।" কিরূপ সাবধানতার সহিত উহা করা হতো তা নিম্নের বিবৃতি হ'তে তা বুঝা যাবে। এই ঘটনাটী কলিকাতার সেণ্ট্রাল এভিনিউ নামক রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত হয়েছিল।

"আমি একজন য়ুরোপীয় শান্তি-রক্ষী। একদিন সন্দেহ করে আমি একটী জীপ্‌শকট আটক করি। এই শকটে বহু আগ্নেয় অস্ত্র ছিল। দুইজন যুবককে শকট হ'তে আমি গ্রেপ্তার করি। ইতিমধ্যে পিছন হ'তে স্থানীয় পুলিশের পোষাকে দুইজন অফিসার অপর এক জীপে এসে হাজির হ'লেন। আমার কাজে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করে আমার পকেট বুকে সই করলেন। তারপর থানায় নেবার অজুহাতে আসামী এবং বামাল সহ তাঁরা ঐ স্থান ত্যাগ করলেন। হেড কোয়াটারে এসে এই

চাঞ্চল্যকর ব্যাপারটী জানালে কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় থানায় খোঁজ নিয়ে অবাক হয়ে যায়। অদ্যাবধি এই অপদলের কোনও হদিসই পাওয়া যায় নি।"

এই মহা দাঙ্গায় বিশেষ কোনও এক পক্ষীয়দের সুবিধা ছিল অত্যধিক। প্রথমতঃ তারা তৎকালীন গভর্ণমেণ্টকে তাদের নিজস্ব গভর্ণমেণ্টরূপে মনে করতো। এমন কি এদের কেউ কেউ এতে সরকারী সমর্থন আছে এইরূপও মনে করেছে। পরবর্ত্তীকালে আমি এদের কাউকে কাউকে বিস্মিত হয়ে বলতে শুনেছি, "এ কেয়া বাবু সাহেব! পাকড়াতা কাহে? এতো হুকুম নেহি থা।" দ্বিতীয়তঃ, এদের মধ্যে গণ-প্রার্থনা (Mass prayer) প্রথা প্রচলিত থাকায় এরা আইন সঙ্গতভাবে প্রার্থনা ভবন সমূহে মিলিত হয়ে সলা পরামর্শ করতে পারতো। সাধারণতঃ প্রার্থনার পর এই সকল লোকদের নেতাদের নির্দ্দেশ মত করণীয় কার্য্য সকল বুঝিয়ে দেবার সুবিধা হতো। তৃতীয়তঃ, এদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকায় এরা স্ত্রীপুত্র পরিবার সম্বন্ধে চিন্তাহীন হয়ে বেপরোয়াভাবে কার্য্য করতে সক্ষম ছিল। এরা সকলেই বুঝতো যে তাদের মৃত্যু ঘটলে পরিবারবর্গ অসহায় হয়ে উঠবে না, ভিক্ষাও করবে না। বরং পুত্রাদিসহ তার স্ত্রী অপর আর একজন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিকা করে সুখে কালাতিপাত করতে পারবে। চতুর্থতঃ, কলিকাতায় এদের অধিকাংশ ব্যক্তি নিম্নশ্রেণীর হওয়ায় কর্ম্মঠ ছিল। এরা বস্তিজীবনে অভ্যস্ত এবং দরিদ্র ছিল। দাঙ্গায় এদের লাভ আছে, কিন্তু ক্ষতি নেই। এদের মধ্যে গুণ্ডা এবং দুষ্কৃতকারীদের সংখ্যাধিক্য ছিল। বস্তুতঃপক্ষে এই সমাজের শিক্ষিত এবং ভদ্রবংশীয়রা দাঙ্গার ব্যপারে সহানুভূতিশীল হ'লেও প্রত্যক্ষ ভাবে ইহাতে অংশ গ্রহণ কম করেছে। এ ছাড়া এই সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা এই সময় শহরে নগণ্যই ছিল।

অন্যদিকে শহরে হিন্দু বাঙালীদের অধিকাংশ ব্যক্তিই ছিল ভদ্র-বংশীয় এবং শিক্ষিত। এদের মধ্যে ব্যবসায়ী, ছাত্র এবং চাকুরীয়াদের সংখ্যাই ছিল অধিক। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা মারপিটকে এরা চিরকালই ভয় এবং ঘৃণা করে এসেছে। এদের সামাজিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষাজনিত শারীরিক গঠন এবং মনোবৃত্তি দাঙ্গা-হাঙ্গামার অনুকূল ছিল না। এই সমাজের কর্ম্মঠ শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণীর মানুষ শহরে কমই বাস করে থাকে।

[এইজন্য দাঙ্গার প্রারম্ভে প্রতিরোধার্থে দেশবালী হিন্দুদেরই অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। এদের সকলেই প্রায় ছিল শ্রমিক শ্রেণীর। এইজন্য প্রথমে এদের সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু কয়েক দিন পরই যখন হাত-বোমা, এ্যাসিড-বাল্‌ব ব্যবহৃত হ'তে লাগলো, তখন এদের ব্যবহৃত লাঠি এবং ইট-পাটকেল অকেজো হয়ে উঠে। এই সময় হ'তে প্রতিরোধের ভার এমনিই এসে পড়েছিল শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের হস্তে এবং দাঙ্গার শেষ দিন পর্য্যন্ত হাত-বোমা প্রভৃতির সাহায্যে এরাই সকল শ্রেণীর হিন্দুদের রক্ষা করে এসেছে।]

এই সকল বিষয় বিবেচনা করলে বুঝা যাবে যে কলিকাতার হিন্দুগণ বাধ্য হয়ে এবং মাত্র আত্মরক্ষার্থে বা প্রতিরোধার্থে এই দাঙ্গায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রতি-আক্রমণ তারা কম ক্ষেত্রেই করেছে। কেহ কেহ প্রতি-আক্রমণকে আত্মরক্ষার অন্যতম উপায় বলে যে মনে করে নি, তা'ও নয়। কয়েকটী ক্ষেত্রে তারা সাফল্যের সহিত আক্রমণও করেছিল কিন্তু প্রায়শক্ষেত্রে তারা সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করে এসেছে। হিন্দুদের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি, সাহস, দেশ-প্রেম এবং দ্রুত সংগঠন শক্তির কারণেই ইহা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরিশেষে দাঙ্গা করা হিন্দু যুবকদেরও এক অভ্যাসের সামিল হয়ে উঠে এবং পূর্ব্বেকার বহু সাধু

প্রকৃতির হিন্দু যুবককেও আমরা দুর্দ্ধর্ষ এবং নির্ম্মম গুণ্ডাতে পরিণত হ'তে দেখি। দাঙ্গোত্তরিকালে জনসমাজ এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর পুলিশকে এদের দমন করতে বিশেষ আয়াস করতে হয়েছে।

অপঃস্পৃহা একবার বহির্গত হ'লে উহাকে পুনরায় সংযত করা সুকঠিন। এই কারণে আজও পর্য্যন্ত এদের অনেকে তাদের পূর্ব্ব অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারে নি। যে অত্যাচার এতোদিন এরা দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বিশেষে বিরোধী সমাজভুক্ত ব্যক্তির প্রতি করেছে সেইরূপ অত্যাচার আজও তারা সুবিধামত স্ব-সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি করে থাকে। একদিন যারা এই অপকার্য্যের জন্য তাদের বাহবা দিয়েছিল, আজ তারা অধোবদনে তাদের এই কীর্ত্তিকলাপ দেখে ক্ষুব্ধ হয়। দাঙ্গার অপর কুফল জনসাধারণের মিথ্যা প্রবণতা। এক সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা কিরূপে অপর সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার ব্যাপারে অভিযোগ মুখর হয়ে অনর্গল মিথ্যা বলতো, তা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। দাঙ্গার অবসানেও বহু ব্যক্তি দল বেঁধে মিথ্যা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারে নি। এই গণ-মিথ্যা-ভাষণের অভ্যাসের কারণে বহু দিন পর্য্যন্ত শান্তিরক্ষিগণ সত্য নিরূপণে অক্ষম ছিল। পূর্ব্ব অভ্যাসের কারণে এক দলের প্রতিটী ব্যক্তি সত্য নিরূপণের চেষ্টা না করে তাদের স্বদল ভুক্ত অপরাধী ব্যক্তিদেরও উক্তি (ওয়াকিবহাল রূপে) আজও সমর্থন করে থাকে।

বহুক্ষেত্রে পিতা এবং খুল্লতাতকে যুবক-পুত্রের অধীনে বা আদেশে প্রতিরোধের ব্যাপারে আত্ম-নিয়োগ করতে হ'তো। আমি বহু পুত্রকে বলতে শুনেছি, 'বাবা, তুমি ছাদে যাও, ওখান থেকে ইসারা করো। আমরা সবাই নীচে আছি।' পিতা এবং খুল্লতাত পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের এই সকল আদেশ নির্ব্বিচারে মেনে নিয়েছে। দাঙ্গার অবসানে এই

পুত্রগণকে তাদের পিতা এবং পিতৃব্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাদের হুকুম মত চলতে আজও পর্য্যন্ত বাধ্য করতে পারে নি। যুবকদের মধ্যে আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব এই মহা দাঙ্গার অপর আর এক কুফল। দাঙ্গার প্রতিরোধার্থে সংগৃহীত অর্থ এবং অস্ত্রের সাহায্যে পরে এদের অনেকে সাধারণ ডাকাতি আদি অপকার্য্যও করেছে।

এই মহা দাঙ্গা বাঙালী হিন্দুসমাজের প্রকারান্তরে উপকারও করেছিল। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী হিন্দুদের এরা একটী বিরাট শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করে তুলেছিল। ইহা বাঙালীদের স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে এক যুদ্ধপ্রিয় সামরিক জাতিতে পরিণত করে তুলেছিল। যাঁরা এই সময়ে কলিকাতার মিশ্র পল্লী সমূহে বাস করতেন, তাঁরা এ কথা আজও স্বীকার করবেন। পর্দ্দা প্রথা প্রায় উঠে গিয়েছিল। ধনী এবং নির্ধন শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের চিরন্তন ভেদাভেদ বিলুপ্ত হচ্ছিল। আপদ-কালে এক বাড়ীর স্ত্রী-কন্যা নির্ভয়ে অপর এক বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। স্ত্রীগণ ছাদ হ'তে ইঁট ছুঁড়ে বা গরম জল ফেলে নিম্নের বিরোধী জনতাকে বিতাড়িত করেছে। পুরুষগণ স্ব-সমাজভুক্ত নারীর ইজ্জৎ এবং ধন সম্পত্তি ও প্রাণ রক্ষার্থ পথে ঘাটে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নি। এই সময় একজন বাড়ীর বার হ'লে সে যে ফিরে আসবে তা কেউ বলতে পারতো না বরং যে কোনও মুহূর্ত্তে আততায়ীর ছুরিতে প্রাণ ত্যাগ করার সম্ভাবনা ছিল বেশী। কিন্তু তা সত্বেও এরা বাসস্থান ত্যাগ করে পলায়ন করে নি বরং সাহসের সহিত অফিস কাছারি, স্কুল, পাঠশালায় গমনাগমন করেছে। কলিকাতার তৎকালীন মিশ্র পল্লী সমূহকে কেহ কেহ অশান্ত সীমান্ত প্রদেশের সহিতও তুলনা করে-ছিলেন। স্নেহপ্রবণ মাতা, ঠাকুরমাতাগণ এবং পিসীমাতাগণ গৃহের সম্মান রক্ষার্থে আপন আপন সন্তান সন্ততিদের প্রতিরোধের জন্য উৎসাহিত

করেছে। এদের কেহ কেহ বড় জোর সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, "পাড়ায় থেকে পাড়ার জন্য সব কিছু করিস্, তবে তুই ভিন্ পাড়ায় যাস নি, কিন্তু —!"

এতো অঘটন এবং নৃশংসতার মধ্যেও উভয় সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তির মধ্যে উদারতার অভাব দেখা যায় নি। বহু হিন্দু মোস্‌লেমকে এবং বহু মোস্‌লেম হিন্দুকে প্রাণ তুচ্ছ করেও আশ্রয় দিয়েছে, রক্ষা করেছে এবং উদ্ধারও। প্রায়শক্ষেত্রে স্ব-পল্লীর সংখ্যালঘুদের উপর ঐ পল্লীর সংখ্যা-গুরুরা অত্যাচার করে নি, ভিন্ন পাড়ার লোকেরা এসে তাদের উপর পীড়ন করে গিয়েছে। কিন্তু স্ব-পল্লীর লোকেরা এইজন্য স্বধর্ম্মীয় আততায়ীদের যে সকল ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছে তা'ও নয়। তবে পরিচত ব্যক্তি এবং বন্ধু-বান্ধবদের তারা সকল সময়ই রক্ষা করছিল। এই ক্ষেত্রে তারা বিধর্ম্মীয় কাহাকেও রক্ষা করে নি, রক্ষা করেছে মাত্র বিধর্ম্মীয় পরিচিত ব্যক্তি এবং বন্ধু-বান্ধবদের। এদের মধ্যে যারা অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও বিধর্ম্মীদের রক্ষা করেছিলেন সত্য সত্যই তারা নমস্য ব্যক্তি। আজও আমি তাদের এজন্য প্রণাম করি।

অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সকল নেতাদের ইঙ্গিতে এই মহা দাঙ্গা সুরু হয়েছে তারা কিন্তু এই সময় নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেন নি। পত্রিকা সমূহ মারফৎ এরা বিষোদ্গার করলেও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে এরা মেলামেশা এবং খানাপিনা করতে কুণ্ঠা বোধ করে নি।

এই সময় সর্ব্বাধিক অসুবিধা ভোগ করছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী শ্রেণী। শ্রমশিল্পে এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান এমন ভাবে বিজড়িত ছিল যে একের সাহায্য এবং শুভেচ্ছা ব্যতিরেকে অপরের জীবন ধারণ পর্য্যন্ত সম্ভব ছিল না। যে কাঁচামাল হ'তে একজন মোস্‌লেম

দ্রব্যাদি তৈরি করবে, সেই কাঁচা মালের জন্য তাকে হিন্দুর দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। এমন কি একই দ্রব্যের একাংশ তৈরী করে এসেছে হিন্দু এবং উহার অপরাংশ তৈরী করেছে মোস্‌লেম। অন্যদিকে হিন্দুদের দর্জ্জি, দপ্তরি, রাজমিস্ত্রির জন্য হাহাকার করতে হয়েছে। অপরদিকে মোস্‌লেমগণকে হিন্দু খরিদ্দারের অভাবে অনাহারে থাকতে হয়েছে। এইজন্য শেষের দিকে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা কেউ পছন্দ করছিল না। এই সময় এরা প্রয়োজন মত আপন ব্যবস্থা আপনারাই করে নিয়েছিল। তা না হ'লে কলিকাতার নাগরিক জীবন অচিরে বিপর্য্যস্ত হয়ে যেতো। এরা হিন্দু এবং মোস্‌লেম পল্লীর সীমানায় বদলা বদলীর জন্য এক একটী ঘাঁটির সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু পল্লী হ'তে মাল মশলা মোস্‌লেম পল্লীতে পাঠাতে হ'লে হিন্দু ঠেলাওয়ালা তার গাড়ী মাল সহ ঐ সীমানা পর্য্যন্ত পোঁছে দিতো। এবং ঐ স্থান হ'তে মোস্‌লেম ঠেলাওয়ালা বা গাড়োয়ান মাল সহ ঐ শকটের ভার গ্রহণ করতো। অনুরূপ ভাবে মোস্‌লেম মেষ ও ছাগ বিক্রেতা সীমানায় এসে হিন্দুদের নিকট এগুলি বিক্রয় করে গিয়েছে। এই সকল বিষয়ে এরা পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতো।

কলিকাতায় দাঙ্গা আশানুযায়ী সফলতা লাভ না করায় উহা নোয়াখালি জিলায় স্থান লাভ করে। নোয়াখালির দাঙ্গাকে দাঙ্গা না বলে নিধন যজ্ঞ বললেই ভালো হবে। সর্ব্বাংশে সংখ্যা-গুরুর দ্বারা কৃত হওয়ায় উহা এক তরফা ছিল। এই দাঙ্গার মধ্যে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। কলিকাতার বিফলতার নিষ্ঠুর প্রতিশোধের কারণেই ইহা সৃষ্ট হয়েছিল। হয়তো ইহা সারা পূর্ব্ব বাঙলাতে প্রকট হয়ে উঠ্‌তো কিন্তু বিহারের "বদলা লওয়া" উহা প্রতিরোধ করে দেয়। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে সাম্প্রদায়িকতা মাত্র সাম্প্রদায়িকতা দ্বারাই

প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু মহামানব মহাত্মা গান্ধী ইহা যে ভুল ব্যাখ্যা তা প্রমাণ করে গিয়েছেন।

কলিকাতা মহা দাঙ্গার প্রত্যক্ষ ফল পাকিস্থান স্বীকার, তথা ভারত বিভাগ। যারা সারা ভারতকে তাদের জন্মভূমিরূপে জানতো তাদের নিকট ইহা ছিল মহা দুর্দ্দিন। পূর্ব্ব বাংলার বহুলোক এইদিন অশ্রু-সংবরণ করতে পারে নি। পশ্চিম পাঞ্জাববাসীরা কাঁদবারও সময় পায় নি। কলিকাতার দাঙ্গা নূতনরূপে ঐ প্রদেশে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অবশিষ্ট ভারতবর্ষ বিমূঢ় হয়ে মাতৃভূমির বিচ্ছিন্নাংশ দুইটীর দুঃখ দুর্দ্দশা উপলব্ধি করলেও তারা এর প্রতিকার করতে পারে নি।

দেশ বিভাগের দ্বারা কোন্ সম্প্রদায় লাভবান হয়েছে, তা বলা কঠিন। কারুর কারুর মতে মোস্‌লেম সম্প্রদায়ের এতে ক্ষতি হয়েছে বেশী। এই সম্বন্ধে জনৈক বন্ধু নিম্নোক্তরূপ এক বিশ্লেষণ করেছিলেন।

"মোস্‌লেমগণ যদি আরও কিছুকাল দেরী করতো তা'হলে তারা সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষই অধিকার করতে পারতো। পৃথিবীতে স্থান এবং খাদ্য পরিমিত। এইজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। হিন্দুদিগের সমাজ-ব্যবস্থা এইরূপ নিয়ন্ত্রণের উপযোগী। বিধবা বিবাহের অপ্রচলন এবং জাতিভেদ প্রথার জন্য হিন্দুদের জনসংখ্যা অধিক বর্দ্ধিত হয় না। কিন্তু মোস্‌লেমদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং বহু বিবাহ প্রথার কারণে উহাদের জনসংখা বৃদ্ধির হার অত্যধিক। মোস্‌লেমদের অবর্ত্তমানে হিন্দুদের পরিমিত জনসংখ্যা দেশের পক্ষে ভালো ছিল। কারণ জনসংখ্যার অতি বৃদ্ধি খাদ্য এবং স্থানাভাব ঘটায়। আত্মরক্ষার কারণে ভারতের বর্ত্তমান জনসংখ্যাই যথেষ্ট। উহার অধিক জনসংখ্যা হ'লে খাদ্যাভাবের কারণে বরং আত্মরক্ষার ব্যাঘাত ঘটাতে

পারে। মোস্‌লেমদের জনবৃদ্ধির ভয়াবহ হার একই দেশের অধিবাসী বিধায় হিন্দুদের নিকট উহা শঙ্কার কারণ ছিল। কিন্তু পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ার পর অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। সঙ্কীর্ণ বাসভূমিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আখেরে মোস্‌লেমদের ক্ষতির কারণ হবে। যে জনবৃদ্ধি তাদের উপকার করছিল একদিন উহা তাদের অসুবিধায় ফেলবে। তাদের এমন কোনও উপনিবেশ নেই যেখানে এই বাড়তি জনসংখ্যাকে তারা স্থানান্তরিত করতে পারবে। ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তারা অনায়াসে ছড়িয়ে পড়তে পারতো। অপর দিকে হিন্দুদের পক্ষে পাকিস্থান স্বীকার উত্তম হয়েছে। যারা মোস্‌লেমদের দেশ হ'তে বিতাড়িত করবার স্বপ্ন দেখে তারা বাতুল। এই যুগে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব নয় এবং উহা বাঞ্ছনীয়ও নয়। তাদের জন্য স্থান করে দিতে আমরা বাধ্য। পাকিস্থান স্বীকার দ্বারা বরং সমগ্র ভারতের উপর সমান দাবী হ'তে মোস্‌লেমদের বঞ্চিত করা সম্ভব হলো। ভুলে গেলে চলবে না আফগানিস্থানও (গান্ধার দেশ) একদিন ভারতের অংশ ছিল। দেহের পচ্যমান অংশ কর্ত্তিত করে দেওয়াই ভালো। আফগানিস্থানে আজ হিন্দু নেই। পাকিস্থানেও একদিন তাদের দেখা যাবে না। এক্ষণে এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে উত্তরকালে কোনও বিভাগের প্রশ্ন পুনরায় না উঠে। যে সকল রাষ্ট্রনায়ক মাত্র বর্ত্তমানকে প্রথম স্থান দেন এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করেন, তাঁরা ভাবীকালের দেশবাসীর নিকট অপরাধীরূপে বিবেচিত হবেন।

কেহ কেহ বলে থাকেন যে বঙ্গ বিভাগ বাঙালীদের বর্ত্তমান দুঃখ দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ। কিন্তু বাঙলা বিভাগ না হ'লে বাঙালীর দুঃখ দুর্দ্দশা চরম সীমায় উঠতো এবং 'জু' জাতির ন্যায় তাদের ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে হতো। কারণ এখানকার হিন্দুদের বিতাড়িত করে

অবশিষ্ট ভারতের সমুদয় মোস্লেম অখণ্ড বাঙলায় এসে বসবাস করতো। পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা আজ পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয় নিচ্ছে। সমগ্র বাঙলায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'লে বাঙালী মাত্রকে সিন্ধীদের ন্যায় আশ্রয় নিতে হতো ভারতের অন্যান্য প্রদেশে। বাঙালী হিন্দুর নিজস্ব বাসভূমির কোনও অস্তিত্বও থাকতো না। বিভিন্ন প্রদেশের গলগ্রহ হয়ে তাদের বসবাস করতে হতো। বস্তুতপক্ষে এই উদ্দেশ্যে বঙ্গবিভাগের পূর্ব্ব লীগ-শাসকগণ পশ্চিম বাঙলায় বিহার মুসলমানদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। সমগ্র বাঙলা, আসাম এবং পাঞ্জাব পাকিস্থানের জন্য দাবী করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অবশিষ্ট ভারত হ'তে মোসলেমদের সরিয়ে এনে ঐ সকল প্রদেশের হিন্দুদের উত্তর এবং মধ্য ভারতে বিতাড়িত করা এবং ভীষণতর প্রাদেশিক ঈর্ষার সৃষ্টি করে সমগ্র ভারতকে ধ্বংস করা।

[বাঙালীদের দুঃখ দুর্দ্দশার মূল কারণ বাঙলার আত্মধ্বংসী রাজনীতি। বাঙলার রাজনীতি ভারতের কল্যাণ করেছে, বাঙলার ক্ষতি ক'রে। ভারত বিভাগের পূর্ব্বে বাঙালী নেতাদের উচিত ছিল পৃথক স্বাধীন হিন্দু-বাঙলা দাবী করা মোস্লেম-বাঙলাকে বাদ দিয়ে এবং সমগ্র ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এতদ্বারা হিন্দু বাঙালীরা সমগ্র বাঙলার শতকরা ৫০ ভাগ বা ততোধিক ভূমি লাভ করতে সক্ষম হতো, এই অজুহাতে যে তাদের পাকিস্থান বা হিন্দুস্থান কাহারও সহিত সম্বন্ধ নেই। অতএব তাহাদের স্বাবলম্বী থাকবার উপযুক্ত পরিমাণ ভূমির প্রয়োজন আছে। এর পর স্বাধীন বাঙলা স্থাপন করার পর বাঙালীদের উচিত ছিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেওয়া। এই ভাবে তারা ব্রিটীশ রাজনৈতিকদের কূটনীতি দ্বারা পরাজিত করে আপন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালীর রাজনীতি

বাঙলার স্বার্থে কখনও প্রযুক্ত হয় নি। বাঙলা বিভাগের সময় সর্ত্ত হিসাবে আমরা প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভূমি পর্য্যন্ত দাবী করি নি। যদিও বহু লোকের ধারণা ছিল মোস্‌লেম রাষ্ট্রে অমুসলমানদের স্থান হয় নি, আজও তা হবে না। ভারতপ্রবাসী পার্শী জাতির দৃষ্টান্ত দ্বারাও এই সময় আমরা অনুপ্রেরিত হ'তে পারি নি।"

উপরের অভিমতটী আমার কোনও এক বন্ধুর। বন্ধুবরের শেষোক্ত অভিমতের সহিত আমি এক মত নই। আমি বিশ্বাস করি অন্ততঃ বাঙালী হিন্দু-মোস্‌লেমরা একত্রে আজও এক জাতির অংশরূপে বসবাস করতে পারে। বাঙালী মোস্‌লেমরা ধর্ম্মে মোস্‌লেম হ'লেও, জাতিতে তারা আজও হিন্দু। তবে সব কিছু নির্ভর করে পূর্ব্ব বাঙলার রাষ্ট্র-নায়কদের উপর। বিপরীত শিক্ষা দ্বারা মোস্‌লেম বাঙালীদের হিন্দু বাঙালীদের নিকট সরিয়ে আনা অসম্ভব নয়।]

নারী-হরণ পৃথিবীর একটী নিকৃষ্টতম অপরাধ। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা এমন এক বস্তু যে এক সম্প্রদায়ের নারী-হরণ করায় অপর সম্প্রদায়ের ব্যক্তি স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিকট বাহবা পেয়ে এসেছে। এমন কি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও কোনও নারী, নারী হয়েও তাদের ভাই এবং স্বামীদের এই সকল অপকার্য্য সমর্থন করেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভাবে তারা এই কার্য্যে সহায়তাও করেছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় এই অপরাধ প্রকটরূপ ধারণ করেছে। দলবদ্ধভাবে লুণ্ঠন, গৃহদাহ এবং হত্যার সহিত নারী ধর্ষণও সমানভাবে চলে। সৌভাগ্যের বিষয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষ আজও পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নি। যে সমাজের নারীরা এইভাবে অপহৃতা বা ধর্ষিতা হয়, তাদের উদ্ধার করে স্বগৃহে পুনঃ সংস্থাপিত করলেও মূল সমস্যার সমাধান হয় না। এতদ্বারা সমাজের নৈতিক চরিত্র ভেঙে পড়ে। একনিষ্ঠা একটী

সংস্কার মাত্র। ধর্ষণ এই সংস্কারের বিনাশ ঘটিয়ে পারিবারিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে।

এইজন্য যে প্রদেশে নারীকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না, সেই প্রদেশ বা রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে চলে আসাই সমীচীন।

অদ্য হয়তো কোনও এক গৃহের কাকীমাতা অপহৃত হ'লেন এবং পনের দিন পর তিনি ফিরে আসতে পারলেন। কল্য হয়তো ঐ গৃহের কোনও এক বোনঝি, ভাইঝি বা দেবরঝির ভাগ্যেও ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটলো। এর কয়দিন পরে তাকে হয়তো ফিরিয়েও দেওয়া হলো। অপর একদিন হয়তো পিসিমাতা অপহৃতা হয়ে ফিরে এলেন কিংবা এলেন না।

এইরূপ অপহরণ ব্যতীত দলবদ্ধ ভাবে গৃহে প্রবেশ করে মাতা-পুত্রীকে (সাম্প্রদায়িক কারণে) একত্রে ধর্ষণ করার কথাও শুনা গিয়েছে। এই সকল ঘটনা সামাজিক কারণে চেপে ফেলার রীতি আছে। ফিরে পাওয়ার পর এদের চিকিৎসা পর্য্যন্ত করানো হয় নি। এই সকল কুমারী কন্যাগণের সহিত বিবাহ আদি সম্পন্ন করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তরও থাকে না। এইভাবে সমগ্র সমাজ রোগগ্রস্ত এবং নীতিজ্ঞানহীন হয়ে পড়তেও পারে।

সকন্যা অভিভাবিকাদের একক-যৌনজ-নিগ্রহ তাদের মধ্যে এনে দেয় নৈতিক অসাড়তা (Moral weakness)। অথচ এদের পুনর্গ্রহণ করতে সমাজ বাধ্য। আখেরে উভয় বঙ্গের হিন্দুদের অবশ্যম্ভাবিত মিলন (Fusion) সমগ্র বাঙালী সমাজকে পঙ্গু করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে রাজনীতির প্রশ্ন উঠে না। ইহা সমাজ-বিজ্ঞান, দেহ-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের প্রশ্ন। সুধীজনকে বিষয়টী চিন্তা করতে অনুরোধ করি।

গত সাতশ বৎসর যাবৎ ধর্ম্মের কারণে নারীর উপর অত্যাচার ভারত ভূমিতে সমাধিত হয়েছে। এই জাতীয় ব্যাপক অপরাধ এক্ষণে অসম্ভব। পাকিস্থানেও ইহা অসম্ভব হ'লে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। দাঙ্গা মধ্যে মধ্যে হয়তো হবে কিন্তু এজন্য নারীর উপর সেখানে গণ-ধর্ষণ যেন আর না ঘটে। পূর্ব্ব বাঙ্গলার সাম্প্রতিক দাঙ্গাতে নারীর উপর ব্যাপক অত্যাচারের কথা শুনা গিয়েছে। কিন্তু আশা করা যায় ঐরূপ ঘটনা ঐ স্থানে আর কখনও সংঘটিত হবে না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে সকল সময় জনতা দ্বারা সংঘটিত হয়েছে তা নয়। বহুক্ষেত্রে মাত্র কতিপয় বিপথগামী যুবকদের দ্বারাও উহা সংঘটিত হয়েছে। শান্তিপ্রিয় শত শত ব্যক্তিকে ভয়াতুর করে দিতে মাত্র কয়েক-জন বেপরোয়া যুবকের অপকার্য্যই যথেষ্ট। আক্রান্ত ব্যক্তিদের নৈতিক বল ভেঙে পড়লে সকল সময়ই ইহা সম্ভব। উভয় বঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনা সমূহ হ'তে ইহা প্রমাণিত হয়েছে! এই শহরের যে সকল মারমুখী জনতাকে সংযুক্ত বঙ্গদেশে অপরের মনে সদা সর্ব্বদাই ভীতি সঞ্চার করতে দেখেছি, তাদেরই আমরা উত্তরকালে [সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনায়] অবস্থা বিপাকে পড়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে দেখেছি। সংশ্লিষ্ট মানুষরা রাষ্ট্র বিশেষকে নিজেদের রাষ্ট্র মনে করতে না পারলে তাদের এই বিনষ্ট নৈতিক সাহস ফিরেও আসবে না। নিজেরা আত্মরক্ষা করতে কিছুটা সক্ষম না হ'লে কোনও শাস্ত্রীদলই তাদের রক্ষা করতে পারে নি। এইরূপ অবস্থায় তাদের পর-রাষ্ট্র ত্যাগ করাই বিজ্ঞান সম্মত কার্য্য হবে।

মনোবলই মনুষ্য জাতির প্রধান বল। সদা সর্ব্বদা ভয়াতুর ভাবে বাস করলে মনুষ্য বংশের দৈহিক এবং নৈতিক অবনতি ঘটে। এবং এতদ্বারা এক ভয়াতুর, নীতিজ্ঞানহীন দুর্ব্বল সম্প্রদায়ের বা জাতির সৃষ্টি হয়।

এইরূপ সম্প্রদায় বা জাতি রাষ্ট্রের ভার স্বরূপ। যে রাষ্ট্রে মাথা উঁচু করে থাকা না যায়, সে রাষ্ট্র পরিত্যাগ করা কিংবা নিজেদের জন্য নূতনরাষ্ট্র তৈরী করে নেওয়া সর্ব্বদাই সমীচীন।

সাম্প্রদায়িক কারণে নারীর উপর অত্যাচার যে সমাজ করে সেই সমাজেরই ক্ষতি হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই অবস্থায় সমাজের যুবকদের নৈতিক অবনতি চরম সীমায় উঠে। এবং ভবিষ্যতে এই দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা তাদের নিজেদের অন্তঃপুরই প্রথম কলুষিত হয়। অত্যাচারিত সমাজ আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হয় এবং অচীরে এই অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব করে তুলে। এই অবস্থায় এই কামাতুর যুবকরা স্ব-সম্প্রদায়ের নারীদের উপরই মুহুর্মুহুঃ অত্যাচার করে সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে পঙ্গু করে তুলেছে নিজেদের বুদ্ধি-বৃত্তি এবং প্রতিভাকে।

সাম্প্রদায়িকতা এক প্রকার রোগ। জাতীয়তা-বোধ এবং সাম্প্রদায়িকতা এক বস্তু নয়। এমন কি ইহাকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা-বোধও বলা চলে না। এবং ইহা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবেও বর্ত্তায় না। বিজাতীয় ঘৃণা হ'তে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এবং ইহার মূলে থাকে ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহ।

[বিগত কলিকাতা-নিধন-দাঙ্গার সময় বহু অফিসার নিজেদের অসাম্প্রদায়িক প্রতিপন্ন করবার জন্যে স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের অনুরোধ করতো, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতে। আত্মরক্ষার্থে কি ভাবে সাম্প্রদায়িক বোধকে ব্যবহার করা হতো তা নিম্নের বিবৃতি হ'তে বুঝা যাবে।

"বারে বারে অনুরোধ করেও পাড়ায় পাহারার বন্দোবস্ত হলো না। প্রতিবারেই আমাদের জানানো হতো যে গোলমালের সম্ভাবনা নেই। এই অবস্থায় পাড়ায় পটকা ফাটিয়ে আমরা মিথ্যা করে বলি যে আমাদের

পাড়া আক্রান্ত হয়েছে। এর পরদিন হ'তে আমাদের পাড়ায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। 'মোসলেম অফিসারদের আমরা বলতাম যে আমাদের পাড়ার যুবকরা কল্য ওপারের মোসলেম বস্তী আক্রমণ করবে, মোসলেমদের রক্ষার জন্য যেন অচীরে উভয় পল্লীর মধ্যে রক্ষী দল মোতায়েন করা হয়।' আসলে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, 'হিন্দু-পাড়া রক্ষার জন্য পুলিশ আনানো।"

বহু শান্ত্রী-প্রধান শাসনতান্ত্রিক কারণে স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ধৃত করে পথে আত্মরক্ষার্থে তাদের উপরই নির্ভরশীল হতেন। কোনও এক শান্ত্রী-প্রধান কোনও এক ঘটনার পর স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে থানায় পাঠান, এদের মধ্যে কেউ অপরাধী নেই তা জেনেও। এইরূপ গ্রেপ্তারকে বলা হয় শিক্ষামূলক বা শাসন-তান্ত্রিক। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ঐ সম্প্রদায়ের দোষী ব্যক্তিদের হুসিয়ার করা। স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিগৃহীত হ'তে দেখে এরা ঐ কার্য্য যাতে আর না করে, এইজন্যই এইরূপ ধরপাকড়ের রীতি আছে। এদের থানায় আনার পর একজন এসে অনুরোধ করলো, 'একজনের মা কাঁদছে তাকে বদলে নিয়ে যাবো, স্যার? আপনার দরকার তো এপাড়া হতে কুড়িজন।' শান্ত্রী-পুঙ্গবকে এই অদ্ভুত প্রস্তাবে একটুও বিরক্ত হতে দেখিনি। ঐ ব্যক্তির স্থলে নূতন এক ব্যক্তিকে এনে সংখ্যা ভর্ত্তি করা হয়েছিল।

এই দাঙ্গার সময় বহু দাঙ্গা-সাহিত্যেরও সৃষ্টি হচ্ছিল। হাজত ঘরের দেওয়ালে এইরূপ বহু কবিতা, গান এবং গাথা, ইঁটের বা কয়লায় টুকরা দিয়ে কয়েদীরা লিখে রাখতো, যথা, "তিন পাকোড়ী তেল মে অমুক বেটা জেলমে।" "এক ধোপীকে এক লুগাই থে। লুগাই বোলা কাঁহা গিয়া থে? অমুক···মর গ'য়া রোনে গিয়ে থে, ইত্যাদি।" এই গান

এবং গাথা হ'তে বুঝা যেতো যে ঐ হাজতে কোন্ সম্প্রদায়ের ব্যক্তির আধিক্য ছিল। আহত নগরীর মর্ম্মকথা এই গান ও গাথার প্রতি ছত্রে ফুটে উঠতো।]

বাঙলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষতিকররূপে প্রতীত হয়েছে। কারণ যোদ্ধগণ নিয়মতান্ত্রিক হয়ে থাকে এবং যোদ্ধদলে সমাজের উৎকৃষ্টতম এবং আদর্শপূর্ণ যুবকরা ভর্ত্তি হয়। অপর দিকে দাঙ্গায় আক্রমণকারীরা অপরাধপ্রবণ এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষ হয়ে থাকে।

দাঙ্গা-উত্তর কালে পুনর্বসতি সমস্যা প্রকটরূপে দেখা যায়। বহু-ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মনস্তাত্বিক কারণে পুনর্বসতি সম্ভব হয় নি। কলিকাতা দাঙ্গান্তে দেখা গিয়েছে, যে পরিত্যক্ত হিন্দু গৃহ বা পল্লী নবাগত হিন্দু দ্বারা অধিকৃত হয়েছে, কিন্তু বিতাড়িত হিন্দুরা ঐ গৃহে বা স্থানে ফিরে আসে নি। নিম্নের বিবৃতি হ'তে আমার বক্তব্য বিষয়টী সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আপনারা বলছেন কি? যে গৃহে চক্ষের সামনে আমায় পতিপুত্র নিহত হলো, সেই গৃহে আমি কি করে ফিরবো। ঐ দিনকার বীভৎস দৃশ্য মনে পড়লে আজও আমি শিউরে উঠি। ঐ গৃহে আমার কন্যার উপরও অত্যাচার হয়েছে। কন্যা সম্বন্ধে সামান্য বদনাম রটলে মানুষ পাড়া ত্যাগ করে চলে আসে। এই ঘটনার পর আমাদের নিকট ঐ ঘরগুলো বিষতুল্য। আমাদের উপর যারা অত্যাচার করেছে তারা আজও ঐ পল্লীতে বাস করে। প্রত্যুষে তাদের কারো কারো সঙ্গে দেখাও হবে। সেখানে এইজন্যে ফিরে যেতে আমাদের আত্মসম্মানে বাধে। প্রমাণের অভাবে আপনারা তাদের সাজা দিতে পারেন নি? কিন্তু আপনাদের ঐ যুক্তি কি আমাদের প্রতিহিংসা বৃত্তি বা মনের গ্লানি

দূর করবে? এর চেয়েও বরং দূরে এসে পুরানো কথা ভুলে যেতে দিন। আমাদের মনে করতে দিন ওটা ছিল একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। এইভাবে আপনারা আমাদের অসাম্প্রদায়িক রাখতে সক্ষম হবেন।"

সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত স্থানে পুনর্বসতির অপর এক কারণ, ভীতি। যে অপকার্য্য একবার করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট জনগণের দ্বারা উহা পুনরায় যে করা হবে না তার নিশ্চয়তা কি? অপরদলের করুণাপ্রার্থীরূপে বসবাস করার মধ্যে গ্লানি আছে। 'অপরদল আমাদের রক্ষক' এ চিন্তা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, আখেরে ইহা মানুষকে দুর্ব্বল করে। আত্ম-বিশ্বাসের অভাব মানুষকে ক্লীবে পরিণত করে। এইরূপ পরিস্থিতিতে এক ভয়াতুর আত্মবিশ্বাসহীন মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। সমাজ বা দেশের পক্ষে ইহারা ক্ষতিকর এবং ভার বিশেষ হয়। ভিন্নরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি সম্ভব না হ'লে মানুষের উচিত ঐ স্থান ত্বরায় পরিত্যাগ করে এমন স্থানে বসবাস করা যেখানে তারা পূর্ব্বের ন্যায় আপন গৌরবে বাস করতে পারবে। এই 'সরে আসা বা চলে আসার' মধ্যে কোনও গ্লানি নেই বরং যুক্তি আছে, সার্থকতাও।

স্বাধীনতাকামী একদল রাজপুত একদা রাজস্থান ত্যাগ করে নেপালে রাজ্যস্থাপন করেছিল। আজ তারা রাজপুত অপেক্ষাও এক দুর্দ্ধর্ষ গুর্খা জাতির সৃষ্টি করেছে। একদিন সুন্দরবনে ছিল বিত্তশালী সমৃদ্ধ জনপদ সমূহ। কিন্তু জলদস্যুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে* তারা দেশের অভ্যন্তরে সরে এসেছিল এবং পরে শক্তিসঞ্চয় করে ঐ দস্যুদের উপকূল হ'তে বিতাড়িতও করেছিল। নিশ্চিতরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে

* পর্ত্তুগীজ জল-দস্যুরা এই সময় বাঙালী কন্যাদের অপহরণ করে সূচী দ্বারা তাদের হাত ফুটা করে হাতের চেটোগুলির মধ্যে দড়ি পুরে একত্রে তাদের জাহাজের পাটাতনে বিক্রয়ার্থে মজুত রাখতো।

সরে এসে শক্তি-সঞ্চয় করার প্রয়োজন আছে। জীবন-যুদ্ধের ইহা এক উৎকৃষ্টতম কৌশল মাত্র।

পুনর্বসতি সম্বন্ধীয় পরিকল্পনাসমূহ সমাজ-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত হওয়া উচিত। বাঙলার গ্রাম সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে প্রতিটী গ্রাম চাষী এবং ভদ্রশ্রেণীর সম্মিলিত বাসভূমি। কয় ঘর ব্রাহ্মণ, কয় ঘর কায়স্থ, কয় ঘর ধোপা এবং নাপিত, চাষী, মজুর প্রভৃতি সেখানে একত্রে বাস করে। এই মিশ্র গ্রাম সমূহ বাঙলার প্রাণকেন্দ্র। কোনও স্থানে কেবলমাত্র চাষী বা মজুরকে প্রেরণ করার অর্থ সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া। নিম্নে এক চাষীর বিবৃতি হ'তে বিষয়টী সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"বাবু, আপনারা আমাদের কোথায় পাঠাচ্ছেন? আপনারা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না কেন। ভদ্রলোক ভিন্ন আমরা কোথাও কি বাস করেছি? কে আমাদের বিবাদ মীমাংসা করে দেবে। কে আমাদের হয়ে কথা বলবে এবং দরখাস্ত লিখে দেবে? আমাদের বড় ভয় করছে বাবু। আপনাদের বুদ্ধি ছাড়া আমরা যে কখনও চলি নি।"

বস্তুতঃপক্ষে অন্ততঃ কয়েক ঘর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এদের সঙ্গে না পাঠালে এদের নৈতিক-শক্তি ভেঙে পড়বে। সম্ভব হ'লে একটী পুরা গ্রামের লোকের জন্য নূতন এক গ্রাম পত্তন করা উচিত। এতদ্বারা পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা এবং শাসন অক্ষুণ্ণ থাকে। নীড়হারা ছন্নছাড়া মানুষ স্বভাবতঃই অপরাধপ্রবণ হয়ে থাকে। কিন্তু উপরোক্ত ব্যবস্থা এদের ঐতিহ্য রক্ষা করে এবং এরা পূর্ব্বের ন্যায়ই সৎ এবং সতী থাকে।

[বিগত দাঙ্গায় দেখা গিয়েছে যে বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে সট্‌গান আত্মরক্ষার্থে অধিক উপযোগী। ছর্‌রা সমুহ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ায়, দাঙ্গাকারীরা প্রত্যেকেই আহত হয়। কিন্তু রাইফেলের গুলিতে মাত্র

একজন নিহত বা আহত হয়েছে। জনতা বিতাড়ন করতে হ'লে সট্-গান ব্যবহারই প্রকৃষ্ট পন্থা।]

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মাত্র একই সমাজের দুইটি বিচ্ছিন্নাংশের মধ্যে সম্ভব। "আমি ঐ সমাজের কেহ নই," জোর করে তা চিন্তা করলে, এইরূপ মনোবিকার সম্ভব। ইতিহাস অস্বীকার করে জোর করে নিজেদের ভিন্‌জাতীয় মনে করলে অবনমন চিন্তা বা ধারণা (Inferior-complexity) মনে আসে। আমি হিন্দু এবং তুমি মুসলমান, কিন্তু আমাদের উভয়ের কিংম্বা মাত্র তোমার একজন হিন্দু পূর্ব্বপুরুষ হয়তো এমন একজন ছিলেন যাঁর জন্যে হিন্দু মাত্র আজও গর্ব্বানুভব করে। এক দলের গর্ব্ব করবার অনেক কিছুই আছে কিন্তু অপরদলের ইতিহাস নাই। একই জাতি হ'তে উদ্ভূত হ'লেও তারা পূর্ব্বপুরুষের গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হ'তে অপারক। এইজন্য নিরুপায় হয়ে বিজেতা এক বিদেশী জাতির পূর্ব্বপুরুষদের গুণাগুণের প্রতি তাদের আকৃষ্ট হ'তে হয়। সেইজন্য তাদের প্রতিবেশীদের ঘৃণাব্যঞ্জক ব্যবহারই অধিক দায়ী। এ ছাড়া আমরা দেখি হিন্দুরা মোসলেমদের ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু মানুষগুলোকে ঘৃণা করে এবং মুসলমানরা হিন্দুদের ধর্ম্মকে ঘৃণা করে, কিন্তু তারা মানুষ হিসাবে তাদের শ্রদ্ধা করে। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের অভাবের কারণে সাম্প্রদায়িক হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা স্থান পেয়েছে। এই ঘৃণা সময়ে সময়ে কিরূপ নিষ্ঠুর হয়ে উঠে তা নিম্নের বিবৃতি হ'তে বুঝা যাবে।

"সহসা দেখলাম, হৈ হৈ করতে করতে দা কুড়ুল এবং লেজা হাতে দলে দলে লোক আমাদের গ্রাম আক্রমণ করলো। পুরুষদের নির্দ্দেশে আমরা অমুকবাবুর কোঠা বাড়ীতে আশ্রয় নিই। সর্ব্বশুদ্ধ আমরা ৩০ জন নারী ঐ স্থানে ছিলাম। দুর্ব্বৃত্তরা বন্ধ দরজাগুলি ভেঙে ফেললে আমরা

রাত্রের অন্ধকারে পিছনের দরজা খুলে জঙ্গলে আশ্রয় নিই। দুর্ব্বৃত্তরা টর্চ্চ-বাতির সাহায্য একে একে আমাদের সকলকেই কাহার হাত কাহারও বা চুল ধরে ঐ বাড়ীতেই ফিরিয়ে আনে। এরপর ছুরি উঁচিয়ে একে একে সকলকেই জিজ্ঞাসা করে, 'নিকে করবি না মরবি।' ছেলে-মানুষ মেয়েরা কাঁপতে কাঁপতে উত্তর করলো, 'হাঁ নিকে করবো।' এরপর তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুই কি করবি?' উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'আমার বয়স ৫০ হবে। আমার স্বামী এবং ছয় পুত্র বর্ত্তমান। তোমাদের যদি প্রবৃত্তি হয় তো তা'ই করো, কিন্তু প্রাণটা আমার রক্ষা করো।' দুই একজন ছোকরা দুর্ব্বৃত্ত বেছে বেছে কয়েকজন মেয়েকে বাইরে টেনে নিতে চাইলো, কিন্তু বয়স্ক দুর্ব্বৃত্তরা তাদের নিবৃত্ত করে বললো, 'ছেড়ে দে এদের। আজ এরা এখানেই থাক। কাল ওদের ধর্ম্মান্তরিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।' এরপর ওরা আমাদের দেহ হ'তে মাত্র গহনাগুলি খুলে নিয়ে চলে গেলে। আমরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সহরে চলে আসি। পরের দিন ওখানকার কয়েকজন জননেতা আমাদের সঙ্গে করে ঐ গ্রামে ফিরে আসে এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকদের ভৎর্সনা করে বলে, 'তোমরা কি আমাদের নয়া রাষ্ট্রের ধ্বংস চাও ইত্যাদি।' ভালোরূপে বুঝানোর ফলে তারা প্রকৃতিস্থ হয় এবং অনুতপ্তও হয়। এরপর এদের কেহ কেহ আমাদের অপহৃত অলঙ্কারাদিও ফিরিয়ে দিয়ে যায়।"

এই সম্বন্ধে অপর আর একটী ঘটনামূলক মর্ম্মান্তিক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"উপরে উঠে এসেই ওরা আমার স্বামীর বুকে ছোরা বসিয়ে দিলে। আমি বুদ্ধি করে চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিই এবং তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলি, 'যাঃ সব শেষ হয়ে গেল।' প্রকৃতপক্ষে আমার স্বামী

তখনও জীবিত ছিলেন। আমি তার কানে কানে বলি, 'চুপ করে শুয়ে থেকো কথা ক'য়ো না।' এরপর দুর্ব্বৃত্তরা আমাকে এবং পছন্দ মত আরও কয়জন মেয়েকে নীচে এনে সার দিয়ে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কি নিকে করবি।' এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার পূর্ব্বে আমরা পরিলক্ষ্য করিনি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমরা উত্তর করি, 'হাঁ করবো।' ইতিমধ্যে ওপরের লুঠপাঠ সেরে বহু লোক নীচে নেমে আসে। এদের কয়েকজন দয়াপরবশ হয়ে বলে, 'কি করছো, ছেড়ে দাও ওদের। আমাদেরও মা বোন আছে।' তারা আমাদের অভয় দিয়ে বলে, 'যা পালা সব।' এরপর আমরা দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ি। ইতিমধ্যে পুলিশও এসে যায় এবং আমরা রক্ষা পাই। উপরে এসে দেখি আমার স্বামী তখনও পর্য্যন্ত বেঁচে আছেন।"

শোনা গিয়েছে, এই দাঙ্গায় পরিচিত এবং উপকারী বন্ধুরাও রেহাই পায়নি। এর কারণ দুর্ব্বৃত্তদের ধারণা হয়েছিল একদিনেই বিরুদ্ধ সম্প্রদায়কে নিঃশেষ করা সম্ভব। এবং প্রত্যুষে তাদের নিকট মুখ দেখানোর প্রয়োজন হবে না। নির্ব্বিচারেপুরুষ হত্যা এবং নারী নির্য্যাতন এরা দেশপ্রেম এবং ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করেছে। এর একমাত্র কারণ ধর্ম্মের ভুল ব্যাখ্যা। এই অসভ্যতা হ'তে পরিত্রাণ পেতে হ'লে প্রয়োজন, ধর্ম্ম উঠিয়ে দেওয়া কিংবা ধর্ম্ম ভালো রূপে শিক্ষা দেওয়া, কিংবা ধর্ম্মের ভুল ব্যাখ্যাকারীদের শাস্তি দেওয়া।

এক ধর্ম্মাবলম্বীদের অপর ধর্ম্ম অবলম্বনে বাধ্য করা কখনও সুখকর নয়। যদি কোনও মানুষকে জোর করে কোনও ধর্ম্মাবলম্বনে বাধ্য করা হয় তা'হলে কয়েক পুরুষ বাদেও জোর করে তাদের পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। এর কারণ তাদের রক্ত-মাংসে পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্ম এবং সংস্কার প্রবাহিত থাকে। জাপানের 'রিভাইবেল অব্ বুদ্ধইজম্'

এবং স্পেনের 'ক্রীশ্চান ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন' ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু যারা কোনও ধর্ম্ম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, তারা কোনও পুরুষে সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না। এই ধরণের ব্যক্তিগণ নাস্তিক হ'তে পারে, কিংবা নূতন কোন ধর্ম্মের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তাদের জোর করে অন্য কোনও ধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত করা কষ্ট-সাধ্য হয়। এ ছাড়া এ'ও দেখা গিয়েছে, যারা একবার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেছে, তাদের দ্বিতীয়বার ধর্ম্ম ত্যাগ করতে বাধে নি।

ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষ হ'তে ধর্ম্মকে বিদায় দেওয়া অসম্ভব। উভয় ধর্ম্মের মাঝামাঝি কোনও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনও নিরর্থক। এতদ্বারা একটী তৃতীয় ধর্ম্মের সৃষ্টি করা হয় মাত্র। এক্ষণে একমাত্র উপায় যুগধর্ম্মের সৃষ্টি করা এবং প্রতিটী ধর্ম্ম প্রত্যেককেই জানতে বাধ্য করা। তুলনা-মূলকভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা দ্বারা ইহা সম্ভব। ছাত্রদের "কম্প্যারাটেভ্ ষ্টাডি অব রিলিজন্ সাবজেক্ট্" অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। এইজন্য প্রত্যেক ধর্ম্মের সার সঙ্কলন করে মাত্র একটী পুস্তক প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এক এক ধর্ম্মের কথা এক একটী পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, শিখ, জৈন, হিব্রু, খৃষ্ট, কনফুসিয়াস্ প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম্মমত এতে স্থান পাবে। তবে ইহা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে রচনা করা চাই। শুনা গিয়েছে যে বিবেকানন্দের এইরূপ এক পরিকল্পনা ছিল। তিনি এমন একটী মন্দির নির্ম্মাণ করতে চেয়েছিলেন যাতে একদিকে থাকবে মোসলেম স্থাপত্য, একদিকে থাকবে হিন্দু স্থাপত্য, একদিকে থাকবে খৃষ্টান স্থাপত্য এবং একদিকে থাকবে বৌদ্ধ স্থাপত্য। মসজিদ, গির্জ্জা, মঠ এবং মন্দিরের সম্মেলনে এই উপাসনা গৃহ নির্ম্মিত হবে। ইহার মধ্যকার ঘরে থাকবে একটী বিরাট "রিভলবিং বুক কেস"। এবং ইহার মধ্যে ন্যস্ত থাকবে বিভিন্ন ধর্ম্ম গ্রন্থ সমূহ। বিজ্ঞানের

ছাত্রগণ যেমন কেমিষ্ট্রি, ফিসিক্স, বোটানি, জুলোজি প্রভৃতি সমভাবেই পাঠ করে, কিংবা একই শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতামত সাগ্রহে বিচার করে এবং মনে রাখে, অনুরূপভাবে মানুষ মাত্রের নিকট পৃথিবীর প্রতিটী ধর্ম্মমত অবশ্য পাঠ্য ও আদরণীয় হওয়া উচিত হবে। অমুক বৈজ্ঞানিক বিদেশে জন্মেছে বলে যে তার মতবাদ গ্রাহ্য হবে না তা বাতুলেও বলে না, বরং আদর করে তা তারা নিশ্চয়ই বুঝতে চেষ্টা করবে। ধর্ম্ম প্রচারক বিদেশীই হোন স্বদেশীই হোন, বৈজ্ঞানিকদের ন্যায় তারা তাদের মতবাদ সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য প্রচার করেছিলেন। উহা কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের একচেটীয়া মতবাদ হ'তে পারে না। ভুলে গেলে চলবে না যে ধর্ম্ম-প্রচারকরা নিজেদের মধ্যে কখনও এইরূপ বাদবিসংবাদের প্রশ্রয় দেননি। সমসাময়িক ধর্ম্ম-প্রচারকদের জীবন ইতিহাস হ'তে ইহা বুঝা যাবে।

অপরাধ—গুণ্ডামী

গুণ্ডামী একটী সনাতন অপরাধ। সাধারণ মানুষের ধারণা গুণ্ডাগণ দৈহিক বলে সর্ব্বদাই বলীয়ান, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়। বহু ক্ষেত্রে প্যাঙলা চেহারার ব্যক্তিদেরও গুণ্ডারূপে দেখা গিয়েছে। এদের সকলেই যে সাহসী হয়ে থাকে তা'ও নয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিদের উপর এরা অত্যাচার করতে সাহসী হ'লেও প্রবল প্রতিপক্ষীয়দের নিকট এরা মাথা নীচু করেছে। আদর্শহীন গুণ্ডাদের সম্বন্ধে ইহা সকল সময়েই প্রযোজ্য। আদর্শপূর্ণ গুণ্ডাদের কিন্তু পৃথক প্রকৃতির দেখা যায়। প্রকৃত গুণ্ডাগণ বেপরোয়া পেশীবহুল সাহসী এবং দাম্ভিক হয়ে থাকে।

আদর্শবিহীন গুণ্ডাদের মনোবল সহজে ভেঙে দেওয়া যায়। এই অবস্থায় এরা মেষের ন্যায় বাধ্য হয়ে উঠে। সাহাস করে এদের সম্মুখীন হ'লে এরা ভয় পেয়ে পলায়ন করে। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টী বুঝা যাবে।

"এইদিন আমি বাষ্পযান যোগে অমুক স্থানে যাচ্ছিলাম। ট্রেনের কামরাগুলিতে তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। কিন্তু পূর্ব্বাহ্ণে উপস্থিত হওয়ায় একটি ঝুলানো বেড (Hanging bed) আমি দখল করে শুয়েছিলাম। এই ঝুলানো বেডটীর নিম্নের সমগ্র বেঞ্চিটা অধিকার করে একজন দেশবালী পালোয়ান পূর্ব্ব হ'তে শুয়ে ছিল। নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বে আগমন করে এই সুবিধা আমরা লাভ করেছিলাম। ইতিমধ্যে বহু বাঙালী পরিবার ঠেসাঠেসি করে এখানে ওখানে বসে পড়েছেন। সকলের ভাগ্যে বসবার সৌভাগ্যও হয় নি। তাঁদের অনেক দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। কেহ কেহ লগেজ-গুলির উপর উপবেশন করে ক্লান্তি দূর করেছেন। কিন্তু এতো অসুবিধা সত্ত্বেও কেহ তাকে উঠে বসতে বলতে সাহসী হ'লেন না। এই সময় অপর আর এক পরিবার ঐ গাড়ীতে উঠলেন। এঁদের সঙ্গে একজন যুবক ছিল। যুবকটী দেশবালীর অঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, 'এই শোতা কাহে। উঠকে বৈঠো।'—'কাহে?' পালোয়ান বলল, 'হাম পয়লি আয়া। নেহি উঠেঙ্গা।'—'কেয়া? নেহি উঠেগা?' উত্তরে যুবকটী বললে, 'নেহি উঠেগা তো জবরদস্তীতে উঠায় দেগা।' যুবকের কথায় দেশবালী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। উঠে বসে সে গালিগালাজ সুরু করে দিলে, 'তেরি উল্লুকা, তেরি মাফিক ইত্যাদি।' বাষ্পযান ইতিমধ্যে ষ্টেশন ছেড়ে বহু দূর এসেছে। এ ছাড়া লোকটী যে নামকরা গুণ্ডা তা তার চেহারা হ'তেই বুঝা যায়। তার পক্ষে যাত্রীদের উপর হামলা সুরু

করাও অসম্ভব ছিল না। বেগতিক বুঝে অন্যান্য যাত্রীরা যুবককে নিরস্ত হ'তে অনুরোধ জানিয়ে বললো, 'সঙ্গে মেয়ে ছেলে রয়েছে, গোলমাল করবেন না।' ঐ দিন ঐ গাড়ীতে বহু যাত্রী ছিল, কিন্তু কেহই যুবককে সাহায্য করলো না। বাধ্য হয়ে যুবক মেঝের উপর স্বজন সহ সতরঞ্চি পেতে বসে পড়লো। যুবকটী নিরস্ত হ'লেও পালোয়ানের রাগ কমলো না। সে অনর্গল গাল পেড়ে চলেছে। পরিশেষে আমারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। আমি ঝুলানো বেডের শিকল ধরে বসে নীচের অবস্থাটা বুঝে নিচ্ছিলাম। মনে হ'লো লোকটাকে দিই এক ঘা বসিয়ে, কিন্তু তার ইয়া গর্দ্দান ও বুকের ছাতি আমাকে ভীত করে তুললে। তার উরুদেশটীও আমার দেহাপেক্ষা স্থূল ছিল। দুই একজনকে সে অনায়াসে বাইরে ফেলে দিতে পারে। অগত্যা আমি মনে মনে বললাম, 'যা বেটা তোকে ক্ষমা করে দিলাম।' ক্ষুণ্ণ মনে পুনরায় শুয়ে পড়ছিলাম সহসা শিকল ফসকে আমি নীচে পড়ে গেলাম। গুণ্ডা লোকটি হেঁট হয়ে বেঞ্চির উপর বসে গজরাচ্ছিল। আমি বসা অবস্থাতে তার গর্দ্দানের উপর পড়ে গেলাম। উঁচু হ'তে পড়ায় পড়ার গতি বেশী ছিল। আমার ভার সহ্য করতে না পেরে লোকটা হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়লো। লোকটার ঘাড়ের উপর বসে পড়ায় আমার আঘাত লাগেনি। কিন্তু গুণ্ডা লোকটীর খুব বেশী আঘাত লেগেছিল। আমি সভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম যে আমার অদৃষ্টে কি হবে? সহসা শুনলাম যে লোকটা কাতরাতে কাতরাতে বলছে, 'বাবু আপ বিচার কিয়া নেহি, হামকো মারা।' লোকটা ভেবেছিল আমি পড়ে যাই নি। তাকে আমি মেরেছি। বুঝলাম গুণ্ডা লোকটা ভয় পেয়ে গিয়েছে। আর যায় কোথায়? ঘুঁসি বাগিয়ে তাড়া করে প্রত্যুত্তর করলাম, 'মারেগা নেহি? ফিন্ মারেগা, উল্লুক কাঁহাকো।

জানতা হায় হাম কোন হ্যায় ? জানানা লোককো সামনে উল্টা পাল্টা বাত করতা। পাকড়াকে বাহার মে ফেক দেগা।' আমার হুঙ্কারে লোকটা আরও ভীত হয়ে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাচ্ছিল। তাকে চুলে ধরে উঠিয়ে আমি মেঝের উপর বসিয়ে দিলাম। উপস্থিত নরনারী বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে ছিলেন। প্রকৃত ব্যাপার এদের কেহ অনুধাবন করতে পারেন নি। এদের একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি স্যার একজন বক্সার ?' গুণ্ডা-পরিত্যক্ত বেঞ্চিটায় মহিলাদের জন্যে স্থান করে দিয়ে সগৌরবে উত্তর করলাম, 'আজ্ঞে হাঁ।"

গুণ্ডাগণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) আদর্শহীন, (২) আদর্শপূর্ণ এবং (৩) মিশ্র আদর্শ, অর্থাৎ যাদের মধ্যে কিছুটা আদর্শও দেখা গিয়েছে।

সহরাঞ্চলেই গুণ্ডাদের প্রাদুর্ভাব বেশী। সহরের প্রতিটী পল্লীতে এদের বসবাস। এরা সাধারণতঃ কর্ম্মালস হয়ে থাকে অর্থাৎ পেশা হিসাবে কোনও চাকরী বা ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করতে এরা সর্ব্বদা অনিচ্ছুক। এদের অনেকে গুণ্ডামীকেই পেশারূপে গ্রহণ করেছে।

আদর্শপূর্ণ গুণ্ডাগণ প্রায়শঃই অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হয় না। নিজ হস্তে আইন গ্রহণ করার জন্যেই তারা অপরাধী। এরা স্থূল বুদ্ধি, শক্তিমান এবং ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। প্রবলের অত্যাচার হ'তে দুর্ব্বলকে রক্ষা করার মধ্যে এরা এক অপূর্ব্ব পুলক অনুভব করে। কিন্তু বিচার বুদ্ধি কম থাকায় বহুক্ষেত্রে বিচারের নামে এরা অবিচারও করেছে। বহুক্ষেত্রে এরা যে সুবিচারও না করেছে তা'ও নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করায় এদের আমরা প্রশংসা করি নি। বহু ধনী দুর্ব্বৃত্ত আছে যারা প্রতিপত্তি এবং অর্থের কারণে রাজকীয় শাস্তি হ'তে অব্যাহতি পেয়েছে, কিন্তু আদর্শপূর্ণ

বেপরোয়া পল্লী যুবকদের নিকট নিস্তার পায় নি। এই সকল গুণ্ডাদের উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করাও সম্ভব হয় নি। আপন আপন বিশ্বাস মত অপরাধীকে শাস্তি দিতে এরা সর্ব্বদাই এগিয়ে এসেছে। এদের এবংবিধ কার্য্যসমূহ রাষ্ট্র-বিরোধী হ'লেও উহা সমাজ-বিরোধী কি'না সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে এমন বহু অপরাধ আছে যা রাষ্ট্র ইচ্ছা সত্ত্বেও নানা কারণে প্রতিরোধ করে না বা তা করতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল অপরাধ প্রতিরোধার্থে জনতাকে এগিয়ে আসতে হয়। 'সাধারণ ভাষায় ইহাকে বলা হয় "গণ-গুণ্ডামী"। বহু ক্ষেত্রে অর্থ ও লোকবলের জন্য কিংবা বিচার-বিভ্রাটের কারণে অত্যাচারী ব্যক্তি আদালত হ'তে মুক্তি পেলেও এই সকল গণ-গুণ্ডাদের নিপীড়ন হ'তে প্রায়ই মুক্তি পায় নি।

এই গণ-গুণ্ডামীর সহিত একক গুণ্ডামী এবং দলীয় গুণ্ডামীর প্রভেদ আছে। গণ-গুণ্ডামীর সহিত স্বার্থের সম্বন্ধ নেই, কিন্তু একক বা দলীয় গুণ্ডামীর সহিত স্বার্থের সম্বন্ধ আছে। গণ-গুণ্ডামী আকস্মিক ভাবে আদর্শ প্রণোদিত জনতা দ্বারা সংঘটিত হয়। রাষ্ট্র উহা প্রতিরোধ করলে আখেরে জনতার মতে মত প্রদান করে গণ-বিক্ষোভের মূল কারণ দূরীভূত করে। অপরদিকে একক বা দলীয় গুণ্ডামী সুচিন্তিত ভাবে স্বার্থের কারণে কৃত হয়েছে। রাষ্ট্র এদের দমন করে এদের সকল উদ্দেশ্য পণ্ড করতে সকল সময়ই বদ্ধপরিকর।

আদর্শহীন এবং আদর্শপূর্ণ গুণ্ডাদের কথা বলা হলো। এইবার কথঞ্চিৎ আদর্শ যুক্ত মিশ্র গুণ্ডাদল সম্বন্ধে বলবো।

প্রতি পল্লীতে এমন বহু বালক আছে যারা গুণ্ডামী না করে থাকতে পারে না। তাদের অন্তর্নিহিত স্পৃহা তাদের একটী না একটী বল-প্রয়োগের কার্য্যে লিপ্ত করবেই। রাজনৈতিক দল এই সকল দাঙ্গা-

প্রিয় বালকদের আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রায়ই নিয়োগ করেছে। এদের নিজস্ব কোনও রাজনৈতিক মতবাদের বালাই নেই। যে কোনও রাজনৈতিক দল অর্থের বিনিময়ে এদের নিয়োগ করতে সক্ষম। সকল সময় যে এরা অর্থের বিনিময়ে কাজ করে তা'ও নয়। বহুক্ষেত্রে এরা নিছক গুণ্ডামীর কারণেই গুণ্ডামী করে থাকে। একটা কিছু বাদবিসংবাদ না করতে পারলে এরা তৃপ্তি পায় না। এইজন্য একদল রাজনৈতিক দল তাদের সাহায্য না চাইলে তারা স্বেচ্ছায় অপর দলে যোগ দিয়ে থাকে। যে দলটীর অধিকারে গভর্ণমেণ্ট আছে সেই দলেই যোগ দিতে এরা আগ্রহশীল থাকে, কিন্তু শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত থাকায় সরকারী দল প্রায়শঃক্ষেত্রে তাদের সাহায্য গ্রহণ করে নি। এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ এরা বিরোধীদের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে।

[বাংলাদেশে ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের সময় বহু পিতামাতা পেটের জ্বালায় কিংবা অন্যান্য কারণে আপন আপন শিশু সন্তানদের বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এই সময় কয়েকজন মিশনারী সাহেব এই সকল বাঙালী শিশুদের সংগ্রহ করে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিক্রয় করেছিল। বহু বাড়ীর ও দোকানের ফরাসী মালিক এদের বয় বা পেজ্ রূপে নিয়োগ ক'রে ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিকে এদেরই নেতৃত্বে ষ্ট্রীট্ আর্চিনরা প্যারিসে নাশকতা কার্য্য প্রথম শুরু করেছিল।]

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে পৃথিবীতে বড় বড় গণ-বিক্ষোভ বা বিপ্লব প্রারম্ভে এই সকল অর্ব্বাচীন বালক এবং যুবকগণের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। তবে নিছক রাজনৈতিক গুণ্ডা দলের যে অস্তিত্ব নেই তা'ও নয়। নিছক রাজনৈতিক গুণ্ডাদল দলীয় আদর্শ সকল সময়ই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। জনমত সংগ্রহ অপেক্ষা দৈহিক বলের উপর

এরা অধিক আস্থাবান থাকে। এইজন্য এদের "রাজনৈতিক গুণ্ডা" আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই সকল দলকে ভাড়াটীয়া গুণ্ডাদের সাহায্যে বিপক্ষ-পক্ষীয় রাজনৈতিক সভাগুলি প্রায়ই আমরা পণ্ড করতে দেখেছি। ভোট-যুদ্ধের সময় এরা অত্যন্তরূপ কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠে বল-প্রয়োগ দ্বারা কার্য্য হাসিল করতে প্রয়াস পায়।

উপরি উক্ত গৃহস্থ গুণ্ডাদের ন্যায় গুণ্ডা-অপরাধীদের সংখ্যাও বড় বড় শহরসমূহে ন্যূন নহে। গৃহস্থ গুণ্ডাগণ খুন-খারাপি বা বড় বড় রাহাজানিকে ভয় করে, কিন্তু পেশাদারী বা গুণ্ডা-অপরাধিগণ সামান্য কারণেও খুন-খারাপিতে পেছপাও হয় নি। বড বড় শহরে বিশেষ গুণ্ডা-আইন দ্বারা এদের দমন করা সম্ভব হয়েছে। এদের দাপট বা প্রতিপত্তি এমনিই যে প্রকাশ্য আদালতে তাদের বিরুদ্ধে কেহ সাক্ষ্য দিতে সাহসী হয় না। বিশেষ গুণ্ডা আইনে আসামীর অসাক্ষাতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট তাদের নাম ধাম বা ঠিকানা প্রকাশ করার রীতি নেই।

দক্ষ চিকিৎসকের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেমন প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তেমনি পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আশু সাহায্যেরও প্রয়োজন আছে। বিপদকালে আশু সাহায্যের জন্য জনসাধারণের সাহসী অংশ সর্ব্বদাই এগিয়ে এসেছে। প্রতিটি স্থান, প্রতিটী বাটী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য পুলিশের পাহারাধীন রাখা সম্ভব নয়। পুলিশবাহিনী বিশেষ বিশেষ ঘাঁটীতে অবস্থান করে এবং সংবাদ পাওয়া মাত্র অকুস্থলে এসে হাজির হয়। কিন্তু অকুস্থলে পুলিশের আগমনের পূর্ব্বেই বহু অঘটন ঘটে গিয়ে থাকে। এইজন্য প্রাথমিক শান্তি-রক্ষার ভার বহুক্ষেত্রে জনগণকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু জনগণ বহুস্থলে তাদের এই করণীয় কার্য্য নানা কারণে করেনি। এইজন্য বহু ব্যক্তি বা

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আপতকালে আত্মরক্ষার্থে ভাড়াটীয়া গুণ্ডা পুষে এসেছে। সিনেমা কোম্পানী সমূহকে নানা কারণে গুণ্ডাদের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হ'তে হয়েছে। পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে এই সকল গুণ্ডাগণ প্রেক্ষাগৃহের ক্ষতি তো করেছেই, এমন কি কর্ম্মচারীবৃন্দকে মারধর করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। "মুফৎ" ছবি দেখতে না দিলে এরা প্রায়ই এইরূপ উৎপাত করে থাকে। এই সকল নিষ্কর্ম্মা গুণ্ডার দল একটী নয়, বহু। এদের সকল দলের জন্য প্রেক্ষাগৃহ উন্মুক্ত রাখলে ব্যবসায় এমনিই অচল হয়ে যাবে। এই জন্য কর্ত্তৃপক্ষ মাত্র এদের একটী দলের সহিত বন্দোবস্ত করে নিয়ে থাকে। এই দলের কয়েকজনকে এঁরা অর্থ এবং ফ্রি পাশ প্রদান করে থাকেন। এর বিনিময়ে তারা অপরাপর দলকে পুলিশ পৌঁছানো পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছে। অবশ্য অধুনাকালে বহু স্থানে এই প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে।

বেশ্যালয় সমূহেরও প্রাথমিক শান্তি-রক্ষা এক শ্রেণীর গুণ্ডাদল কর্ত্তৃক হয়ে থাকে। বারবনিতা গৃহের বাড়ীওয়ালীরা এইরূপ বহু গৃহস্থ গুণ্ডাদের মাসিক মাহিনায় পুষে এসেছে। এই সকল গৃহস্থ গুণ্ডাগণ বেশ্যা-পল্লীতেই কোনও এক গৃহে স্বপরিবারে বাস করে। অসহায় ভাড়াটীয়াদের দুর্দ্দান্ত মাতাল বা দুর্ব্বৃত্তদের হস্ত হ'তে রক্ষা করার প্রয়োজন হ'লে চাকর মারফৎ বাড়ীওয়ালীরা এই গুণ্ডাদের ডাকিয়ে আনে। রাতবেরাতে সংবাদ পাওয়া মাত্র এরা ত্বরিত গতিতে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। নিম্নের বিবৃতি দুইটি হ'তে বিষয়টী সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমি অমুক শহরতলীর প্রেক্ষাগৃহের ম্যানেজার নিযুক্ত হই। বিদায়ী ম্যানেজার অমুকবাবু আমাকে একজন স্থানীয় গুণ্ডা নামধেয় এক ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এঁর

সাহায্য গ্রহণ না করলে এখানে আপনি টেঁকতে পারবেন না। এমন কি এ'জন্য আপনার জীবনও সংশয় হয়ে উঠবে। এঁদের আমরা মাসিক এতো টাকা দিয়ে এসেছি। হাউসের মালিকেরও এই সব ব্যাপার জানা আছে। বাজে খরচের মধ্যে এই টাকা ফেলে দিয়ে হিসাব রাখবেন।' গুণ্ডা ভদ্রলোক 'হেঁ হেঁ' করে হেসে বললেন, 'আমি আপনাদেরই একজন আছি। আজ কিন্তু আমার চার জনের জন্য একটা পাশ চাই। আমার শ্বশুর বাড়ী থেকে শালা ও শালীরা এসে গিয়েছে, আচ্ছা নমস্কার।' যাই হোক এই ভদ্রলোকের সাহায্যে মাস দুই আমি নিশ্চিন্ত ভাবে কাজকর্ম্ম চালাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা প্রেক্ষাগৃহে এসে ঝামেলা যে করে নি তা'ও নয়, এমন কি সোডাওয়াটারের বোতলও দুই একটা ছুঁড়ে গিয়েছে। পুলিশে খবর দিয়েছি কিন্তু পুলিশ চলে যাওয়া মাত্র আবার পূর্ণোদ্যমে তারা আক্রমণ করেছে। কিন্তু এই ভদ্রলোক তার দল বল সহ প্রতিবারেই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে। এমন কি এদের দুই একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশেও সোপর্দ্দ করে দিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যার দিকে অফিসে বসে আছি এমন সময় একটা বেয়াড়া চেহারার লোক এসে জানালো,—'দেখুন আমি অমুক সাহেবের দলের লোক বাংলা ছবি আমরা ভালো বুঝি না। তা এখন হিন্দি ছবি যখন দেখাচ্ছেন তখন আমাদেরও কয়েকজনকে ফ্রি পাশ দিতে হবে, আপনাদের।'—'দিল্লাগীর আর জায়গা পাও নি,' বিরক্ত হয়ে আমি উত্তর করলাম, 'যাও আভি তুম লোক নিকাল যাও।' এর ফল স্বরূপ এইদিন যে হাঙ্গামা হয় তাতে আমি নিজেও আহত হয়ে পড়ি। আমাদের বন্ধু গুণ্ডার দলের চেষ্টা সত্ত্বেও এইদিন প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করতে পারে নি। প্রেক্ষাগৃহের আসবাব-

পত্রের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন ক'রে নবাগতরা পলায়ন করে। হাঙ্গামার খবর পেয়ে পুলিশ তদন্তে আসে এবং জিজ্ঞাসা করে যে এরা অমুক সাহেবের দল কি'না। বলা বাহুল্য, পুলিশ আসার অব্যবহিত পূর্ব্বেই এরা স্থান ত্যাগ করেছিল। পরের দিন বন্ধু গুণ্ডার পরামর্শ মত আমি অমুক সাহেবের প্রাসাদে এসে ধন্না দিই। অমুক সাহেব তখন সবেমাত্র মোটর বিহারান্তে গৃহে ফিরেছেন। আমাদের কার্ড পাওয়া মাত্র তিনি তাঁর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় আমাদের তলব করলেন। ফ্যানের তলায় মূল্যবান ফরাসে বসে এই সময়ে তিনি তাম্রকূট সেবন করছিলেন। আমরা নমস্কার জানিয়ে তাঁর কাছে আবেদন জানালে তিনি স্মিতহাস্যে অভয় দিয়ে জানালেন, 'ওসব গণ্ডগোলের কথা হামি মাত্র আজ সকালেই শুনিয়েছি। হামি সবকইকে ধমকিয়ে ভি দিয়েছি বহুৎ চিল্লাচিল্লিভি করিয়েছি। তা আপনারা আসবেন আমার কাছে, যখনই ইচ্ছা হবে তখনই আসবেন। লেকেন ওরা সব ছোটা আদমী আছে, বায়স্কোপ টায়োস্কোপ দেখতে ভি থোড়া চাহে। আচ্ছা, আপনি এক কাম করবেন সপ্তাহে মাত্র ছয় জনকে দেখতে দেবেন। যখন যাবে ওরা হামার নাম নেবে। আর কুচ্ছু গোলমাল হবে না।' বলা বাহুল্য যে ভদ্রলোকের সৌজন্যে এবং আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। আমার মন বিশ্বাস করতে চাইলো না যে এই রকম এক ব্যক্তি গুণ্ডাদের সর্দ্দার হ'তে পারে। শহরে ভদ্রলোকের দুইটী বড় বড় কারবার আছে। তা ছাড়া তিনি স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের একজন মেম্বার এবং এই অঞ্চলের দশ বারোটী বড় বড় বস্তি গ্রামের তিনি মালিক। স্থানীয় হাসপাতালে দশ হাজার টাকা তিনি দানও করেছিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকটও এই কারণে তাঁর খাতির আছে।

এই বর্ণচোরা মানবটীর সহিত পরিশেষে আমি বিশেষ খাতির

জমিয়ে ফেলেছিলাম। একদিন তিনি আমাকে তাঁর খাস ডেরাতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐখানকার গুণ্ডাদলের কার্য্যাবলী অবলোকন ক'রে আমি বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। এমন কোনও অপরাধ ছিল না, যা কিনা এঁর দলের লোকেরা না করেছে। পয়সার বিনিময়ে এরা মানুষ খুন করতেও পেছপাও হতো না। তবে নিষিদ্ধ ও বে-আইনী দ্রব্য পাচার দ্বারাই এরা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করেছিল। অমুক সাহেব এইদিন তাঁর এক পাঞ্জা আমাকে উপহার দেন এবং বলেন, 'এই পাঞ্জা দেখামাত্র তাঁর দলের লোকেরা আমাকে নিরাপদে পোঁছে দেবে।' এর বহুদিন পরে একদিন আমি বিক্রয়লব্ধ বার শত টাকা সহ রাত্রে গঙ্গার পুল অতিক্রম করছিলাম। এমন সময় একদল দস্যু পথ অবরোধ করে টাকার পুঁটুলিটা ছিনিয়ে নিলে। এর পর এদের একজন একটা চাকু উঁচিয়ে বললে, 'এবে শালা ভাগ। নেহি তো জানসে মারিয়ে দেবে। আমি তাদের নেতাকে ধমক দিয়ে উত্তর করলাম, 'জান্তা হ্যায় কোন হ্যায়? এই দেখো পাঞ্জা।' অমুক সাহেবের ছিল এই অঞ্চলে একছত্র আধিপত্য। দেখলাম, লোকগুলো ইতিমধ্যে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। তারা ক্রুটী স্বীকার করে অপহৃত নোট কয়টী গুণে গুণে আমাকে ফেরত দিয়েছিল। এদের একজন এ'ও বলেছিল, 'লেকেন বাবু পুলের ওপারে আমাদের কোনও লোক নেই। অন্য কোনও দল এসে আপনাকে লুঠে নিতে পারে। আপনি আমাদের সাহেবের লোক। চলেন আপনাকে থোড়ী দূর এগিয়ে দিয়ে আসি।"

এই সম্বন্ধে অপর একটী বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। এই বিবৃতিটী হতে বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"অমুক বেশ্যালয়ে আমরা এইদিন কয়জন রাত্রিবাস করতে মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু রাত্রি দশটার সময় একজন ভদ্রলোক উপস্থিত

হওয়া মাত্র ঐ বারবনিতাটী আমাদের নিকট অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমাদের তৎক্ষণাৎ বিদায় দিতে চাইল। আমরা কিন্তু এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হলাম না। পরিশেষে ঐ বারবনিতাটীর সহিত আমাদের বাকবিতণ্ডা বলপ্রয়োগের পর্য্যায়ে এসে পড়লো। বারবনিতাটী অকস্মাৎ চীৎকার ক'রে বলে উঠলো, 'ও বাড়ীওয়ালী মাসী, শীঘ্রি এসো, নেমে এসো। খুনে ডাকাতরা বুঝি আমাকে শেষ করে দিলে।' এর কিছুক্ষণ পরে বাড়ীওয়ালী একজন স্থূলকায় আধাবয়সী ভদ্রলোককে নিয়ে আমাদের এই ঘরে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি লা ? হয়েছে কি, এ্যাঁ ? দেখো তো মণিদা কারা এরা ?' এই স্থূলকায় ভদ্রলোক ছিলেন ঐ পাড়ার বিখ্যাত গুণ্ডা মণিবাবু। মণিবাবু আমাদের দুইজনকার ঘাড় দুটো ধরে একেবারে শুইয়ে দিয়ে বললেন, 'এ্যাঁ বড্ড বাড় বেড়েছো, না ? এখন দাও হাতের ঘড়ীটা চট্‌পট্ খুলে।' এর পর ঐ মণিবাবু আমাদের নিকট হ'তে পেন ও কুড়িটা টাকা কেড়ে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে আমাদের রাস্তায় বার করে দিলে। বলাবাহুল্য আমরা সংগোপনে বেশ্যালয়ে এসেছিলাম। এইকারণে লজ্জায় থানাতে এ সম্বন্ধে এজাহার দিতেও সাহসী হই নি।"

উপরোক্ত কারণে বেশ্যাপল্লীতে গুণ্ডামী বা রাহাজানি অবাধে সংঘটিত হয়ে থাকে, কারণ ভদ্রসন্তানগণ তাদের বেশ্যালয়ে আগমনের বার্ত্তা কাহারও নিকট প্রকাশ করতে রাজী হন না। কিন্তু গুণ্ডামী অধিকতররূপে এই পল্লীতে প্রশ্রয় পেলে বারবনিতাদেরই ক্ষতি হয় অধিক। নির্ব্বিচার গুণ্ডামী বা রাহাজানির কারণে ভদ্র মানুষ অর্থাৎ বাবু বা খরিদ্দারদের অভাব ঘটে। কারণ এই অবস্থায় কেহ ভয়ে এই সকল পল্লীতে আসা সমীচীন মনে করে না। এই ভাবে দেহ-পণ্য ব্যবসায় ক্ষতি ঘটলে বেতনভোগী গুণ্ডাদের প্রয়োজন এবং তাদের উপার্জ্জনও কমে গিয়ে

থাকে। এই কারণে এই সকল গৃহস্থ গুণ্ডাগণ ভদ্র পথচারী এবং বেশ্যালয়ে আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদেরও অসৎ ব্যক্তিদের আক্রমণ হ'তে রক্ষা ক'রে এসেছে। ক্ষেত্র বিশেষে এই বিষয়ে নিজেরা অপারক হ'লে এরা পুলিশে খবর দিতেও ইতস্ততঃ করে নি। বেশ্যালয়ে আগত ভদ্রসন্তানগণ নিজেরা উৎপাতের সৃষ্টি না করলে এরা তাদের উপর কোনওরূপ উৎপীড়ন বা অত্যাচার করে নি।

শহর সমূহে কিরূপে বালকগণ গুণ্ডায় পরিণত হয় তা নিম্নের বিবৃতিটী হ'তে সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমার নাম অমুক গুণ্ডা। লোকে আমাকে গুণ্ডা বললে আমি রাগ করি না বরং খুশী হই। কারণ আমি গুণ্ডা অর্থে শক্তিমান এবং সাহসী পুরুষকেই বুঝি। এর কারণ বাল্যকালে আমি রুগ্ন ছিলাম। আমার দৈহিক দুর্ব্বলতার সুযোগে পড়শী বালকেরা অকারণে আমাকে মারধর করতো। এইজন্য আত্মরক্ষার্থে আমি দৈহিক বলে বলীয়ান হ'তে ইচ্ছা করি। আমি নিয়মিত ব্যায়াম সুরু করি এবং এক আখড়ায় ভর্ত্তি হয়ে পড়ি। এই সময় আখড়াগুলি গুণ্ডা শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এইখানে আমি কুস্তী, ব্যায়াম এবং লাঠি খেলা শিক্ষা করি। এখানকার পরিচালকরা ঘরোয়া বাদবিসংবাদে আমাদের মারপিঠের কার্য্যে হামেসাই নিযুক্ত করতো। বাল্যকালে মার আমিই খেয়ে এসেছি। তাই যৌবনে অপরকে মারতে পেরে আত্মতৃপ্তি লাভ করতাম। এই সময় আমরা কুলপী বরফওয়ালাদের মারপিঠ করে বরফ কেড়ে খেয়েছি। ট্রাম বাসে ভাড়া চাইলে আমরা কণ্ডাক্টারদের মারপিঠ করে নেমে পড়েছি। এই মারপিঠের মধ্যে আমরা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করতাম। এরপর হ'তে আমাদের লোভ এবং সাহস আরও বেড়ে যায়। আমরা সুবিধামত পথচারীদের অর্থাদি কেড়ে নিতে সুরু করে দিই। বাধা পেলে

আমরা ছুরি উঁচিয়ে তাদের নিরস্ত করতাম। বহুক্ষেত্রে আমরা দল বেঁধেও এইরূপ রাহাজানি করেছি। নিজ পল্লীতে এইরূপ অপকার্য্যে আমরা কখনও হাত দিই নি। বরং পল্লীবাসীদের নানারূপ ফাই-ফরমাস খেটেছি এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র তাদের উপকার করেছি। এজন্য পাড়ার লোকের ধারণা ছিল আমরা সকলে পরোপকারী যুবক। এই কারণে পুলিশ সরজমীন তদন্তে এলে পড়শিগণ পঞ্চমুখে আমাদের সুখ্যাতি করেছে। ফলে পুলিশ রিপোর্ট দিতে বাধ্য হয়েছে যে আমরা ভালো লোক, গুণ্ডা তো নই-ই। ভোটের ব্যাপারে আমরা স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সর্ব্বদাই সাহায্য করেছি। এজন্য তাঁরা কাউকেউ আমাদের অঙ্গস্পর্শ করতে দেননি। এই সকল নেতাদের নিকট হ'তে আমরা নিয়মিত পারিশ্রমিক পেয়েছি। এ'ছাড়া, ব্যক্তি বা দলদ্বারা নিযুক্ত হয়ে আমরা মারপিঠ করতে সর্ব্বদাই পটু।"

গুণ্ডারা যে পল্লীতে বাস করে সেই পল্লীতে তারা উৎপাত করে কম। এদের নেতারা এই বিষয় সর্ব্বদা সতর্ক থাকে। দলের লোকেরা দৈবাৎ কোনও অন্যায় করে ফেললে দলের নেতা তাদের ভৎর্সনা করে এবং তাদের হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চেয়ে আসে।

একক গুণ্ডামী অপেক্ষা দলবদ্ধ গুণ্ডামী শহরে অধিক দেখা যায়। এদের প্রতিটী দলের জন্য এক একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ সাহসী নেতা আছে। এই সকল নেতাদের নির্দ্দেশ মত দলের অপরাপর ব্যক্তি কার্য্য করতে বাধ্য।

পূর্ব্বকালে [৫০ বৎসর পূর্ব্বে] এরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টী বুঝা যাবে।

"আমাদের বসতবাটীর পিছনে এই সময় এক দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা বাস করতো। তার নাম ছিল অমুক পাঞ্জাবী। ধর্ম্মে ছিল সে মুসলমান।

সে যখন মস্‌জিদে নামাজ পড়তে যেতো, তখন আর কেউ সেখানে যেতে সাহস করতো না। যে সেখানে একাই নামাজ পড়তো। ইস্‌লামীয় গণতন্ত্রও তার দাম্ভিকতার নিকট হার মেনেছিল। ব্যক্তিগত ভাবে তার বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ ছিল না, বরং দেখা হ'লে সে আমাকে সম্মান দেখিয়ে সেলাম করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কীর্ত্তি কলাপ আমি পছন্দ করতে পারি নি। আমাদের বাটীর পিছনের বস্তিতে তার ডেরা ছিল। সেখানে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত লুঠের টাকার ভাগ বাঁটোয়ারা হতো। এছাড়া গাঁজা এবং কোকেন বিক্রীরও উহা একটী ঘাঁটী ছিল। বিরক্ত হয়ে একদিন আমি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটা দরখাস্ত পেশ করে দিলাম। এই দিন আমি বাইরে যাবার জন্য আমার জুড়ী গাড়ীতে আরোহণ করতে যাচ্ছি, এমন সময় অমুক পাঞ্জাবী আমার পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে আমার লেখা দরখাস্তটা তারই হাতে রয়েছে। মুখ বেঁকিয়ে সে বললে, 'কেয়া বাবুসাব। হাম আপকো কুছ কিয়া? হামলোকসে দুষমণি মাৎ কিজিয়ে।' পর দিন আমি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টী জানালে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর হেড ক্লার্ককে দরখাস্তটী পেশ করতে বললেন। হেড ক্লার্ক আমার সম্মুখেই দরখাস্তটী হাজির করে প্রমাণ করলেন যে উহা চুরি যায় নি।"

কিছুকাল পূর্ব্বে বড়বাজার অঞ্চলে এক শ্রেণীর গুণ্ডার আবির্ভাব হয়েছিল। ধীরে ধীরে সমগ্র উত্তর এবং মধ্য কলিকাতায় এই দল ছড়িয়ে পড়ে। গুণ্ডাদের জন্য বিশেষ আইনের প্রচলন দ্বারা অতিকষ্টে এদের দমন করা হয়। এই অপ-দলের সৃষ্টির একটী চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই স্থানের ব্যবসায়ী শ্রেণী অত্যন্ত ধনী হয়ে উঠে। এই সময় এরা এরূপ বহু বেকার অথচ সবল ব্যক্তিকে কর্ম্মে

নিযুক্ত করে তাদের পোষণ করতো। কিন্তু যুদ্ধাবসানে ব্যবসায় বাজারে মন্দা পড়ে যায়। এই সময় এদের পূর্ব্বের ন্যায় ভরণপোষণ করা সম্ভব হতো না। এই দলের কেউ কেউ ভয় দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের নিকট পয়সা আদায় করতে সুরু করে। প্রথম প্রথম শান্তিপ্রিয় ব্যবসায়ীরা এদের দাবী পূরণ করতো, কিন্তু পরিশেষে তা করা তাদের সকলের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই দলের মধ্যে এমন বহু পশ্চিমা ছিল যাদের [সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়] ব্যবসায়ীরা আত্মরক্ষার্থে মুল্লুক থেকে আমদানী করেছিল। এই সকল ব্যক্তি এই সময় প্রকাশ্যে রহাজানি সুরু করে দেয়। ব্যবসায়ীরা কোন্ সময়ে কোন্ পথে অর্থাদি আনয়ন করে তা তাদের পূর্ব্বে হ'তেই জানা ছিল। ব্যাঙ্ক হ'তে অর্থাদি আনয়নের সময় এরা দারোয়ানদের ব্যাগ সমূহ প্রায়ই ছিনিয়ে নিত। বিপদ অবহিত হয়ে ব্যসায়িগণ সশস্ত্র প্রহরীদের সাহায্যে শকট যোগে অর্থাদি আনয়ন করতে থাকে। এর পর হ'তে এই গুণ্ডা দলের উৎপাত সুরু হয় নিরীহ পথচারীদের উপর। এরা ছুরি উঁচিয়ে পথচারীদের ব্যাগ, ঘড়ী ও অর্থাদি প্রায়ই অপহরণ করেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পথচারীরা যে বাধা না দিয়েছে তা'ও নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষে রীতিমত মারপিঠ বা ধস্তাধস্তি সুরু হয়ে গিয়েছে। পুলিশ অকুস্থলে এসে দুই ব্যক্তিকে রাজপথে মারপিঠ করতে দেখে আসামী এবং ফরিয়াদী উভয়কেই ধরে এনে তাদের বিরুদ্ধে মারপিঠের মামলা দায়ের করেছে। সহজেই মামলাটী এই ভাবে নিষ্পত্তি করতে পাবার জন্যই বোধ হয় তারা প্রকৃত তথ্য অবগত হবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি। যে সকল প্রাথমিক অপরাধীরা চুরি, চামারী বা পকেট মারতে সচেষ্ট হতো তারাও বুঝেছিল যে ঐ সকল বিপজ্জনক ব্যবসায় অপেক্ষা কেড়ে কুড়ে নেওয়ায় অধিক লাভ। এইশ্রেণীর বহু প্রাথমিক অপরাধী পরিশেষে এই ব্যবসায় অবলম্বন করে। অবস্থা এইরূপ

বিপজ্জনক হয়ে উঠলে পুলিশ যথাসত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে এবং বিশেষ গুণ্ডা আইনের সাহায্যে এদের দমন করতে সমর্থ হয়।

এমন বহু গুণ্ডা আছে যারা বুঝে-স্থঝে বা ভেবে-চিন্তে কাজ করে না বরং প্রায়শঃক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে থাকে। এই প্রকৃতির গুণ্ডাদের সাধারণ ছিন্‌তাই (Robber) বা ডাকাতাদি বলা হ'য়ে থাকে। সাধারণ অপরাধীদের সহিত এইসব গুণ্ডাদের প্রভেদ প্রকৃতিগত। অপরাধী গুণ্ডাগণ প্রায়শঃক্ষেত্রে ছুরি ব্যবহার করেছে, কিন্তু গৃহস্থ গুণ্ডারা ব্যবহার করে লাঠি প্রভৃতি ঘরোয়া অস্ত্র সকল। ইদানিং বহু গুণ্ডা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারেও অভ্যস্ত হয়েছে।

প্রকৃত গুণ্ডা ব্যতীত পল্লী-গুণ্ডাও (Pseudo Gunda) দেখা যায়। প্রতি পল্লীতে অপরিণত বালক এবং বিপথগামী যুবকগণ প্রকৃত গুণ্ডাদের পন্থানুসারে গুণ্ডা হ'তে প্রয়াস পেয়েছে। এক পাড়ায় গুণ্ডাদের সহিত ছুতায় নাতায় অপর পাড়ার গুণ্ডাদের প্রায়ই মারপিঠ হয়ে থাকে। এইরূপ খণ্ডযুদ্ধে সোডা-ওয়াটার বিক্রেতারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ এই সময় গুণ্ডারা তাদের বিপণি হ'তে সোডার বোতল সংগ্রহ ক'রে উহা পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করে। এই যুদ্ধে ইঁট-পাটকেল, এ্যাসিড্‌ বাল্ব, ছোরাছুরি এবং লাঠিও ব্যবহৃত হয়েছে। স্ব স্ব পল্লীর প্রতি এই গুণ্ডারা মমতাশীল হয়ে থাকে। এদের কেহ কেহ পল্লী হ'তে অধিক দূরে গমন করতেও নারাজ। এরা আত্মপরিচয়ে সগর্ব্বে প্রত্যুত্তর করে, "জানো আমি কে ? আমি গোয়াবাগানের গুণ্ডা ইত্যাদি।" এরা গুণ্ডা নামে পরিচিত হ'তে সর্ব্বদাই সচেষ্ট, দাম্ভিকতাই ইহার মূল কারণ। "নন্দ গুণ্ডা, ছিন্‌তাই ছিদাম, মণি গুণ্ডা" এইরূপ এক একটী নামে তারা স্ব স্ব পল্লীতে পরিচিত। এইরূপ নামে তাদের সম্বোধন করলে তারা রাগ করে না, বরং এজন্য তারা সকল সময়েই গর্ব্বানুভব করে। পল্লীর ভদ্রব্যক্তিরাও

এদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে সত্য। এদের প্রায়ই বলতে শুনা গিয়েছে, "এই ও আমাদের পাড়ার গুণ্ডা। ওকে কিছু বলবে না। না, মশাই! লোকটা যে খুব খারাপ তা নয়।"

একক গুণ্ডাদের মধ্যে অপরাধী-গুণ্ডাদেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। নিম্নের বিবৃতি হ'তে এদের অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বুঝা যাবে।

"আমি ঐ দিন রাত্রে অমুক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই সময় একজন খঞ্জ ভিখারী আমার পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি চাও?' কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে সে উত্তর করলো, 'দুই দিন খাইনি, বাবু!' দয়া পরবশ হয়ে তাকে একটা আনি দিবার জন্য মানি-ব্যাগটা খুললাম। ব্যাগের মধ্যে এই দিন তিনশো টাকার তিন খানা নোট ছিল। ভিখারী লোকটা তা দেখে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। নিমিষে সে একটা ছুরি বার করে বললে, 'দে এক্ষুণি লোট ক'টা, নইলে দেবো তোকে সাবড়ে।' লোকটা যে ভিখারীর ছদ্মবেশে একজন গুণ্ডা তা আমি কল্পনাও করিনি।"

সাময়িক গুণ্ডারা, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির হয়। এরা সাধারণতঃ গৃহস্থ ব্যক্তি। কোনও একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হ'লে এরা সাময়িক ভাবে মাত্র ঐ সময়ের জন্য গুণ্ডায় পরিণত হয়। রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হলে এরা আবির্ভূত হয়ে থাকে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সাধারণতঃ প্রতিশোধ গ্রহণের কারণেই বহু মানুষ গুণ্ডায় পরিণত হয়ে থাকে। তবে এদের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তিও থাকে যারা মাত্র লুঠের লোভে গুণ্ডায় পরিণত হয়েছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার উপশমে এদের আর দেখা পাওয়া যায় নি। এর কারণ সুপ্ত অপস্পৃহা লোকলজ্জার কারণে এরা এতো দিন বহিষ্কৃত

করতে পারে নি। এই সময় তারা ভেবেছে যে এই লুঠপাটে পড়শীরা তাদের চোর ছ্যাঁচোড় বলবে না। বড় জোর তারা তাদের বলবে সাম্প্রদায়িক। কেউ কেউ এজন্য তাদের সুখ্যাতিও করতে পারে। এইরূপ ধারণা প্রসূত সাহসই তাদের এই অন্তর্নিহিত অপস্পৃহার নিষ্কাসন ঘটাতে সাহায্য করে।

অপরাধ—বাটী ভাড়া সংক্রান্ত

একত্রে বাস করতে হ'লে বাদবিসংবাদ এবং কলহ হওয়া স্বাভাবিক। এই কারণে বাটীর মালিক এবং ভাড়াটীয়াদের মধ্যে বিসংবাদ মোটেই বিচিত্র নয়। পূর্ব্বকালে বাটীর প্রাচুর্য্যতার কারণে এই অবস্থায় ভাড়াটীয়া অন্য এক বাটীতে উঠে যেতো, কিন্তু এক্ষণে বাটীর দুষ্প্রাপ্যতার কারণে এই কলহ চিরস্থায়ী কলহে পরিণত হয়েছে। একপক্ষ অন্যত্র সরে না গেলে এই কলহ হয় বিরামহীন। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয়বিধ মামলাতে বহুক্ষেত্রে উভয় পক্ষই সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রবাদ আছে, যে দেশ পুনঃ পুনঃ জয় করতে হয়, সে দেশ জয় করা বা না করা সমান কথা। এইরূপ অবস্থায় ভাড়াটীয়া পক্ষীয় ব্যক্তিরই স্থান ত্যাগ করা উচিত, যেহেতু বাটীর মালিকের পক্ষে আপন বাটী ত্যাগ করা সম্ভব নয়। এই অনন্ত কলহের কারণে পুত্র কন্যাদের শিক্ষা-দীক্ষাও ব্যাহত হয়, কাজকর্ম্মের ক্ষতি তো হয়ই ; মনের শান্তির প্রশ্ন না হয় ছেড়েই দিলাম। প্রকৃতপক্ষে বাড়ীর দুষ্প্রাপ্যতাই এরূপ কলহের মূল কারণ। যে সময় তোষামোদ করে ভাড়াটীয়া সংগ্রহ করতে হতো, সে সময়

এরূপ বিসংবাদ কদাচ দেখা গিয়েছে। দেশে কোনও এক সমস্যা উদয় হ'লে ঐ সমস্যা সম্বন্ধে বহু মুখরোচক গণ-গল্পের (Folk tale) সৃষ্টি হয়। এই গণ-গল্প হতে ঐ সমস্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যাবে। নিম্নে এইরূপ একটী গণ-গল্প উদ্ধৃত করা হলো।

"একটী ভদ্রলোক এক দিন গড়ের মাঠে এক পুকুরে মাছ ধরবার সময় উল্টে পড়ে যান। ভদ্রলোক সাঁতার না জানায় ডুবে যাচ্ছিলেন। এই সময় তাঁর লক্ষ্য পড়লো পাড়ে দণ্ডায়মান এক ভদ্রলোকের প্রতি। ডুবে যেতে যেতে প্রথম ভদ্রলোক দ্বিতীয় ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বললেন, 'মশাই, বাঁচান আমাকে, ডুবে যাচ্ছি আমি।' উত্তরে দ্বিতীয় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, বাঁচাচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলুন, থাকেন কোথায় আপনি?' উত্তরে ভদ্রলোক চিৎকার করে জানালেন, ৫৯।এ।১ ল্যান্সডাউন রোড, এখন।' দ্বিতীয় ভদ্রলোক এইবার উত্তর করলেন, 'আচ্ছা, তা'হলে ডুবুন আপনি। আমি এখন ঐ বাড়ী ভাড়া নিতে চললাম।' এরপর ঐ দ্বিতীয় ভদ্রলোক ত্বরিত গতিতে উক্ত বাড়ীতে এসে দেখলেন অপর এক ব্যক্তি মালপত্র সহ ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করছেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোক স্তম্ভিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি মশাই, বাড়ীটা তো এইমাত্র খালি হয়েছে। এতো শীঘ্রি আপনি খবর পেলেন কি করে?' উত্তরে স্মিতহাস্যে তৃতীয় ভদ্রলোক বললেন, 'তা বুঝি জানেন না? এ লোকটাকে তো আমিই ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছি। আমার আগে আপনি কি করে খবর পেতে পারেন!"

"কিছুকাল পূর্ব্বে ক্রোধ বশতঃ কোনও এক ব্যক্তি তার শত্রুপক্ষীয় এক ব্যক্তির বাটীর দেওয়ালে লিখে রেখেছিলেন—'এই বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবে।' এরপর হতে বহু ব্যক্তি ক্রমাগত ঐ ব্যক্তিটীকে উত্যক্ত করতে সুরু করে দেয়। পরে অবশ্য ঐ ভদ্রলোক দেওয়ালের

ঐ লিপিকা সম্বন্ধে অবগত হয়ে উহা উঠিয়ে ফেলে তবে পরিত্রাণ পান।"

প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু, তা সকল সময়েই অনর্থের মূল। বৃহৎ সম্পত্তি মালিকদের কখনও সুখী করে নি। এমন কি বহুক্ষেত্রে তা তাঁরা সুখে ভোগও করতে পারেন নি। ঐ সম্পত্তি রক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য তাদের সমুদয় সময় ও শক্তি নিয়োজিত হয়েছে। একটু সময়ও তাদের সুখ ভোগের জন্য অবশিষ্ট থাকে নি। অকারণে তাদের শত্রু বৃদ্ধি হয়েছে। নানা আশঙ্কায় ও লোভের কারণে তারা একদিনও শান্তি পাননি। স্বকীয় জীবনে তাঁরা কষ্ট পেয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মধ্যে এই সম্পত্তি সৃষ্টি দ্বারা তারা বিবাদ ও সংগ্রামের কারণ হয়েছেন। বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 'প্রভূত সম্পত্তি' দেশে অলস ও পরগাছা শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছে। তা'বলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আমি বিরোধী নই। উহা আহরণ করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উহা হ'তে মানুষকে বঞ্চিত করলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মেধা প্রকাশ পায় না। এর ফলে পৃথিবীর অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ভুলে গেলে চলবে না যে পৃথিবীর যে কোনও বৃহৎ বা মহৎ কাজ তা একজন ব্যক্তি দ্বারা বা একক প্রচেষ্টায় বা নেতৃত্বে সাধিত হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব মানুষের পারিবারিক পবিত্রতা ও সৌষ্ঠব বিনষ্ট করে এবং ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির অভাবে নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। মানুষ তখন একযোগে দেশের ও দশের উপকার করতে সক্ষম হয় না। এই কারণে আমি 'প্রয়োজনের' অতিরিক্ত বাক্যটী ব্যবহার করেছি। আমার মতে বাড়ী করতে হ'লে এমন এক হাল্কা বাড়ী তৈরি করা উচিত যা মালিকের মৃত্যুর পাঁচ বা দশ বৎসর পরে এমনিই ভেঙে পড়বে, তা না হ'লে এ

স্বল্পপরিসর বাড়ীটীর অধিকার সম্পর্কে ওয়ারীশগণের মধ্যে বিবাদ বাধবে। যত বড়ই বাড়ী আপনি করুন না কেন, দুই পুরুষ পর উহাতে কারো স্থান সঙ্কুলান হয় না এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ মামলা বাধে। এই কারণে বহু দেশে মাত্র প্রথম পুত্রকে সম্পত্তির মালিকানা দিয়ে অন্যান্য পুত্রদের নগদ অর্থ দিয়ে বিদায় দেওয়ার রীতি আছে। এতে অন্য পুত্ররা শৈশব হতেই উপলব্ধি করে যে বাবার যা কিছু আছে তা দাদার। তাকে দাদার মত ধনী হ'তে হ'লে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিতে হবে। তাকে পড়াশুনা করতে হবে, কিংবা বিদেশে গিয়ে ভাগ্য অন্বেষণ করতে হবে। এই মনোবৃত্তির কারণে ওদের অন্য পুত্রেরা বিদেশে গিয়ে সম্পত্তি আহরণ করেছে, স্বদেশের জন্য সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ সৃষ্টিও করেছে। এরা পিতার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সামান্য নগদ অর্থের উত্তরাধিকারী মাত্র—এই দ্রব্যত্রয় মাত্র মূলধন করে তারা সাফল্যের সহিত জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে পেরেছে এবং সেই সঙ্গে তারা জাতি এবং দেশেরও বহু উপকার সাধন করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত প্রভূত সম্পত্তি আহরণ না করে যৌথভাবে উহা আহরণ করলে এই সকল অসুবিধা ঘটে না। য়ুরোপীয় দেশ সমূহ হ'তে এই বিষয়ে আমাদের শিক্ষা করা উচিত। এই বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"আমাদের গ্রামে জিলা হাকিম অমুক সাহেব পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। ইংরাজ ভদ্রলোক এদেশে নূতন এসেছিলেন। যে দিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই বৃহৎ অট্টালিকা সমূহ দেখতে পাচ্ছিলেন। বিস্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ গ্রামে কতো জন ক্রোড়পতি বাস করেন। সাহেবের এই প্রশ্নে আমরাও কম বিস্মিত হইনি। সাহেব জানতেন না যে এদেশের লোক সারা জীবনের সঞ্চিত

অর্থ দ্বারা কন্যার বিবাহ দেন এবং পরিশেষে একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। এর পর তার একটী কপর্দ্দকও আর অবশিষ্ট থাকে না, এমন কি এ'জন্য তাকে অনাহারেও থাকতে হয়েছে। কিন্তু অন্য দেশে অর্থ সঞ্চয় মাত্র উহা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রয়োগ করা হয়। ব্যবসায় প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করার পরও যদি অর্থ থাকে, তবেই উহা দ্বারা বাড়ী নির্ম্মাণ করা হয়, কিন্তু বৃহৎ বাটী নয়। বৃহৎ অট্টালিকা কেবলমাত্র বহু ক্রোড়পতি অন্য দেশে নির্ম্মাণ করেছেন।

ক্ষমতার বহির্ভূত বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনও কিছু কল্যাণ-কর হয় না। এইজন্য জীবনধারণের অন্যান্য খরচ খরচা বা ব্যয় সঙ্কুলান করতে না পেরে অনেকে তাঁদের বাড়ী বাঁধা দিতে বা বিক্রয় করতেও বাধ্য হয়েছেন। বহু লোকে ধার করে বাড়ী ক'রে পরে সুদ সহ আসল শুধতে না পেরে বাড়ী বিক্রয় করেছেন। এইজন্য বহু ব্যক্তি বসবাসের জন্য বাটী নির্ম্মাণ ক'রে পরে তা ভাড়া দিতে বাধ্য হয়েছেন। এঁদের অনেকে বাটীর একাংশে নিজেরা বাস করে অপরাংশে ভাড়াটিয়া বসিয়েছেন। একমাত্র শহরে বাটী ভাড়া করার প্রয়োজন হয়। এর কারণ সেখানে বহু লোকই সাময়িক ভাবে বা কাজকর্ম্ম ব্যপদেশে উপস্থিত হয়। স্থায়ী ভাবে বাস করার প্রয়োজন তারা উপলব্ধি করেনি। অবসর গ্রহণের পর এরা শহর ত্যাগ ক'রে পুনরায় গ্রামের পৈতৃক বাটীতে ফিরে যায়। এ'ছাড়া শহরে ভূমি ক্রয় ক'রে বাটী নির্ম্মাণের জন্য অর্থব্যয় করা সাধারণ ব্যক্তির সাধ্যাতীত। এই কারণে শহর মাত্রেই বাটী ভাড়া সংক্রান্ত বহু অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।'

এইবার আমরা এই শহরের বাটী ভাড়া সম্পর্কীয় সমস্যা সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই শহরে দুই প্রকারের বাটি ভাড়া পাওয়া যায়। যথা—

(১) প্রথম প্রকারের বাটী কেবলমাত্র ভাড়া দেওয়ার জন্যে নির্ম্মিত হয়েছে। ইহা এক প্রকারের ব্যবসায়। ধনী ব্যক্তিরা এই কারণে বাটীর পর বাটী নির্ম্মাণ করে থাকেন ; কিন্তু বাণিজ্যের কারণে একটী পয়সাও ব্যয় করেন না। এর ফলে বাণিজ্য অপর শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এঁরা মনে করেন এই ব্যবসায় লোকসান নেই। যা পাওয়া যায় তাই লাভ। কোনও রূপ 'রিস্ক' গ্রহণ করতে এঁরা রাজী নন। এই ক্ষেত্রে বাটীর মালিক ভিন্ন এক বাটীতে বাস করেন, কদাচ ভাড়াটিয়াদের সহিত এক বাটীতে বাস করেন না। এইজন্য মালিক ও ভাড়াটিয়াদের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কলহের সৃষ্টি হয় নি। প্রায়শক্ষেত্রে তাঁদের দ্বারবান বা ম্যানেজারদের সহিত বক্রী ভাড়া বাবদ বিবাদ হয়েছে এবং পরিশেষে আদালতে উহার শেষ নিষ্পত্তি হয়েছে। এই প্রকার মালিকরা ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত মামলা-মকদ্দমা সম্পর্কে অভ্যস্ত থাকেন। উহা তাঁদের ব্যবসার এক স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। এজন্য এঁদের কখনও কোনও মনোকষ্টের কারণ ঘটে নি।

ভাড়াটিয়া বাটীর বাৎসরিক মেরামতের বা কলি ফেরানোর প্রয়োজন হয়। এইজন্য হিসাবের এই খাতে বিশেষ অর্থ মজুত রাখা হয়। ঐ অর্থ দ্বারা বাটী সমূহের নিয়মিত মেরামতের কার্য্য সাধিত হয়েছে। এইজন্য বক্রী ভাড়া ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাপারে এদের বিবাদ বাধে নি।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর বাটীর মালিকদের ভাড়াটিয়া বাটীর সংখ্যা থাকে কম। দূরে বাস করার কারণে ভাড়াটিয়াদের সহিত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কলহ না বাধলেও বাৎসরিক মেরামত প্রভৃতি কার্য্য এরা অর্থের অভাবে সমাধা করতে পারে না। এইজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে কোনও

ভাড়াটিয়ারা ভাড়া বন্ধ করে দেওয়ায় বিবাদ বেধেছে। এঁদের দ্বারবান বা ম্যানেজার থাকে না, এঁরা নিজেরা ভাড়ার জন্য তাগিদ দিয়ে থাকেন। এইজন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কলহও ঘটেছে। তবে এঁরা দূরে বাস করার জন্য এই কলহ মুহুর্মুহুঃ হয় না। অনাবিল বা নিরবিচ্ছিন্ন অশান্তিও এ'জন্য তাদের ভোগ করতে হয় নি।

(৩) তৃতীয় প্রকার বাটীতে মালিকরা ভাড়াটিয়াদের সহিত এক বাটীতেই বাস করায় উভয়পক্ষই নানাবিধ অসুবিধা ও অশান্তি ভোগ করেছেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে উভয়ের কলহ চরম সীমায় উঠেছে। বহুক্ষেত্রে মারপিঠ এমন কি খুন-খারাপীও এদের মধ্যে ঘটে গিয়েছে। এই কারণে ভাড়াটিয়ার সহিত বাটীর মালিকের এক বাড়ীতে বসবাস করা উচিত নয়।

ভাড়াটিয়াদের অভিযোগ হয় যে বাড়ীওয়ালা তাকে অন্যায় ভাবে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট। কারণ তাকে উচ্ছেদ করতে পারলে ঐ বাটীর জন্য সেলামী সহ অধিক ভাড়ায় ভাড়াটিয়া সংগ্রহ করতে তিনি সমর্থ। অপরদিকে বাটীর দুষ্প্রাপ্যতার কারণে অপর একটি বাটীতে উঠে যাওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভাড়াটিয়া নিয়মিত ভাড়া দিতে স্বীকৃত আছে। কিন্তু রসিদ না দেওয়ায় তারা এতোদিন ভাড়া দেয় নি। এ'ছাড়া বাড়ীওয়ালা বাড়ীটি একটুও মেরামত করে দিতে রাজী নয়। তাদের অভিযোগ হয় যে ছাদ হ'তে জল পড়ে। জানালাগুলি খারাপ হয়ে গিয়েছে। বহুদিন দেওয়ালে কলি ধরানো হয় নি। এই মেরামতের কার্য্য শেষ না করলে তারা কিছুতেই ভাড়া দিবে না।

বাটীর মালিকের অভিযোগ হয় যে ভাড়াটিয়া বাটীর বহুস্থান ভেঙে দিয়েছে। এ'ছাডা তারা ঐ বাড়ীর একটি বা দুইটি অতিরিক্ত কক্ষ যা তাদের ভাড়া দেওয়া হয় নি, তা'ও তারা জোর করে অধিকার করে

নিয়েছে। বাটীর মালিক গরীব, ভাড়া হ'তে তারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই বাড়ীটির অবস্থা যে ভালো না, তা দেখে ও জেনেই তারা উহা ভাড়া নিয়েছে। তাদের পূর্ব্বেই বলা হয়েছিল যে মালিকের পয়সার অভাব। এজন্য ঐ বাড়ী মেরামত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষণে তারা বাড়ী না সারানোর অজুহাতে ভাড়া বন্ধ করে দিয়েছেন। কিংবা দুর্ম্মূল্যের কারণে ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু ভাড়াটিয়া ভাড়ার বৃদ্ধি মেনে নিতে রাজী নয়। কিংবা মালিকের দুই পুত্রের বিবাহের কারণে সমগ্র বাটী তাদের প্রয়োজন হয়েছে। এই কারণে ভাড়াটিয়াকে অন্যত্র যেতে তারা অনুরোধ করেছে, ইত্যাদি।

এইরূপ কলহের ফলে বাটীর মালিক নিম্নোক্তরূপ উপায়ে ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করে।

(১) অকারণে গালিগালাজ করা, দরোয়ান দ্বারা অপমান, মারপিঠের ভয় দেখানো, কলের জলের পাইপ কেটে দেওয়া এবং বিজলীবাতির সংযোগ কর্ত্তিত করা, সদর দরজা রাত্রে না খোলা, পাইখানা বা সাধারণ পথ বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি।

(২) কেহ কেহ মেরামতের ছুতায় কক্ষের ছাদ ফুটা করে রাখেন বৃষ্টির জলে কক্ষগুলি প্লাবিত করবার জন্যে। ভাড়াটিয়ারা নীচের তলায় থাকলে উপর হ'তে ময়লা জল ফেলেও তাদের উত্যক্ত করা হয়েছে। কেহ কেহ ইচ্ছা করে ভাড়া নেন নি এবং পরে বক্রী ভাড়ার জন্য নালিশ করে আদালতের সাহায্যে তাদের উচ্ছেদ করেছেন। পূর্ব্বে উপ-ভাড়াটিয়া (Sub-let) পদ্ধতি বে-আইনি ছিল। কোনও মালিক কোনও এক তাঁবের লোককে রসিদ কেটে দিয়ে তাকেই প্রকৃত ভাড়াটিয়া সাজিয়ে তার নামে এক নালিশ জুড়ে দিতেন। ঐ অলীক প্রতি-

বাদী আদালতে দোষ স্বীকার করে বা হাজির না হয়ে উচ্ছেদ মেনে নিয়েছেন। এইরূপ যোগসাজস মামলার নিষ্পত্তি একতরফাই হয়ে থাকে। ভিতরের ব্যাপার না বুঝে আদালত মালিকের পক্ষে ডিক্রি দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে উচ্ছেদের পরওয়ানাও। এরপর সহসা একদিন পুলিশ সহ আদালতের বেলিফ হাজির হয়ে ভাড়াটিয়াকে ঐ বাটী হ'তে বিতাড়িত করেছে। ভাড়াটীয়ারা আত্মসমর্থনের একটু মাত্রও সুযোগ পায় নি। আদালতের পরোয়ানা থাকায় এই সম্বন্ধে কাহারও কোনও প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয় নি।

এক্ষণে উপ-ভাড়াটিয়া (Sub-lease) আইনসম্মত হয়েছে। ভাড়াটিয়ারা উচ্ছেদ হ'লে বা চলে গেলে মালিকরা উপ-ভাড়াটিয়াদের প্রত্যক্ষ ভাড়াটিয়ারূপে মেনে নিতে বাধ্য। বহু ভাড়াটিয়া আইনের এই ফাঁকেরও সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। এরা ছয় সাত বা বৎসরাধিক ভাড়া বন্ধ করে দেয়। বাটীর মালিক তাদের আইনের সাহায্যে উচ্ছেদ করলে এরা পিছনের তারিখ দিয়ে রসিদ কেটে কোনও এক আত্মীয় বা স্বজনকে উপ-ভাড়াটিয়ারূপে বাড়ীর অর্দ্ধেকাংশ বা একটি কক্ষ ব্যতীত সম্পূর্ণ বাড়ীটি ভাড়া দিয়েছে—এইরূপ অবস্থার স্বষ্টি করে তারা স্থান ত্যাগ করেছে। এই অবস্থার উপ-ভাড়াটিয়ার বক্তব্য হয় যে তারা পূর্ব্বতন ভাড়াটিয়াকে এযাবৎকাল ভাড়া দিয়ে এসেছে, তবে এই দিন হ'তে এই একই হারে মালিককে ভাড়া দিতে তারা প্রস্তুত আছে। এই সুযোগে পূর্ব্বতন ভাড়াটীয়ার স্বজনবর্গ ঐ বাড়ীতেই পূর্ব্বের ন্যায়ই বসবাস করে। কেবলমাত্র যে ব্যক্তির নামে বাড়ীটি ভাড়া করা ছিল মাত্র তিনিই উধাও হয়ে যান। বলাবাহুল্য কয়েক মাসের ভাড়া বাবদ টাকা মেরে দিয়ে তিনি এই ভাবে পালিয়ে গিয়ে থাকেন।

কোনও কোনও ভাড়াটিয়া বাড়ীওয়ালাকে হায়রাণি করবার জন্যে

রেণ্ট কণ্ট্রোল অফিসে ভাড়া জমা দেওয়ার পক্ষপাতী। কেহ কেহ ২০ৎ টাকা খরচ করে বাটীটি মেরামত করে বিল্ তৈরী করেন, ২০০ৎ টাকার, এবং তার পর নিজ খরচে বাড়ী মেরামত করেছেন—এই অজুহাতে, (আইনের সাহায্যে) কয়েক মাসের ভাড়ার দায় হ'তে অব্যাহতি পেয়েছেন।

কয়েক মাস ভাড়া বক্রী রেখে গোপনে বাটী ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়াও এক সাধারণ ঘটনা। এই অবস্থায় বাটীর মালিক ভাড়া আদায়ের আশু পন্থা রূপে মালপত্র আটকে রেখে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানুষও যে না আটকান হয় তাও না। কিন্তু ইহা একপ্রকার অপরাধ, ইহাকে বে-আইনী আটক বা অবরোধ বলা হয়ে থাকে। মালিকের পক্ষে বলা হয় যে এই ভাবে না আটকালে তাদের ঠিকানা জানা যায় না এবং উহার অভাবে দেওয়ানজী মামলা দায়ের করা বা না করা সমান কথা। এ'ছাড়া এইরূপ মামলায় যথেষ্ট খরচ-খরচাও আছে। বস্তুতপক্ষে শহরে এমন বহু ব্যক্তি আছে যাদের পেশা হচ্ছে বাড়ী ভাড়া না দিয়ে বাস করা। এক বাড়ী হ'তে তাড়া খেয়ে ভাড়া মেরে তারা গোপনে অপর এক বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু কোনও মালিককেই তারা এক কপর্দ্দকও ভাড়া দেয়নি। কেহ কেহ বাড়ী ত্যাগ করবার সময় দরজা জানালা, ইলেকট্রিক লাইন ইত্যাদিও খুলে বা ভেঙে নিয়ে গেছে।

একই বাড়ীতে বহুক্ষেত্রে একাধিক ভাড়াটিয়া বাস করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় নানারূপ কলহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রধানতঃ জল কল, পায়খানা এবং পথ ও প্রাঙ্গণ ব্যবহার নিয়ে এই কলহের সৃষ্টি হয়। কোনও বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদের বহু আত্মীয় স্বজনের আনা-গোণা নানা কারণে পছন্দ করেন নি। এই সকল বিষয় নিয়েও মালিক

ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে কলহের স্বষ্টি হয়েছে। বেশী লোক বাস করলে জল কল ও পায়খানা ব্যবহারের অস্থবিধা ঘটে। এ'ছাড়া মেয়েছেলে থাকলে বাড়ীতে বহু অচেনা পুরুষ বারে বারে এলেও অস্থবিধা আছে। অন্যদিকে কোনও আপন জন এলে ভাড়াটিয়ারা তাদের তাড়িয়েও দিতে পারে না। এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ নানারূপ কলহের স্বষ্টি হয়ে থাকে।

বহুক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ার উৎপাতে বাটীর মালিককেই বাটী ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে। এজন্য কেউ কেউ বলে থাকেন নিজ বাটীর কোন অংশ কেহ যেন ভাড়া না দেন। ভাড়া দিলে, এক দিকে তাঁরা ভাড়া তো পাবেনই না। অন্যদিকে তাঁরা বাটীর ত্রিসীমানাতেও যেতে পারবেন না। সারা জীবনের অর্জ্জিত অর্থে নির্ম্মিত বাটী অপরের হয়ে যাবে। অবশ্য এই অভিযোগ সকল ক্ষেত্রে সত্য নয়।

অপরাধ—দ্যূত ক্রীড়া

"দ্যূত ক্রীড়া" একটি প্রাচীন অপরাধ। কিন্তু ইহা সকল যুগে এবং সকল দেশে অপরাধরূপে বিবেচিত হয় নি। একই দেশে এক কালে ইহা অপরাধরূপে বিবেচিত হ'লেও অপর এক কালে উহাকে অপরাধ মনে করা হয় নি। এমন বহু দেশ আছে, যেখানে ইহা অপরাধরূপে আজও বিবেচিত হত না। কোনও কোনও আধুনিক দেশে পূর্ব্বকালে ইহাতে দোষ ধরা হত না। কিন্তু দ্যূত ক্রীড়া যে আখেরে মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করে, তা বিবেচক মানুষ মাত্রেই স্বীকার করেছেন। এজন্য অধুনা-কালে সভ্য মানুষ এই সর্ব্বনাশী ক্রীড়াকে বে-আইনী ঘোষণা করেছেন।

এই ক্রীড়া দৈবের (Chance) উপর নির্ভর করে, নৈপুণ্য বা Skillএর উপর নির্ভর করে না। এই দৈব এবং নৈপুণ্যের প্রভেদ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই ক্রীড়া বিত্তশালীদের ধন-সম্পত্তি বণ্টনের সহায়ক হয়, কিন্তু গরীবদের ইহা সর্ব্বনাশ সাধন করে থাকে। দীন মজুরদের পক্ষে ইহা অতীব সত্য। কেহ কেহ এই ক্রীড়ার সাহায্যে প্রভূত ধন-সম্পত্তি আহরণ করেছেন, এইরূপ শুনা গিয়েছে। কিন্তু তা তারা করেছেন, বহু ব্যক্তিকে গরীব করে। কিন্তু এই সম্পত্তি তারা অধিককাল আয়ত্তে রাখতে পারেন নি। কারণ দ্যূত ক্রীড়া একটি সর্ব্বনেশে নেশাও বটে। এই নেশার বশে সম্পত্তির অধিকারীরা পুনরায় দ্যূত ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে তা অচিরে হারিয়ে ফেলেছেন। যে ধন দৈব তাদের দিয়েছিল সেই ধন পুনরায় দৈবের গর্ভে বিলীন হয়েছে। হার-জিত নিয়েই দ্যূত ক্রীড়া। প্রতিবারেই দৈব লক্ষ্মী একজনের কুক্ষিগত হয় না। গরীবরা এই সম্প্রত্তি-নাশ সকল সময় সহ্য করতে পারে নি, কেহ কেহ অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যাও করেছে। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমার এক বন্ধু এইদিন এসে বললো, 'ঘোড়দৌড়ে বাজী রাখবে? আমি শিউরে উঠে তাকে বলেছিলাম, 'মাপ করো, ও সবে আমি নেই।' একটু হেসে বন্ধু বললেন, 'এতো ভয়! আচ্ছা তোমার নামে আমি খেলবো, টাকাটা পরে দিয়ে দিও।' এই দিন সন্ধ্যায় ফিরে এসে তিনি বললেন, '৫০্ টাকা তোমার নামে ধরেছি। কি কপাল তোমার! ৫০্ টাকায় ৫০০্ টাকা পেয়ে গিয়েছো।' এরপর ঐ টাকা হ'তে ওর টাকা কেটে নিয়ে বক্রী ৪৫০্ টাকা বন্ধু আমাকে প্রদান করলেন। এই

অভাবনীয় অর্থ প্রাপ্তি আমাকে উতলা করে দিলে। এর পরদিন আমি বন্ধুর সঙ্গে মাঠে গিয়ে ৫০৲ টাকা বাজী রাখি। টাকাটা ছিল বাড়তি পাওনা। এই জন্য লোকসানের ভয় ছিল না। কপাল গুণে এই দিন আমি ১০০০৲ টাকা জিতে নিই। কিন্তু পরের কয়েক সপ্তাহে আমি ক্রমাগত হারতে থাকি। পরিশেষে ঐ ১০০০৲ টাকার মাত্র ৭০৲ টাকা অবশিষ্ট থাকে। এর পর বহুদিন আমি রেশ খেলিনি। এই ৭০৲ টাকাই আমার লাভ থেকে যায়।"

বহু বার হার হ'লেও মানুষ মনে করে যে পরের বার সে নিশ্চয়ই জিতবে এবং হারানো অর্থ তো সে ফিরে পাবেই, এমন কি বাড়তি বহু টাকাও সে পেয়ে যাবে। এই কারণে মানুষ স্ত্রীর গহনা এবং পৈতৃক বাটী বন্ধক দিয়েও অর্থ সংগ্রহ করেছে। সর্ব্বস্ব খুইয়ে বহু লোক আখেরে আত্মহত্যাও করেছে। নিম্নে এই সম্বন্ধে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"এই দিন ঘোড়দৌড়ের শেষে রেশ কোর্সের উপর দিয়ে আমি পাড়ি দিচ্ছিলাম। এমন সময় আমি পরিলক্ষ্য করলাম যে মাঠের মাঝে একটা লোক বিষ ভক্ষণ করে নেতিয়ে পড়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ২নং বাজীতে হেরে যাওয়ায় সে আত্মহত্যা করেছে। তার হাতের টিকিট দেখে আমি বুঝলাম ভদ্রলোক ভুল খবর পেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ধরা ঘোড়াই জিতেছে। কিন্তু বিশেষ চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হলো না।"

এই দ্যূত ক্রীড়া সকল সময়েই দৈব বা chance এর উপর নির্ভর করলেও সকল সময় ইহা সততার পথে পরিচালিত হয় না। ইহার মধ্যে বহু প্রবচঞ্চনাও দেখা গিয়েছে। দ্যূত ক্রীড়ার প্রকৃত সংজ্ঞা এবং ইহার সহিত প্রবঞ্চনার প্রভেদ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে পর-প্রবঞ্চনা, ঘুটী খেলা

এবং ফিতা খেলা, সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বিশদভাবে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মহাভারত হতে প্রাচীন ভারতের দ্যূত ক্রীড়া সম্বন্ধে আমরা অবগত হই। একজন ক্ষত্রিয় অপর এক ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে বা দ্যূত ক্রীড়ায় আহ্বান করলে উহা প্রত্যাখ্যান করার রীতি ঐ যুগে ছিল না। মহাভারতের উল্লিখিত দ্যূত ক্রীড়াতেও আমরা দেখেছি যে প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। ঠিক ঐরূপ পন্থায় বর্ত্তমান বিড্ গ্যাম্বলীঙে নওসেরা প্রবঞ্চকরাও মানুষদের ঠকিয়ে থাকে। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড দেখুন। এই কারণে এইরূপ দ্যূত ক্রীড়াকে আমরা দ্যূত ক্রীড়া বলি না, উহাকে আমরা বলে থাকি প্রবঞ্চনা। অলক্ষ্যে বা হাতের কায়দায় পাশার ছক বা তাসের বিবি পাল্টিয়ে বা সরিয়ে দিয়ে এইরূপ প্রবঞ্চনা সাধিত হয়েছে।

কলিকাতা সহরে বহু প্রকার দ্যূত ক্রীড়ার প্রচলন আছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্তরূপ ১২ প্রকারে দ্যূত ক্রীড়ার প্রচলন অধিক, যথা—(১) সাধারণ জুয়া, (২) বাকেট সপ্ বা রেশ গ্যাম্বলীঙ, (৩) ফটকা খেলা বা কাটনী জুয়া, (৪) চাঁদি খেলা বা সিলভার গ্যাম্বলীঙ, (৫) তুলা খেলা বা কটন গ্যাম্বলীঙ, (৬) বরখা জুয়া বা পাণি খেলা বা রেইন গ্যাম্বলীঙ, (৭) ফিতা খেলা, (৮) তেতাস, (৯) ম্যাচ গ্যাম্বলীঙ, (১০) বালা খেলা (১১) টারগেট খেলা (১২) হাঁড়ি খেলা, বাদাম খেলা, ইত্যাদি।

দ্যূত ক্রীড়া সকল কোনও এক ব্যক্তি বা দলের স্বার্থে সংগঠিত বা পরিচালিত হয়ে থাকে। এইরূপ ব্যক্তি বা দলকে বলা হয় চালক বা বৈঠো, অর্থাৎ যারা ইহা বসায় বা তা চালায়। ইংরাজীতে ইহাদের বলা হয় ডেন্-কিপার কেহ কেহ এদের আড্ডা সর্দ্দার বা মালিকও বলে। এই পরিচালকের অনুমতি পেলে তবে খেলোয়াড়রা আড্ডা ঘরে প্রবেশ

করতে পারে। দ্যূতক্রীড়কগণ অর্থাদি সহ আড্ডা ঘরে আসে এবং খেলায় অংশ গ্রহণ করে। এরা যে টাকা ধরে তা ভূমির উপর ন্যস্ত হয়। এই বিশেষ অর্থকে বলা হয়ে থাকে গ্রাউণ্ডমণি, বাংলায় ইহাকে বলা হয় নালের টাকা। যে সকল খেলোয়াড় অর্থ জেতে তাকে তার লভ্যাংশের একটা মোটা হিস্যা বা ভাগ পরিচালকদের প্রদান করতে হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিচালকরা ফি হিসাবে প্রত্যেক দ্যূতক্রীড়কের নিকট হতে ঐ অর্থ প্রারম্ভেই আদায় করে নিয়েছেন। অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়কগণ জিতুক কিংবা হারুক, এজন্য পরিচালকদের লোকসান নেই। এই খেলায় উহাদের সকল সময়ই লাভ থাকে। এর কারণ তারা লাভের ভাগ নেয়, কিন্তু লোকসানের ভাগ নেয় না। যদি কাহারও লাভ বা লোকসান না হয় তা'হলে নালের সকল টাকা পরিচালকই পেয়ে থাকে।

দ্যূত ক্রীড়া মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে, যথা—(ক) অন্দর-জুয়া এবং (খ) বহির-জুয়া। অন্দর-জুয়া বাটীর মধ্যে হয়ে থাকে এবং বহির-জুয়া পথে ঘাটে, অর্থাৎ উন্মুক্ত স্থানে বসানো হয়। ইংরাজীতে অন্দর-জুয়াকে "হাউস গ্যাম্বলীঙ" এবং বহির-জুয়াকে "ষ্ট্রীট গ্যাম্বলীঙ" বলা হয়। এই উভয় জুয়াই একজন পরিচালক, নাল গ্রাহক বা পরিচালক গোষ্ঠির বা দলের ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত হয়। এইবার প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার দ্যূত ক্রীড়া সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

(১) সাধারণ জুয়া,—এই জুয়া গৃহের মধ্যে এবং পথে সমভাবে বসানো হয়। সুগঠিত বড় বড় জুয়া সকল সময় অন্দর-জুয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ বহির-জুয়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই গরীব লোকের দ্বারা পরিচালিত হতে দেখা যায়। সাধারণ জুয়ার জন্য যে সকল সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়; ইংরাজীতে ইহাকে বলে গ্যাম্বলীঙ ইন্‌সট্রুমেণ্ট। তাস এবং ঘুটীই প্রধানতঃ দ্যূত ক্রীড়ার সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঘুটী

পরিচালনের জন্য চৌকো ঘর আঁকা কাগজ বা কাপড়ও থাকে। বহুক্ষেত্রে পাশা খেলার জন্য ঘর আঁকা বোর্ড এবং ডাইসও ব্যবহৃত হয়েছে। এই ঘুঁটী বা ডাইস আঁকা বোর্ডের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কেহ কেহ এজন্য ফুটকী আঁকা ডাইসও ব্যবহার করেছেন। কৌটার মধ্যে নেড়ে নেড়ে এই ছক ফেলা হয়। সাধারণ জুয়া বহু প্রকারের হয়ে থাকে। প্রতিদিনই এইজন্য নূতন সাজসরঞ্জাম আবিষ্কৃত হচ্ছে। এই জুয়ার বহু পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতি সহজে সকলের বোধগম্যও হয় না। এই সকল কায়দা-কানুন ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার কেবলমাত্র দ্যূতক্রীড়কদেরই (গ্যাম্বলার বা জুয়াড়ী) শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর পদ্ধতি সমূহ নিজেরা না বুঝলে আদালতকে তা বুঝানো যায় না। এই কারণে বহু শান্তিরক্ষক আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসে বোকা বনে গিয়েছেন।

জুয়ার আড্ডার আসবাবপত্র,—সতরঞ্চ বা গালিচা, চৌকী বা টেবিল এমন কি বৈদ্যুতিক পাখাকেও জুয়ার সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে ধরা যেতে পারে এবং এই আড্ডা ঘরে খেলোয়াড় বা অখেলোয়াড় বা দর্শক, যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও উদ্দেশ্যে আসুক তাকে দ্যূতক্রীড়ক বলে ধরে নেওয়া হয়। জুয়া প্রমাণ করবার জন্যে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করার নিয়ম, যথা—(১) দ্যূতক্রীড়কদের নিকট কিছু পয়সা-কড়ি থাকবে, (২) ভূমির উপর নালের টাকা এবং জুয়ার যন্ত্রপাতি পাওয়া যাবে, (৩) জুয়ার একজন পরিচালক বা নাল-গ্রাহক থাকবে। এই ব্যক্তি অকুস্থলে উপস্থিত থাকতে পারে কিংবা সে সেখানে উপস্থিত নাও থাকতে পারে।

এই সাধারণ জুয়ার ধারা সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে "অপরাধ তদন্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি আলোচনা করবো। সাধারণ জুয়ার পরিচালকরা

ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে থাকে। এদের পুলিশ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সতর্ক দেখা যায়। পুলিশের সহিত বন্দোবস্ত করতে অপারক হ'লে এরা নিজেদের জন্য পৃথক রক্ষী এবং গোয়েন্দা নিয়োগ করে। এই সকল গোয়েন্দা বস্তির মোড়ে মোড়ে পুলিশের জন্য অপেক্ষা করে এবং পুলিশের গাড়ী দেখা মাত্র সঙ্কেত দ্বারা পরিচালককে সাবধান করে দেয়। পরিচালকগণ সংবাদ পাওয়া মাত্র খেলোয়াড়দের চোরা দরজা দিয়ে বার করে দেয় এবং অকুস্থলের জুয়ার সাজ-সরঞ্জাম ত্বরিত গতিতে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। বহুক্ষেত্রে জুয়ার আড্ডার সুদৃঢ় কক্ষের দরজা লৌহ নির্ম্মিত হয়। পুলিশ এই দোরে বারে বারে ধাক্কা দেয় কিন্তু উহা খুলতে কিংবা ভাঙতে পারে না। এই সুযোগে জুয়ার সাজ-সরঞ্জাম দ্রুতগতিতে সরিয়ে ফেলা হয়। বড় বড় জুয়া সাধারণতঃ গভীর রাত্রে খেলা হয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টী বুঝা যাবে।

"এই দিন অধিক রাত্রে আমরা জানতে পারি যে ঐ বাড়ীতে জুয়া বসেছে। পূর্ব্বাহ্ণেই সংবাদদাতাকে কিছু অর্থ দিয়ে ওদের সঙ্গে জুয়া খেলতে পাঠালাম। এর পর রাত্রি দেড় ঘটিকায় সিপাই শাস্ত্রী সহ ঐ আড্ডাখানায় হানা দিই, কিন্তু লোহার দরজা খুলতে পারি না। বার বার ধাক্কাধাক্কির পর আধঘণ্টা বাদে একজন দরজাটা খুলে দিলে। এই সময় অবাক হয়ে আমরা পরিলক্ষ্য করি প্রায় ত্রিশ জন লোক একটা জলচৌকী ঘিরে বসে রয়েছে এবং এই চৌকীর উপর একটী ভাগবত গ্রন্থ রেখে এক ব্যক্তি তা পাঠ করছে। এদের একজন আমাকে সম্বোধন করে বললে, 'হিঁয়া পূজা হোতা, বাবু সাব। লেকেন বাত কেয়া?' এই দলের মধ্যে আমার ইনফরমারও বসে ছিল। সে আড়চোখে জানালার একটা তাক দেখিয়ে দিল। তাকের উপর হতে আমরা হাজার দুই টাকা, তিন জোড়া তাস, কয়েকটী ফুটকী কাটা ছক, ঘুঁটী এবং

কৌটা সহজেই আবিষ্কার করলাম। এ ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির পকেট, জেব এবং গাঁট হতে আরও দুই তিন হাজার টাকা আমরা বার করে নিলাম। বলা বাহুল্য যে নালের টাকা এবং জুয়ার যন্ত্রপাতি পুলিশের আগমনে ওরা ঐখানে লুকিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু আমাদের সাক্ষিগণ স্বচক্ষে এদের জুয়া খেলতে না দেখায় এরা যে জুয়া খেলছিল তা আমরা প্রমাণ করতে পারিনি।"

জুয়া এমনই এক নেশা যে এই খেলার জন্য মানুষ চুরি করে বা লোক ঠকিয়েও অর্থ সংগ্রহ করে। কেহ পরিবারের গহনা এবং পৈতৃক বাটী বিক্রয় করেও উহা সংগ্রহ করেছে। এই সকল আড্ডা গৃহে বহু চোর গুণ্ডাদেরও দেখা গিয়েছে। জুয়ার মধ্যে জুয়াচুরী কেহ পছন্দ করে না; এইজন্য বেপরোয়া লোক কর্তৃক বহু খুন খারাপিও হয়ে গিয়েছে।

বড় জুয়া কখনও একস্থানে অধিক দিন চলে না। পুলিশের নজর এড়াবার জন্যে এক কুঠি হতে অপর কুঠিতে জুয়ার আড্ডা সরিয়ে নেওয়া হয়। এইরূপ স্থানপরিবর্ত্তন প্রতি সপ্তাহে একবার বা দুইবার করা হয়ে থাকে। এক থানার এলাকা ছেড়ে অপর থানার এলাকাতে সরে যাওয়ারও রীতি আছে।

(২) রেইশ গ্যাম্বলীঙ,—এই জুয়ার আড্ডাকে বাকেটসপ্ বলা হয়। সাধারণতঃ চায়ের দোকানে এই জুয়া হয়। এমন কি অফিস এবং বাস-গৃহেও ইহা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলিকাতা, টালিগঞ্জ, বারাকপুর প্রভৃতি রেশ কোর্সে যে ঘোড়দৌড় হয় এবং উহার উপর যে বাজী রাখা হয়। তাহাকে অবৈধ জুয়া বলা হয় না, যদিও ইহা জুয়া ছাড়া অপর কিছুই নয়। আইন দ্বারা রেস কোর্সের ভিতরকার ষ্টুয়ার্টগণ পরিচালিত এই জুয়া বৈধ করা হয়েছে। এই রেস কোর্স সমূহ হ'তে বহু অর্থ ট্যাক্স বাবদ সরকারী তহবিলে জমা

হয়। এই জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা সহসা বন্ধ করা সম্ভব নয়। আজও ইহা বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত। কিছু অর্থ যদি এইভাবে তারা এদেশে খরচ করে, তো ক্ষতি নেই। এইজন্য এই জুয়া এখনও এদেশে বৈধ আছে। উপরন্তু মানুষের জুয়া খেলার স্বাভাবিক স্পৃহা এতদ্বারা বৈধ পথে নিবৃত্তি হয়ে যায়। কিন্তু এই জুয়াকে অবলম্বন এবং উপলক্ষ করে যে অবৈধ জুয়া সহরে চলে তাহাকে বলা হয় রেইশ গ্যাম্বলীঙ। কিরূপে ইহা পরিচালিত হয় তা এইবার বলা যাক।

এই জুয়ার অবৈধ পরিচালকদের বলা হয় "বুকিই"। এই বুকিইগণ ধনী এবং চতুর হয় এবং ইহারা প্রত্যক্ষভাবে এই জুয়ার সংশ্লিষ্ট থাকে না। এই বুকিইগণের অধীনে বহু "পেন্‌সিলার" বা লিপিকার নিযুক্ত থাকে। রেশ-গাইড বা বাজীর অগ্রিম পুস্তক সহ এই লিপিকার-গণ চায়ের দোকান, বাটীর রোয়াক, পানের দোকান, অফিস বা বাসগৃহে শনিবার বৈকালে উপস্থিত হয়। খেলোয়াড়গণ এই সকল নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে বাজী রাখে। ছোট ছোট স্লিপ বা চিরকুটে ক্রীড়কগণ তাদের মনোনীত ঘোড়ার নম্বর সঙ্কেতে লিখে রাখে, যথা— "১—২ বা ২—৩ বা ৩—১" অর্থাৎ ১ নম্বরের বাজীর ২ নম্বর ঘোড়া, ২ নম্বরের বাজীর ৩ নম্বরের ঘোড়া, ৩ নম্বরের বাজীর ১ নম্বর ঘোড়া। এই ভাবে ঘোড়াগুলি ধরে জুয়াড়ীরা ঘোড়া পিছু ধরা অর্থ পেন্‌সিলারের নিকট জমা দেয়। পেন্‌সিলার এরপর জুয়াড়ীদের নাম-ধাম টুকে নিয়ে এবং ঐ স্লিপগুলি সংগ্রহ করে তারা ঐ গুলি স্ব স্ব বুকিইর কাছে পৌঁছে দেয়। এক এক বুকিইর নিকট বহু পেন্‌সিলার কর্ম্মবহাল থাকে এবং এজন্য তারা নিয়মিত পারিশ্রমিকও পায়। লাভ লোকসানের যা কিছু দায়িত্ব তা বর্ত্তায় এই বুকিইদের উপর। কারণ তাদেরই ভাগ্যবান জুয়াড়ীকে

পেমেণ্ট বা অর্থদান করতে হয়। পরদিন রবিবার এরা জানতে পারে তাদের ধরা ঘোড়াগুলির ভাগ্যে কি ঘটেছে। এক কথায় রেশ কোর্সে না গিয়েই তারা ঘোড়দৌড়ের বাজী রাখে। পরদিন পেনসিলারগণ ভাগ্যবান জুয়াড়ীদের প্রাপ্য অর্থ ঐ আড্ডা স্থানে এসে বুঝিয়ে দেয়। এই অর্থ তারা বুকিইদের নিকট হ'তে হিসাব করে নিয়ে আসে। এজন্য এরা বিশেষ কমিশনও পেয়ে থাকে।

পুলিশ এই সকল বাকেট সপে হানা দিয়ে মাত্র পেনসিলার এবং জুয়াড়ীদের ধরতে পেরেছে, কিন্তু মূল পরিচালক বুকিইদের গাত্র স্পর্শও করতে পারে নি। কারণ ইহারা অকুস্থলে কখনও হাজির থাকে নি।

শান্তিরক্ষকগণ তিনপ্রকারে এই রেইশ-গ্যাম্বলীঙ বন্ধ করতে পারেন। এই বিশেষ পন্থা ত্রয় নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

(ক) শনিবার সকালে কিংবা বিকালে যে সময় রেশ কোর্সে রেশ চলে এবং যে সময় শহরের বিভিন্ন স্থলে এই উপলক্ষে জুয়া চলে, সেই সময় এই অবৈধ আড্ডা গৃহে শান্তিরক্ষকরা হানা দিতে পারেন। বহু স্থলে জুয়া ভালোরূপে জমবার পূর্ব্বেই হানা দেওয়া হয়েছে। এইজন্য সমধিক সফলতা লাভ করা যায় নি। শান্তিরক্ষকগণ এই স্থানে উপরোক্তরূপ বহু স্লিপ, মুদ্রা ও কাগজ পেনসিল পেতে পারেন এবং জুয়াড়ীদের গ্রেপ্তার করতে পারেন।

(খ) ছদ্মবেশে আড্ডার বাহিরে অপেক্ষা করলে শান্তিরক্ষকগণ দেখবেন যে উপ-পরিচালক বা পেনসিলার একটী পুঁটলী করে বা বড় পকেটে ভরে বহু স্লিপও নামের লিষ্ট, কোনও কোনও সময় দশ বারো হাজার টাকা নিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে আসছেন। সকল ক্ষেত্রে তাঁরা যে পায়ে হেঁটে আসে না তা নয়। বহুক্ষেত্রে এঁরা বুকিইদের নিজস্ব

মোটরকারেও আনাগোণা করেন। এই পেনসিলাররা বিচক্ষণ এবং চতুর হয়ে থাকে। এদের গ্রেপ্তার করলে কিছুদিনের জন্য এই জুয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

(গ) এই পেনসিলারগণ প্রাণের বিনিময়েও তাদের নিয়োগ কর্ত্তা বুকিইর নাম-ধাম বলতে স্বীকৃত হয় না। এইজন্য এই পেনসিলারকে গোপনে অনুসরণ ক'রে বুকিইর বাটী পর্য্যন্ত গেলে ভাল হয়। যে সময় এরা তার কাছে টাকা এবং শ্লিপ জমা দেবে সেই সময় উভয়কেই গ্রেপ্তার করা যায়। বুকিইগণ এই জুয়ার ফাইনেন্সার হয়ে থাকে। তাকে ধরলে এই জুয়া এমনিই বন্ধ হ'য়ে যাবে। এ ছাড়া এই বুকিইর বাটীতে অন্যান্য পেনসিলারদেরও* অর্থ এবং শ্লিপসহ সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। বুকিইদের মোটরে অর্থ ও শ্লিপসহ পেনসিলারদের ধরতে পারলে এই ব্যাপারে বুকিইদের সহজে দায়ী করা যেতে পারে। এ'ছাড়া মোটর-কারটীকে জুয়ার সাজসরঞ্জামের একটী অঙ্গরূপে ধরে উহা আদালতে পেশ করলে মোটরকারটী বাজেয়াপ্ত করলেও করতে পারে।

এই জুয়ার জন্য বিচারে সামান্য অর্থদণ্ড হয় মাত্র। অধিক অর্থ-দণ্ডকেও এই সকল ধনী ব্যক্তিরা ভয় করে না। এইজন্য অর্থদণ্ডের পরও এরা পূর্ব্বের ন্যায়ই এই লাভজনক ব্যবসায়ে রত থাকে। শান্তিরক্ষকদের উচিত উপরোক্ত উপায়ে বুকিই এবং তার কয়েকজন পেনসিলারকে পাকড়াও করে একটী গ্যাঙ্গ কেস দায়ের করা, যাতে করে তাদের অর্থ-দণ্ডের স্থলে দীর্ঘকালীন মেয়াদ বা জেল হতে পারে। এতে একজন রাজসাক্ষী বা এপ্রুভার পেলে আরও ভালো হবে।

---

* একজন বুকিইর বহু পেনসিলার আছে। সারা সহরময় এই পেনসিলারগণ ছড়িয়ে থাকে।

(ঘ) ফাটকা খেলা বা কার্টনি জুয়া একমাত্র কলিকাতার রয়েল এক্সচেঞ্জের চতুষ্পার্শ্বের রাস্তাতে দেখা যায়। তেজী মন্দা, ভাউ এবং দ্রব্যাদির উঁচু নীচু দর উপলক্ষ করে এই জুয়ার অবতারণা করা হয়েছে। রয়েল এক্সচেঞ্জের অফিস-হলে এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের "শেয়ার পিছু দর" এক একদিন এক এক প্রকার দৃষ্ট হয়। এই দ্রব্যাদি এবং শেয়ারের দরের উঠা নামার সুযোগে জুয়াড়ীরা জুয়া খেলে। এই জুয়া খেলায় জুয়াড়ীরা মুখে মুখে ক্রয় বা বিক্রয় করে, ঐরূপ কোনও দ্রব্য নিজেদের দখলে না থাকা সত্ত্বেও। অর্থাৎ মুহুর্মুহুঃ দ্রব্য এবং শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হলেও ঐরূপ কোনও দ্রব্য বা শেয়ারের অস্তিত্ব থাকে না। একজন হয়তো বললো, ১০ শেয়ার অমুক কোম্পানীর, এক এক শেয়ার ১০০ রূপেয়া ভাউকো। উত্তরে অপর একজন হয়তো বললো, ঠিক হ্যায় ভাই, খা'লেয়া অর্থাৎ নিয়ে নিলাম। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই লেন-দেন মাত্র কাগজে কলমে হলো। কোনও ভাও বা শেয়ারের প্রকৃত লেন-দেন সেখানে হলো না। কারণ যে ব্যক্তি বিক্রি করলে তার ঐ শেয়ার বা দ্রব্যের উপর কোনও অধিকার নেই। এই জুয়া খেলা একটা বা দুইটার পূর্ব্বে সাধিত হয়। কারণ এর ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ অফিস ঐ সময় বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ দুইটার পর কেনা-বেচার বাজার বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে। পরের দিন শেয়ার বাজার পুনরায় খুললে দেখা যাবে যে ঐ শেয়ার বা দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। এইজন্য জুয়াড়ীদের ভাগ্য বা জয় পরাজয় নির্ভর করে পরের দিন বাজারের নির্দ্ধারিত দরের উপর। পূর্ব্বদিন জুয়ায় হয়তো এক ব্যক্তি ১০৲ টাকা মূল্যের দশখানি শেয়ার মুখে মুখে কিনেছিলো। পরের দিন ঐ ক্রেতা দেখলো ঐ শেয়ারের বাজার দর শেয়ার পিছু ২৲ টাকা কমে গেছে অর্থাৎ তার ২০৲ টাকা লোকসান হয়েছে, তখন তাকে ব্যালেন্স বা পার্থক্যের ২০৲ টাকা

ক্রেতাকে প্রদান করতে হবে। সে যদি দেখতে পেতো যে বাজার দর শেয়ার পিছু ২৲ টাকা বেড়ে গেছে তা'হলে সে বিক্রেতার নিকট উভয় অঙ্কের পার্থক্য ২০৲ টাকা আদায় করে নিতো। এই কারণে শেয়ার বাজার বন্ধ হওয়ার পর এই জুয়াও বন্ধ হয়ে যায় এবং পরদিন শেয়ার বাজার খুললে ইহা পুনরায় সুরু করা হয়। ভাগ্যবান জুয়াড়ীকে পেমেণ্ট বা অর্থ পরের দিনবাজার দর জানবার পর প্রদান করা হয়ে থাকে ; অর্থাৎ যেদিন জুয়া খেলা শেষ হয়, তার পরের দিন লাভের অর্থ বণ্টন করা হয়ে থাকে।

এই জুয়া খেলারও একজন পরিচালক থাকে। পূর্ব্বাহ্নে জুয়াড়ীদের নিকট নাম রেজিষ্টারী করতে হয়। যে সকল ব্যক্তির নাম এই পরিচালকের তালিকাভুক্ত হয়, কেবলমাত্র তাদেরই এই খেলায় যোগ দিতে দেওয়া হয়েছে। জুয়াড়ীদের তালিকাভুক্ত করার দায়িত্ব এই পরিচালকের। যাকে তাকে এই দ্যূতমণ্ডলীর সভ্য করা হয় না। কেবলমাত্র ধনী এবং দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এই মণ্ডলীর (Association) সভ্য করা হয় ; কারণ সভ্যগণ সদ্য সদ্য মণ্ডলীতে জুয়ার দেয় টাকা জমা দেয় না। যারা হেরে যায় তারা পরের দিন জেতৃদের প্রাপ্য টাকা দিয়ে আসে। এই বিষয়ে এদের মধ্যে অত্যদ্ভুত সততা পরিলক্ষিত হয়েছে। কেহ হয়তো পরের দিন জানলো যে সে এক লক্ষ টাকা হেরে গিয়েছে। ইচ্ছা হলে সে অতো টাকা মণ্ডলীতে জমা নাও দিতে পারতো। আইনতঃ সে তা জমা দিতে বাধ্যও না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সর্ব্বস্বান্ত হয়েও তার মুখের জবানী ঠিক রাখে। বহুক্ষেত্রে জুয়াড়ীরা পৈতৃক বাটী এবং স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করেও প্রতিশ্রুতি মত ঐ অর্থ মণ্ডলীতে জমা দিয়েছে। যদি কেহ কোনও দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বেইমানি করে বসে তা'হলে ব্যবসায়ী নাগরিকগণ বৈধ বা অবৈধ,

কোনও লেন-দেন তার সহিত করে না—মড়োয়ারী সমাজে তাদের বদনাম এতো অধিক হয় যে তার পক্ষে শহরে বাস করাও সম্ভব হয় না। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বয়কটের চাপে তাকে অচিরে দেশত্যাগী হতে হয়।

এই জুয়া মাড়োয়ারীদেরই একচেটিয়া। রয়েল এক্সচেঞ্জ অফিসের সম্মুখে পথের উপর মাড়োয়ারীদের একটা বড় ভীড় অনেকেই দেখেছেন এবং তাদের কাউকে কাউকে হৈ চৈ করে অবোধ্য ভাষায় কথাও বলতে শুনেছেন। এই ভীড়টী প্রায়ই জুয়াড়ীদের ভীড় এবং এই জুয়াকে বলা হয় কাটনী জুয়া। অপরাপর জুয়ার সহিত ইহার প্রভেদ এই যে এতে মামুলী ব্যক্তি যোগ দেয় না। ব্যবসা বুঝে এমন বুদ্ধিমান ধনী ব্যবসায়ীরা মাত্র এতে যোগ দেয়।

এই জুয়া বন্ধ করতে হলে পরিচালককে খুঁজে বার করতে হবে। পরিচালকদের নিকট জুয়ার কাগজপত্র পাওয়া যাবে। এই কাগজপত্র হতে জুয়া প্রমাণ করা সহজ। পরিচালকরা এই জুয়া হতে নিয়মিত কমিশন পায়। এই পরিচালক নামাধেয় ব্যক্তিকে 'ডেন কিপার' আখ্যাও দেওয়া যেতে পারে।

(৩) চাঁদি খেলা বা সিলভার গ্যাম্বলীঙ,—এই জুয়াও ব্যবসায়ীদের একচেটীয়া। কটন ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে এই খেলার প্রচলন আছে। চাঁদির তেজীবামন্দা ভাউ বা দর উপলক্ষ করে এই জুয়ার প্রচলন হয়েছে। এই দর জানবার জন্য বোম্বে প্রভৃতি শহরের অফিস সমূহে এই সকল জুয়াড়ীদের আড্ডাস্থল হ'তে মুহুর্মুহুঃ টেলিফোন করা হয়। বহুক্ষেত্রে লণ্ডন আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হতেও বেতারযোগে খবর আনানো হয়েছে। সাধারণ টেলিগ্রাফেরও সাহায্য নেওয়া হয়। কাটনী জুয়ার পদ্ধতিতেই এই জুয়া খেলা হয়ে থাকে। ইহার মণ্ডলী সংগঠনও ঐ একই পদ্ধতিতে গঠিত।

জুয়াড়িগণ এই খেলায় কৃতকার্য্যতার জন্য দেশ বিদেশের বাজার সরবরাহ, পরিবহন, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনসমূহ মনোযোগ এবং ধৈর্য্যের সহিত অনুধাবন করে ; কারণ এই পরিবর্ত্তনের উপর চাঁদির বাজারের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

(৪) তূলা খেলা বা কটন গ্যাম্বলীঙ,—এই জুয়া কটন ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে খেলা হয়। উপরোক্ত পদ্ধতিতে এই জুয়া পরিচালিত হয়। ইহার মণ্ডলী সংগঠনও ঐ একই প্রকারের। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা এই খেলা খেলে থাকে। তূলার বাজার দর উপলক্ষ করে এই জুয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এই খেলা এক শ্রেণীর মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া।

বহু ব্যবসায়ীদের জীবন ইতিহাস অনুধাবন করে দেখা গেছে যে, তারা উপরোক্ত জুয়া হতে ক্রোড়পতি হয়েছে। প্রথমে এই জুয়া হতে বহু অর্থ উপার্জ্জন করে তারা ঐ অর্থ বৈধ-ব্যবসায় এবং কলকারখানায় প্রয়োগ করে বড় ব্যবসায়ী হয়েছেন। বহু মধ্যবিত্ত মাড়োয়ারী আজও এই জুয়া হতে ব্যবসায় বা উদ্যোগ-শিল্পের জন্য মূলধন আহরণে সচেষ্ট। এই সকল খেলা নিঃস্বকে যেমন ধনী করেছে, ধনীকেও তেমনি ইহা নিঃস্ব করেছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে ঐ মাড়োয়ারীরা এ খেলা হ'তে কিছু অর্থোপার্জ্জন করার পর ঐ খেলায় পুনরায় আত্মনিয়োগ করে নি। তারা এরূপে উপার্জ্জিত অর্থ মূলধন স্বরূপ বৈধ ব্যবসায় নিয়োগ করে প্রচুর বিত্ত লাভ করেছে। এই খেলা সকল সময় দৈবের উপর নির্ভর করে না। বরং উহা খেলোয়াড়দের বুদ্ধিবৃত্তি, পরিশ্রম, ব্যবসায়-জ্ঞান, সংবাদ সংগ্রহের উপর অধিক নির্ভর করে। এইদিক হ'তে বিচার করলে ইহা প্রকৃত জুয়া কি'না তাতে সন্দেহ আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পৃথিবীর পরিস্থিতির উপর কোনও দ্রব্যের মূল্য বাড়বে বা

কমবে তা বুঝা যায়। কিন্তু ইহা উপলব্ধি করতে হলে সংবাদ সংগ্রহ, ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তির প্রয়োজন।

(৫) বরখা জুয়া—ইংরাজীতে ইহাকে রেইন গ্যাম্বলীঙ (Rain Gambling) বলে। আদপে বৃষ্টি হবে কিংবা হবে না এবং বৃষ্টি হলে তা কতো ইঞ্চি পরিমাণ হবে—এই তথ্যের উপর এই জুয়া পরিকল্পিত হয়েছে। বহুক্ষেত্রে মাটিতে গর্ত্ত করে কিংবা একটী পাত্র স্থাপন করে—ঐ গর্ত্ত বা পাত্রে একটী স্কেল (পরিমাপ কাঠি) রক্ষা করা হয়। এই ইঞ্চির স্কেলের উপর জলের হ্রাস বা বৃদ্ধির উপর বাজী রাখা হয়। বড়বাজার অঞ্চলে ছাদের জল নালা বেয়ে ড্রেনে পড়ে। এই ড্রেনের মুখে পাত্র স্থাপন করে কিংবা উহার মুখ বন্ধ করে দিয়ে জল মাপা হয়েছে। জ্ঞানী জুয়াড়ীরা আকাশের অবস্থা হতে এই সম্বন্ধে ধারণা করে নেয়। কেহ কেহ এই সম্পর্কে হাওয়া অফিসেও বিশেষরূপে খোঁজখবর করে থাকে।

খেলা-ধুলাকে উপলক্ষ করেও বহু জুয়া প্রবর্ত্তিত হয়েছে। ফুটবল ম্যাচের সময় এই জুয়া হামেসা খেলা হয়ে থাকে। ফুটবল ম্যাচে হার জিতের উপর এই জুয়া নির্ভর করে। এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা বাজী ধরা হয়।

জুয়া সকল সময় সৎ পথে পরিচালিত হয় নি। অর্থাৎ বহুক্ষেত্রে উহা ভাগ্যের উপর নির্ভর করা হয় নি। বরং এই ব্যাপারে জুয়াচুরীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ফুটবল ম্যাচের জুয়ায় উৎকোচ প্রদানের প্রথা আছে। কোনও এক খেলোয়াড় দল ক্রীড়া-নৈপুণ্যে অপরাজেয়। কারণ তাদের বিরুদ্ধ পক্ষীয় দলে ভালো খেলোয়াড় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও এক জুয়াড়ী এই দুর্ব্বল পক্ষের উপর লক্ষ টাকা বাজী রাখলো। এর পর এই জুয়াড়ী সবল দলের এক উৎকৃষ্ট খেলোয়াড়কে

দশ সহস্র টাকা উৎকোচ দান করলো। পরিবর্ত্তে ঐ জুয়াড়ী তাকে নির্দ্দেশ দিল যে সে যেন ঐ দিন ভালো না খেলে। কিংবা ঐ দিন যেন তারা পরাজয় মেনে নেয়। এই ব্যাপারে খেলোয়াড় দলের একাধিক ব্যক্তিকে উৎকোচে বশীভূত করা হয়েছে। বহু খেলোয়াড় এমনই দরিদ্র যে দশ বিশ হাজার টাকা তাদের নিকট স্বপ্ন। এই অবস্থায় লোভ দমন করা তাদের পক্ষে কঠিন। এই কারণে ভালো ভালো দলকে অভাবনীয় ভাবে আমরা পরাজিত হতে দেখেছি। ক্রিকেট খেলার ব্যাপারেও এইরূপ জুয়া খেলার কাহিনী আমরা শুনেছি। টেনিস এবং অপরাপর জনপ্রিয় খেলা উপলক্ষেও এই জুয়া হয়ে থাকে।

জুয়ার জুয়াচুরীর প্রথম প্রবর্ত্তক মহাভারতোক্ত গান্ধাররাজ শকুনি। ঐ দিন হ'তে আজও পর্য্যন্ত জুয়াড়ীদের কেহ কেহ জুয়াচুরীর আশ্রয় নিয়ে থাকে। বৈধ রেশ খেলায় এইজন্য ভালো ঘোড়ার জকিদের লক্ষ লক্ষ টাকা উৎকোচ দেওয়া হয়েছে। ঐ ঘোড়াকে রাশ টেনে অসাধু জকি ইচ্ছা করে হারিয়ে দিয়ে থাকে। যে ঘোড়া প্রতিদিন প্রথম হচ্ছে তাকে সহসা একদিন তৃতীয় স্থানে নামতে দেখে আমরা হতভম্ব হই, কিন্তু ইহার মূলে কোনও জুয়াড়ী থাকলেও থাকতেও পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর অশ্বকে প্রারম্ভে মদ্যপান করিয়ে তাকে তেজী করা হয়েছে। কিন্তু ইহাও এক প্রকার জুয়াচুরী। এইরূপ ক্ষেত্রে অশ্বের মূত্র-পরীক্ষার রীতি আছে। মূত্র পরীক্ষার পর কোনও এক জকির এজন্য সাজাও হয়েছিল।

কতকগুলি জুয়া আছে, যা মাত্র প্রতারণার কারণে পরিকল্পিত হয়েছে। এই জুয়ার মধ্যে কৃতিত্ব, নৈপুণ্য বা দৈবের কোনও সম্বন্ধ নেই। কেবলমাত্র প্রবঞ্চনার কারণে এই খেলা হয়ে থাকে। এই সকল প্রতারক দলের মধ্যে নওসেরা প্রবঞ্চকরা অন্যতম।

তেতাস, ফিতা খেলা এবং বিড্ গ্যাম্বলীঙ—এই শ্রেণীর জুয়া। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবঞ্চনা শীর্ষক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এ ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জুয়া সকল সময় দৈব বা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। নৈপুণ্যের উপর উহা নির্ভর করে না। বালা খেলা প্রভৃতি কয়েকটি খেলা আছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে উহা নৈপুণ্যমূলক মনে হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা দৈব জুয়া বা প্রতারণা। নৈপুণ্যের কথা শুনিয়ে খেলাকে ভাগ্যের গণ্ডীতে আনাও এক প্রকার প্রবঞ্চনা। ধরুন কিছুদূরে একটী কাঠের বোর্ডে কয়েকটী লৌহ শল্কা আঁকা আছে। দূর হতে এক লৌহ বালা খেলোয়াড়রা ছুঁড়ে দিলে। এই বালা ঐ শল্কাতে আটকে গেলে হবে জিত; তা না হলে হবে হার ; এই পদ্ধতিতে বালা খেলা হয়ে থাকে, কিন্তু এমন দূরে শল্কা যুক্ত বোর্ড রাখা হয় যাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাগ্ রক্ষা করা সম্ভব নয়। এইজন্য এই খেলাতে খেলোয়াড়রা জেতে খুব কম। কোনও কোনও ক্ষেত্রে চুম্বক প্রস্তর শল্কার নীচে রেখে লৌহ বলয়ের গতি ভ্রষ্টও করা হয়েছে।

তীর ধনুক এবং ছোট রাইফেল দ্বারা লক্ষ্য ভেদ উপলক্ষ করেও জুয়া পরিকল্পিত হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটী দীর্ঘ লৌহ দণ্ডের উপর একটী ঘণ্টা এবং নিম্নে অর্দ্ধোন্মুক্ত লৌহ পাত সংযুক্ত করা হয়েছে। খেলোয়ড়েরা নিম্নের লৌহ পাতে হাতুড়ীর ঘা দিলে এক টুকরা লৌহ বেগে ঐ দণ্ডের গা বেয়ে উপরের ঘণ্টায় আঘাত করে। কিন্তু লৌহদণ্ডটী এতো দীর্ঘ করা হয় যে ঐ লৌহ টুকরা প্রায়ই উপর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। কিন্তু খেলার পরিচালক উহা উপর পর্য্যন্ত পৌঁছানোর কায়দা অবগত। ঐ ব্যক্তি নিম্নের লৌহ পাত এ্যাডজাষ্ট করে উপর পর্য্যন্ত উহা উঠিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করে। প্রথমে মালিকরা আপন দলের ব্যক্তিদের

এই সকল জুয়াতে মুহুর্মুহুঃ জিতিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে উহাতে আকৃষ্ট করে। বহু ব্যক্তিকে জিততে দেখে লোভী মানুষ জুয়া খেলায় আকৃষ্ট হয়েছে। নৈপুণ্যমূলক জুয়ার পদ্ধতি বহু প্রকার। বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি কার্নিভ্যাল, একজিবিসন উপলক্ষে নৈপুণ্যমূলক খেলার অজুহাতে এই সকল খেলার জন্য অনুমতি সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু প্রায়শক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এঁরা এতদ্বারা বর্ণচোরা জুয়া এবং প্রবঞ্চনার প্রবর্ত্তন করেছেন। কেহ কেহ বন্যা, দুর্ভিক্ষ-দুর্গত জনগণের সাহায্যের অজুহাতে কর্ত্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করে এই জন্য অনুমতি পেয়েছেন।

এই সকল মেলাতে চক্রঘড়ীর জুয়া অধিক দেখা যায়। এই খেলায় ঘড়ীর কাঁটা যুক্ত বড় ডায়েল তৈরী করা হয়। এই ডায়েলের প্রতিটী নম্বরের মুখে এক এক প্রকার দ্রব্য রাখা হয়। এই ঘড়ীর ছয় নম্বর এবং বারো নম্বরের মুখে স্বয়ং মালিক এবং তাহার সহকারী দণ্ডায়মান থাকে। এর পর ঘড়ীর কাঁটাটী জোরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, যে ব্যক্তির নিকট উহার ছোট মুখটী থামবে সেই ব্যক্তি ঐ নম্বরের মুখে রাখা দ্রব্য লাভ করবে। খেলোয়াড়গণ তাদের নম্বরের মুখে দেয় অর্থ রক্ষা করলে ঐ কাঁটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। দুই একটী দ্রব্য ব্যতীত সকল দ্রব্যই খেলো এবং কম মূল্যের দেখা যায়। প্রায়শক্ষেত্রে এই কাঁটার ছোট মুখ পরিচালক বা তাহার সহকারীর, (ছয় এবং বারো নম্বরের) মুখে এসে থেমে গিয়েছে। এই যন্ত্র নির্ম্মাণের কারসাজীর জন্যই এইরূপ সম্ভব হয়। ইহা এক প্রকার প্রবঞ্চনা।

শান্তিরক্ষীদের নজর এড়াবার জন্যে বহু জুয়াড়ী ষ্টিমার বা হাউস-বোট ভাড়া করে মাঝ-নদীতে বা মোহনায় নঙ্গর করে ঐ সকল জলযানে নিরাপদে জুয়া খেলেছে। জল-পুলিশ নিকটে এলে জুয়ার সরঞ্জাম

জলে নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং বলা হয় যে তারা পিকনিকের জন্য ঐ জলযান ভাড়া করেছে।

দ্যূত ক্রীড়া কেবলমাত্র পরস্পরের মধ্যে অর্থবিনিময় বা লাভ লোকসানের উপর নির্ভর করে না। কোনও এক মালিকের (Den-keeper) স্বার্থে নিযুক্ত না হ'লে উহা বে-আইনি হয় না। ঘরোয়া ভাবে বা আপোষে বন্ধুবান্ধবরা যে জুয়া খেলে, তাহা অবৈধ জুয়া নয়। এই কারণে সাধারণ 'তাসের ফ্লাস' খেলাকে বৈধ জুয়া বলা হয়েছে।

(১৩) হাঁড়ী খেলা—এই জুয়া খেলা নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত। এই জুয়ার আড্ডাঘর শকট চলাচলের পথের পার্শ্বে বা নিকটে অবস্থিত। জুয়াড়িগণ প্রথমে আড্ডাঘরে একটী বড় হাঁড়ী ন্যস্ত করে। এরপর যত ব্যক্তি জুয়া খেলবে উহাদের সমসংখ্যক কাগজের টুকরা কুণ্ডলী করে ঐ হাঁড়ীতে তা তারা নিক্ষেপ করে। কিন্তু ঐ কাগজে কোনও লিপিকা বা সংখ্যা আদি থাকে না। অর্থাৎ ঐ কাগজে কোনও কিছু লেখা থাকে না। এর পর জুয়াড়ীরা আড্ডাঘর হ'তে বেরিয়ে রাজপথে উপস্থিত হয়। প্রথম যে শকটটী তাদের দৃষ্টিগোচর হবে, ঐ চলন্ত শকটের পিছনকার নম্বর প্লেটের [তা রিক্সা ট্যাক্সী ঘোড়ারগাড়ী বা বাস যাহাই হোক না কেন] ডানদিককার শেষ সংখ্যাটী এদের একজন একটুকরা কাগজে টুকে নেয়। এর পর তারা ত্বরিত গতিতে পূর্ব্বস্থানে ফিরে ঐ নম্বর লেখা কাগজটী কুণ্ডলী করে ঐ হাঁড়ীতে রেখে দেয় এবং এর পর ঐ হাঁড়ী নেড়ে নেড়ে সব কয়টী কাগজ একাকার করে দেওয়া হয়। এদের এক একজন এইবার হাঁড়ী হ'তে একটী কাগজ তুলে নেয়। নম্বর লেখা কাগজটী উঠাতে পারলে ঐ ব্যক্তি বহু অর্থ লাভ করবে। এই ভাবে পর পর প্রত্যেক ব্যক্তি ঐভাবে কাগজ তুলে দেখে যে ঐ কাগজে নম্বর লেখা আছে কি'না?

যদি কেহই নম্বর লেখা কাগজ না তুলতে পারে তাহ'লে সকলেরই লোকসান, কিন্তু জুয়া খেলার মালিকের (Den-keeper) তাতে লাভ পুরোপুরি। এই খেলার পদ্ধতিতে বহু ঘোরফের করা হলেও মূল পদ্ধতি থাকে উপরোক্তরূপ।

(১৪) ডিস্ক্‌ খেলা—এই খেলা কয়েকটী রঙ বেরঙের চাকতির সাহায্যে খেলা হয়ে থাকে। এই চাকতির উপর বিভিন্ন নম্বরও লেখা থাকে। এই চাকতির রঙএর উপর ধরা হয় একটা অঙ্কের সংখ্যা এবং চাকৃতির উপর লেখা নম্বরানুযায়ী অপর একটী অঙ্কের সংখ্যা ধরা হয়। পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্য এই সকল সঙ্কেতের সৃষ্টি হয়েছে। এইরূপ এক ডেন্‌-কিপারের বাটী তল্লাস করে একটুকরা কাগজ পাওয়া যায়, তাতে এই সঙ্কেত সমূহের প্রকৃত অর্থ লেখা ছিল। যথা হলুদে রঙ—১০০৲ টাকা, সবুজ রঙ ২০০৲ টাকা, লাল রঙ ৩০০৲ টাকা ইত্যাদি এবং চাকতির উপরকার ১ নং অর্থে ১০৲, ২নং অর্থে ২০৲ টাকা ইত্যাদি। বিভিন্ন দিনের খেলার জন্যে বিভিন্ন রূপ সাঙ্কেতিক সংখ্যা সৃষ্ট হয়ে থাকে। জুয়া খেলার পূর্ব্বাহ্নে এই সঙ্কেত সকল জুয়াড়ীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এই সকল দ্যূত ক্রীড়ার প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং নিয়মকানুন শান্তি-রক্ষকরা নিজেরা জ্ঞাত না থাকলে আদালতে তা তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন না। কিন্তু এই সকল ক্রীড়ার পদ্ধতি সাক্ষ্য দ্বারা আদালতকে বুঝিয়ে দিয়ে ঐ খেলার সাজ সরঞ্জাম আদালতে পেশ করলে আদালত বিষয়টী সহজেই বুঝে নিতে পারে। বিষয়টী আদালতকে সম্পূর্ণরূপে বুঝাতে না পারার জন্য বহু জুয়ার কেস্‌ বা মামলা স্বভাবতঃই টেঁকে না।

(১৫) শকট জুয়া—এই খেলায় জুয়াড়ীরা রাস্তার চৌমাথায় এসে

দাঁড়ায়। এরপর কেউ বলে যে শকটটী মোড়ের ডান দিকে যাবে, কেউ বা বলে যে উহা মোড়ের বাম দিকে যাবে। শকটগুলির এইরূপ দিক পরিবর্ত্তনের উপর বাজী রাখা হয়ে থাকে।

লটারী বা ভাগ্যচক্র

লটারী বা ভাগ্যচক্র জুয়া নয়। কারণ কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একান্ত স্বার্থে এই খেলা প্রযুক্ত হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিক্রয়ার্থে দ্রব্যাদির লটারীর কথা বলা যেতে পারে। ইহা সমমূল্যের টিকিট বিক্রয় দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। ধরুন কোনও এক ব্যক্তির একটী মোটরকার আছে এবং উনি তাহা বিক্রয়ের জন্য লটারীর অবতারণা করলেন। ১৲ টাকা বা ১০৲ টাকার বহু টিকিট বহু ব্যক্তির নিকট তিনি বিক্রয় করলেন, এবং এইরূপে তিনি ছয় হাজার মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারলেন। ঐ যন্ত্র শকটটীর মূল্য চারি হাজার কিম্বা ছয় হাজারও হ'তে পারে, কিম্বা উহার প্রকৃত মূল্য আট হাজারও হ'তে পারে। শকটের মালিকের লাভ লোকসানের প্রশ্ন এস্থলে আদপেই উঠে না। কারণ এই ক্ষেত্রে মালিক এক প্রকার ভাগ্যের হস্তেই নিজেকে সমর্পণ করছে। কিন্তু প্রকৃত জুয়ার মালিক বা ডেন্‌-কিপার নিজেকে জুয়াড়ীদের লাভ লোকসান বা ভাগ্যের সহিত কখনও জড়ায় নি। সকল সময় এই ডেন্‌-কিপারগণ লভ্যাংশ গ্রহণ করেছে, লোকসানের সহিত সংশ্লিষ্ট না থেকে। এই কারণে এইরূপ লটারী দ্বারা দ্রব্যাদি বিক্রয়কে জুয়া বলা হয় না। যে ব্যক্তির নামে ঐ মোটরকার উঠবে, উহা তাহাকে প্রদান করলে—ইহার মধ্যে কোনও অপরাধ নেই। কিন্তু বহুক্ষেত্রে

এই লটারী ন্যায়ের পথে পরিচালিত হয় নি। প্রায়শক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রেতার ভৃত্যগণ বা আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত কোনও ব্যক্তির নামে উঠেছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে যদি কোনও কারসাজী থাকে তা'হলে উহাকে প্রতারণা বলা হবে। অর্থাৎ উহাকে তখন জুয়া না বলে বলা হবে জুয়াচুরী।

এই কারণে পূর্ব্বাহ্লে লটারী পরিচালকদের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে।

কোনও কোনও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এইরূপ লটারীর একক লভ্যাংশ গ্রহণ করে থাকেন। একমাত্র ইহাদের উদ্দেশ্য থাকে জনহিতার্থে উহা ব্যয় করা। কিন্তু দ্যূত ক্রীড়ার সহিত এই ব্যবস্থার প্রভেদ থাকে অত্যল্প। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। যে সকল দ্যূত ক্রীড়ায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে বা যাহাতে কোনও ব্যক্তি বা দল সমগ্র লভ্যাংশ গ্রহণ করে না, উহাকে জুয়া বলা হয় না; এমন অনেক লটারী আছে যাহা কার্য্যতঃ জুয়া, কিন্তু আইনতঃ জুয়া নয়; ইহা আইনতঃ জুয়া না হলেও লোকতঃ উহা জুয়া বা দ্যূত ক্রীড়া।

[কেহ কেহ বলে থাকেন যে জুয়ার জিতের হার থাকে ৫০% এবং ৫০% অর্থাৎ হার হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ ভাগ এবং জিত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে শতকরা ৫০ ভাগ। একটী পয়সা একবার, দশবার বা পঞ্চাশ বার টস্ করে উহা কতবার হেড এবং কতবার টেল হবে তা বলা যায় না, কিন্তু ঐ পয়সাটী যদি ১ লক্ষ ৫০ হাজার বার ঐরূপ টস্ করা হয়, তা'হলে দেখা যাবে অর্দ্ধেক হয়েছে হেড এবং অর্দ্ধেক হয়েছে টেল। এই আধাআধি হার জিতের যদি ব্যতিক্রম ঘটে তা'হলে উহাকে জুয়া বলা হবে না, উহাকে তখন বলা হবে প্রবঞ্চনা। বহু ক্লাবে এমন বহু মুদ্রা-ভাগ্যযন্ত্র এবং বাগাটালি মেসিন প্রভৃতি আছে যেখানে শত

চেষ্টায় বহু আনি দু-আনির বিনিময়েও লোকে দিনের পর দিন হেরে এসেছে। আমার সুচিন্তিতঅভিমত এই যে এইরূপ অবস্থা বা ব্যবস্থা সকল সময়েই প্রবঞ্চনারই সামিল।]

বাদাম খেলা—এই জুয়া পদ্ধতিতে একটী চৌকো চার-ঘরা ছক তৈরী করা হয়। এই সময় মাটির উপর কিছু চিনাবাদাম মজুত থাকে। এই মজুত বাদাম হ'তে আন্দাজে কয়েকটী বাদাম তুলে নিয়ে উহার একটি দুইটি বা তিনটি—এইরূপ হারে ঐ ছকের প্রতিটীর উপর উহাদের সাজানো হয় এবং এর পর ঐ বাদামের সমবেত সংখ্যা যদি জোড়া সংখ্যা হয় তা হ'লেই জিত।

উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যতীত এই খেলার বহু রকম-ফেরও আছে। তবে প্রায়শক্ষেত্রে রাহাজানির উদ্দেশ্যে এই খেলার অবতারণা করা হয়েছে। কিরূপে ইহা সম্ভব তা নিম্নের বিবৃতি হ'তে সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"ঐ দিন জুয়াড়ীর দালাল বাদাম খেলার পদ্ধতি আমাদের বুঝিয়ে দিলে। আমরাও বুঝে গেলাম যে এই খেলায় হার হওয়ার সম্ভাবনা আদপেই নেই। খেলার গোপন তথ্য ঐ মাড়োয়ারীকে প্রকাশ করতে আমাদের মানা ছিল। এর পর ঐ দালাল এক নৌকা করে আমাদের মাঝ গঙ্গায় নিয়ে আসে। ভূমির উপর ঐ মাড়োয়ারী দুই সহস্র টাকা রাখে এবং আমরা রাখি এক সহস্র টাকা। পূর্ব্ব শিক্ষা মত খেলে আমরা ঐ খেলা জিতে নিই। কিন্তু ঐ মাড়োয়ারী তার নিজের এবং আমাদের টাকা জোর করে তুলে নিয়ে বলে যে আমরা হেরে গেছি। মাঝি মাল্লারা এবং তার সঙ্গিগণ কয়েকখানি ছোরা ছুরীও বার করে।"

[জুয়া তিনটী উদ্দেশ্যে খেলা হয়ে থাকে। যথা—(১) প্রকৃত জুয়া খেলা, (২) প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে এবং (৩) রাহাজানির উদ্দেশ্যে।]

অপরাধ—জালিয়াতি

জালিয়াতি বহু প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—মুদ্রা জাল, নোট জাল, খতপত্র বা দলিল জাল, ব্যাঙ্কের চেক জাল ইত্যাদি। প্রথমে নোট বা মুদ্রা জালের সম্বন্ধে বলা যাক। রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ মুদ্রা জাল ব্যবসায় অতীব ক্ষতিকর। শত্রুরাষ্ট্রসকল বিরোধী-রাষ্ট্রের পতন ঘটানোর জন্য এইরূপ পন্থা অবলম্বন করে থাকে। এরা লক্ষ লক্ষ মুদ্রার কাগজের নোট জাল করে ঐ সকল নোট শত্রুরাষ্ট্রে অপবহন (Smugling) করে থাকে ; অসম্ভব মুদ্রা স্ফীতির কারণে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং এইরূপ অবস্থায় স্বভাবত ঐ রাষ্ট্রের পতন ঘটে। সকলেই অবগত আছেন যে কাগজের কারেন্সি নোটের সম সংখ্যক ধাতু মুদ্রা কোষাগারে মজুত থাকে। এই সকল কাগজের নোট সরকারী হ্যাণ্ডনোটের সামিল হয়ে থাকে। জাল নোটের প্রচলনের ফলে অর্থনৈতিক ঘাটতি পড়ে এবং সরকারী তহবিল শূন্য হয়ে যায়। এই অবস্থা অবগত থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র সমূহের বহু প্রজা বা নাগরিক এইরূপ জাল ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছে। এই সকল লোভী দেশবাসী একাধারে দেশ, জাতি এবং রাষ্ট্রের শত্রু। আমার মতে এদের এই রাষ্ট্র-বিরোধ অপরাধ ক্ষমারও অযোগ্য।

এদেশে নিম্নোক্তরূপ চারিপ্রকার পন্থায় মুদ্রা জাল করা হয়ে থাকে।

(১) রোপ্যকরণ—ইংরাজীতে ইহাকে বলে, কুইক্-সিলভারিঙ প্রসেস্। এক টাকার অনুরূপ মুদ্রা তামা দ্বারা তৈরী করে উহা ইলেক্‌ট্রোপ্লেট্ করে রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রারূপে চালানো হয়ে থাকে। মুদ্রাজালের এই পন্থাকে বলা হয় 'রৌপ্যকরণ'। কখনও কখনও

তাম্র মুদ্রাকে এই পন্থায় স্বর্ণ বর্ণেরও করা হয়ে থাকে। অনুরূপ ভাবে এই পন্থাকে বলা হয় 'স্বর্ণকরণ'। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য থাকে তাম্র-মুদ্রাকে গিনি বা মোহর রূপে সরবরাহ করা।

(২) উত্তোলন—রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা হ'তে সামান্য সামান্য সোণা বা রূপা সাবধানে চেঁছে (Scraping) তুলে নেওয়া হয়, যাতে করে মনে হবে ঐ সকল মুদ্রা হাতে হাতে এমনিই ক্ষয়ে গিয়েছে। প্রকৃত মুদ্রার কাণা (সারকুলার রিম্) এবং উপরিভাগ (Miling)—এই উভয়াংশ হ'তেই ঐ মূল্যবান ধাতুর কিছু ভাগ তুলে নেওয়া হয়েছে।

(৩) ভেজাল পন্থা—ইংরাজীতে ইহাকে (Sweating) বলে। এই পন্থায় মুদ্রা হ'তে ইলেকট্রোপ্লাইডিঙ পন্থায় ধীরে ধীরে কিছু রৌপ্য তুলে নেওয়া হয়। এই ইলেকট্রোপ্লাইডিঙ ব্যবস্থা তামার সহিত করা হয়। এতদ্বারা মুদ্রার রৌপ্যকণা উত্তোলিত হয়ে আসে এবং তৎপরিবর্ত্তে তাম্রকণা উহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়।

(৪) ছাঁচ প্রথা—এই পন্থায় ছাঁচ নির্ম্মাণ করে উহার সাহায্যে হুবহু অনুরূপ মুদ্রা সকল নির্ম্মিত হয়ে থাকে। এই নকল মুদ্রা তৈরী করার জন্য যে ছাঁচ তৈরী করা হয়, তাহা একটী আসল মুদ্রার সাহায্যে নির্ম্মিত হয়। এইজন্য একই সালের বহু জাল মুদ্রা বাজারে চালু হ'তে দেখা যায়।

এই মুদ্রা জালের ছাঁচ তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(ক) খোঁদল-ছাঁচ বা প্রকৃত ছাঁচ। কেহ কেহ ইহাকে পাতকো-ছাঁচও বলে থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে বলা হয় কাষ্ট্ (Cust)। (খ) ডাইস্-ছাঁচ বা ডাইস্। কেহ কেহ ইহাকে বহিঃছাঁচ বা চাতাল-ছাঁচও বলে থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে বলা হয় ষ্ট্রাক (Struk), (গ) ছাঁচ বা মোল্ড (Mould) এবং (ঘ) ডাইস্ বা সিল্ অর্থাৎ এই উভয়বিধ ব্যবস্থার একত্র সমাবেশ।

মুদ্রা জালের খোঁদল-ছাঁচ সকল নরম মাটি এবং কাঠ কয়লার গুঁড়োর সাহায্যে সাধারণতঃ তৈরী করা হয়েছে। এই সকল পদার্থের সহিত কখনও কখনও রজন (Resin) এবং ইঁটের গুঁড়াও মিশ্রিত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ছাঁচ তোলার স্থবিধার জন্য এদের সহিত জল এবং আঠা জাতীয় পদার্থ—গুড়, মধু, গঁদ, এ্যারাবিক্, সিমেণ্ট প্রভৃতিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মৃত্তিকা নির্ম্মিত ছাঁচ সকল বহু ক্ষেত্রে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়েছে। এই সকল ছাঁচ কেহ কেহ খড়ির গুঁড়া এবং প্ল্যাসটার অব্ প্যারিস্এর সাহায্যেও নির্ম্মাণ করে থাকে।

মুদ্রা জালের ডাইস্ বা চাতাল-ছাঁচ সকল কতকটা হ্যাণ্ডেল যুক্ত শক্ত গালা-সিলের মতন দেখতে হয়। এই ডাইস্ বা চাতাল-ছাঁচ সাধারণতঃ পিতল কিংবা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হয়ে থাকে।

খোঁদল-ছাঁচের দুইটী অংশ থাকে এবং এই উভয় ছাঁচের মধ্যে মুদ্রার পরিধি অনুযায়ী স্বল্প গহ্বর বা খোঁদল থাকে। ইহাদের একটীর গহ্বরের নিম্নদেশে মুদ্রার এক পিঠ এবং উহার অপর ছাঁচের গহ্বরের নিম্নদেশে ঐ মুদ্রার অপর পিঠ চিত্রিত বা ছাঁচিকৃত থাকে। এর পর এই ছাঁচ দুইটীর উপরি অংশ মুখোমুখি করে বসিয়ে দিয়ে এঁটে বা বেঁধে দেওয়া হয়, এবং এই উভয় ছাঁচের সংযোগের মুখে একটু ফুটা করে ঐ ছিদ্র-পথে তরলাকৃত ধাতু ঢেলে দেওয়া হয়ে থাকে। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর ঐ ধাতু উভয় ছাঁচের গহ্বরে জমাট বেঁধে গেলে ঐ ছাঁচের উভয়াংশ বিযুক্ত করলে ভিতর হ'তে একটী নকল হুবহু মুদ্রা বার হয়ে এসে থাকে।

খোঁদল-ছাঁচের ন্যায় চাতাল-ছাঁচেরও দুইটী অংশ থাকে, কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনও গহ্বর বা খোঁদল থাকে না। উহাদের উভরাংশ থাকে সমতল, এবং ঐ সমতল ছাঁচ বা ডাইসদ্বয়ে যথাক্রমে মুদ্রার হেড্

এবং টেল অঙ্কিত বা স্বল্প গভীর রেখাকারে চিত্রিত থাকে। মুদ্রার উপরি অংশকে, অর্থাৎ যে অংশে রাজার মুখ বা কোনও চিত্র অঙ্কিত থাকে, তাহাকে বলা হয় হেড্ এবং উহার নিম্ন অংশকে অর্থাৎ যেখানে মাত্র লিপিকা থাকে, তাহাকে বলা হয় টেল। এই চাতাল-ছাঁচদ্বয় কতকটা সিল মোহরের মতন দেখতে হয়। এই উভয় সিল মোহরের মধ্যে অর্দ্ধতরলাকৃতি বা নরম অবস্থার ধাতু রক্ষা করে উভয় দিক হ'তে চাপ দিলে হুবহু নকল একটী মুদ্রা বার হয়ে আসে। এর পর উকা বা অন্ত কোনও যন্ত্রের সাহায্যে ঐ জাল বা মেকি মুদ্রার কানার খাঁজগুলি আসল মুদ্রার অনুরূপ করে কেটে দেওয়া হয়ে থাকে।

কখনও খোঁদল এবং চাতাল, এই উভয়বিধ ছাঁচের সাহায্যে মেকি মুদ্রা নির্ম্মাণ করা হয়েছে। এই পন্থায় খোঁদল বা কাষ্ঠ ছাঁচে তরলাকৃতি ধাতু রক্ষা করে উহার মুখ চাতাল-ছাঁচ দিয়ে চেপে দেওয়া বা বন্ধ করা হয়ে থাকে। মুদ্রার এক পিঠ খোঁদল-ছাঁচের এবং উহার অপর পিঠ চাতাল-ছাঁচের সাহায্যে মুদ্রিত বা জাল করা হয়ে থাকে।

মেকি বা জালি রৌপ্যমুদ্রাসমূহ সকল সময় পুরাপুরি রৌপ্যেতর ধাতু দ্বারা তৈরী করা হয় নি। প্রায়শক্ষেত্রে অধিক রূপা না দিয়ে, কম বেশী রূপার সহিত রৌপ্যেতর ধাতু খাদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অপকার্য্যে যে সকল ধাতু খাদ রূপে প্রযুক্ত হয়, তাহাদের মধ্যে পিতল, তামা, সিলভার, রাঙ, টিন, কাঁসা এবং সীসা অন্যতম। কখনও কখনও মুদ্রার দুই দিককার উপরিভাগ রূপা এবং উহার মধ্যদেশ রৌপ্যেতর ধাতু দ্বারা নির্মিত হয়েছে।

নিকেল নির্ম্মিত মুদ্রা প্রায়শক্ষেত্রে সীসা এবং টিনের মিশ্রণ দ্বারা জাল করা হয়েছে। জাল বা মেকি স্বর্ণ মুদ্রা পিতলের সাহায্যেও তৈরী করা হয়ে থাকে। পরে উহা পালিস করে বা সোনার জল বা সোনার

কোটিঙ্ দিয়ে চকচকে করা হয়। কখনও কখনও মেকি মুদ্রা ইলেকট্রোপ্লেট করে প্রকৃত স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা রূপে চালু করে লোক ঠকানো হয়েছে।

মুদ্রা জালের জন্য নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতি এবং দ্রব্য নিচয়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। খানাতল্লাসীর সময় এইগুলি বিশেষরূপে হেপাজতে নেওয়া শান্তিরক্ষীদের পক্ষে উচিত হবে।

(১) পাউডার—পোড়া ইট্, কাঠ কয়লা, সিমেণ্ট, খড়ি গুঁড়া বা খড়ি, প্লাসটার অব প্যারিস্, গন্ধক ইত্যাদি।

(২) যন্ত্রাদি—উনান, চিমটা, ফোঁদেল বা ফানেল, দ্রব্যতরলাকৃতি করার পাত্র, করাত, হাতুড়ী, ছুরী, উকা, স্কেল বা মাপকাঠি, সাঁড়াশী, বাটালি, কড়াই, বড় চামচ, ফ্ল্যাট ষ্টোন ইত্যাদি।

(৩) ধাতু—দস্তা, সীসা, টিন, তামা, রূপা, পিতল, কাঁসা, সোলডার, রাঙ ঝাল ইত্যাদি।

(৪) আঠা বা লেই—গুড়, আলকাতরা, রজন, গঁদ, মধু ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত সালফিউরিক এ্যাসিড, নাইট্রিক এসিড্ তেঁতুল, সোপ-নাট প্রভৃতি দ্রব্যেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। অবশ্য একটী পুরা ছাঁচ বা ডাইস এবং ঐ ছাঁচ বা ডাইস তৈরী করার জন্য একটী প্রকৃত মুদ্রার প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথম।

অধুনাকালে রাষ্ট্রসমূহ অকৃত্রিম রূপা বা সোনা দিয়ে মুদ্রা তৈরী করা পছন্দ করে না। ঐ সকল রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রায় তারা প্রচুর খাদ মিশ্রিত করেন। বহু রাষ্ট্র আদপেই উচ্চমূল্যের মুদ্রাতেও রূপা প্রদান করে না, উহাদের তাঁরা সীসা বা দস্তার সাহায্যে নির্ম্মাণ করে থাকেন। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে, এতদ্বারা মেকি মুদ্রা তৈরী লাভজনক থাকে না। কিন্তু যদি কোনও এক দস্তা বা সীসার মুদ্রার বিনিময়ে অধিক

মূল্যের দস্তা বা সীসা ক্রয় করা সম্ভব হয়, তা'হ'লে ঐ মুদ্রার জাল লাভজনক হবে। কিন্তু ঐ কাঁচা মাল উহাদের সমমূল্যের হ'লে উহাতে কোনও লাভ থাকবে না। এই অবস্থায় কাহারও পক্ষে মুদ্রা জাল করা বা না করা সমান কথা হয়। এমন বহু রাষ্ট্র আছে, যেখানে রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রাসমূহ সমমূল্যের বা ন্যূনাধিক মূল্যের রূপা বা সোনা দ্বারা তৈরী করা হয়ে থাকে। এইরূপ মুদ্রাসমূহ খাদ মিশিয়ে মেকি বা জাল করতে পারলে জালিয়াতের লাভ অধিক থাকে। কেহ কেহ বলেন, খাদমিশ্রিত রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা জাল করা সহজ, কারণ প্রদত্ত খাদের সহিত আরও একটু খাদ মিশ্রিত করলে উহা সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু অবিমিশ্র বা খাঁটি স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার সহিত একটু মাত্রও অপর ধাতু মিশ্রিত করলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই উহার ওজন, বর্ণ এবং ঝঙ্কার হ'তে উহাদের সহজেই চিনে নিতে পারে।

কাহারও কাহারও মতে স্বল্প মূল্যের ধাতু দ্বারা অধিক মূল্যের মুদ্রাদি নির্ম্মাণ করা হ'লে উহা বহু সংখ্যায় জাল করা সম্ভব হয়েছে। এই মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ এ'ও বলে থাকেন যে, রূপার বদলে যদি সীসা দিয়ে টাকা তৈরী করা হয় এবং ঐ সীসার টাকা দিয়ে যদি এক ভরি রূপা এবং বহু ভরি সীসা ক্রয় করা সম্ভব হয় তা'হলে ঐরূপ মুদ্রা জাল করা সর্ব্বদাই লাভজনক। তবে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদও আছে। তবে ইহাও দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্বেকার খাঁটি রূপার টাকা অধুনাকালে টাকা রূপে কেহ ব্যবহার করে না। ঐরূপ পুরানো টাকা পাওয়া মাত্র উহা গালিয়ে ফেলে বিক্রয় করা হয়েছে।

মুদ্রা সম্পর্কে অপরাধিগণ মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত, যথা—(১) মুদ্রাকার (Coiner) বা প্রস্তুতকারক, (২) সঞ্চালক (Utterer) বা

পরিবেশক। প্রথোমক্ত অপরাধিগণ কেবলমাত্র মেকি মুদ্রা নির্ম্মাণ করে থাকে, কিন্তু তারা নিজেরা কদাচিৎ উহা বাজারে চালু করেছে। অপর শ্রেণীর অপরাধী প্রস্তুতকারকদের নিকট হ'তে মেকি মুদ্রা ক্রয় করে বাজারে উহা চালু করে থাকে। মেকি মুদ্রার প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে উহারা থাকে একান্তই অজ্ঞ।

মেকি মুদ্রার সঞ্চালকরা (Utterer) বাজারে উহা চালু করার জন্য বহু সহকারী নিয়োগ করে থাকে। এই সকল সহকারীদের অনেকে নাবালক বালক মাত্র। এই সকল বালকগণ মেকি টাকা এবং আধুলিসহ বাজার করতে বার হয় এবং দুই এক পয়সার প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে মেকি আধুলি ও টাকার বিনিময়ে প্রকৃত ছোট মুদ্রা বা রেজকী-সমূহ সংগ্রহ করে আনে। এই সকল মেকি আধুলি এবং টাকা রাত্রে বাস ও ট্রামে মাত্র ৪ পয়সার টিকিট কিনে দুর্ব্বৃত্তরা ভাঙিয়ে নিয়েছে। দোকানিগণও দৈবক্রমে উহা প্রাপ্ত হ'লে মুদ্রাটী জাল বুঝা মাত্র উহা অপর একজনের নিকট গছিয়ে দিতে প্রয়াস পায়।

বিবিধ প্রকার মুদ্রা জালের কথা বলা হলো। এইবার নোট জাল সম্বন্ধে বলবো। অধুনাকালের বহু ধনী পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ নোটজাল বা ডাকাতি করে বড়লোক হয়েছিলেন, এইরূপ বহু প্রবাদ এদেশে প্রচলিত আছে। এখনও নির্জ্জন স্থানসমূহে অবস্থিত বহু পরিত্যক্ত বড় বড় পুরাতন বাড়ী দেখা যায়। জন প্রবাদ, এই সকল বৃহৎ অট্টালিকাতে পূর্ব্বে নোট জাল করা হতো। অধুনাকালে নোটের বর্ণচ্ছটা এবং প্যাটার্ণ বা সমাবেশ এমন ভাবে করা হয়ে থাকে যাতে উহা জাল করা অসম্ভব হয়। এই প্যাটার্ণ এবং প্রস্তুত প্রণালীর বদলের কারণে নোট জাল করা অধুনাকালে অতীব কঠিন। জনস্বার্থের কারণে নোটের প্যাটার্ণ প্রভৃতির গুহ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করবো

না। তবে মোটামুটি বলা যেতে পারে যে নিম্নোক্ত কতিপয় পন্থায় অধুনাকালে কারেন্সি নোট জাল করা হয়ে থাকে, যথা:—

(১) হস্তাঙ্কন—এই পন্থার কালী এবং কলমের সাহায্যে নোট হুবহু অঙ্কন করে উহাতে তুলির সাহায্যে রঙ ধরানো হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থায় সুন্দর এবং নিখুঁত রূপে নোট জাল করা সম্ভব হয় নি।

(২) লিথোগ্রাফি—এই পন্থায় নোটের চিত্র লিথোগ্রাফির দ্বারা তোলা হ'লেও উহাতে রং চড়ানোর কার্য্য হস্ত দ্বারা করা হয়ে থাকে। এর ফলে নোটের ছাপ সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠে না এবং ছাপা কতকটা ধ্যাবড়া আকার ধারণ করে। বারকতক ছাপার পরই উহার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠে। একদিন এই বিশেষ পন্থায় নোট জাল ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল, কিন্তু অধুনাকালে নোটের প্যাটার্ণ এবং প্রস্তুত প্রণালী বদলে যাওয়ায় এই প্রণালী আজ অকেজো হয়ে গিয়েছে।

(৩) ফটো-লিথোগ্রাফি—একটী অকৃত্রিম বা সাচ্চা নোটের ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র প্রথমে একটী লিথোগ্রাফিক প্রস্তরে আরোপিত করা হয় এবং তার পর উহা হ'তে নোটের ঐ প্রতিকৃতি কাগজে ছেপে নিয়ে হস্ত দ্বারা উহার সূক্ষ্ম কার্য্যগুলি সমাধা করা হয়। এই প্রণালীর সাহায্যে নকল কার্য্য সুন্দর হ'লেও লিথোগ্রাফির সাধারণ দোষগুলি এমনিই থেকে যায়।

(৪) ফটো-জিনকোগ্রাফি—এই পন্থায় ফটো-লিথোগ্রাফির ন্যায় একটি নেগেটিভ প্রথমে তৈরী করা হয়। এই পন্থায় উহা প্রথমে ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের উপর ছাপা হয়ে থাকে। এইজন্য ইহাদের নেগেটিভের ছবি উল্টা হওয়ার প্রয়োজন আছে। এইরূপ উল্টা ছাপকরণের জন্য ফটো তুলবার সময় ফটোর লেন্সের সম্মুখে একটী প্রিসিম্ রাখার

রীতি আছে। এই ভাবে যে ফটো প্লেট তৈরী হয়, উহার সাহায্যে লিথো-প্রস্তরের পদ্ধতির ন্যায়ই নোট জাল করা হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও উহাদের ছাপার সাধারণ দোষগুলি এড়ানো সম্ভব হয় নি।

(৫) ফটো-রিলিফ ব্লক—এই পন্থায় ফটোগ্রাফির নেগেটিভ্ প্লেট হতে প্রথমে স্থূল তাম্র বা দস্তার প্লেটে নোটের প্রতিকৃতি তুলে নেওয়া হয়। এই প্লেটের যে যে অংশ সাদা করার প্রয়োজন, সেই অংশের রং এ্যাসিড প্রয়োগ করে তুলে দেওয়া হয়। ঐ প্লেট তামার হ'লে লৌহ পেরিক্লোরাইড্ এবং উহা দস্তার হলে নাইট্রিক এ্যাসিড, এই 'জালের' কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নোটের পিছন দিকটি পরীক্ষা করলেই কিন্তু বুঝা যায় যে ঐ নোট এই প্রণালীতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৬) ইটাগ্লিও প্রশেস্—ইহাকে ফটো-এচিচিঙ্ বা ফটো এন-গ্রেভিঙ্ প্রণালীও বলা হয়ে থাকে। ছাপার কালীর সাহায্যে নোট জাল করতে হলে এই প্রণালীটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই প্রণালীতে কেবলমাত্র তাম্র নির্ম্মিত প্লেট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই পন্থায় ঐ তাম্র প্লেটের নিম্নদেশে এসিডের সাহায্যে নোটের প্রতিকৃতি তোলা হয়। এইজন্য ইহাতে একটী নেগেটিভ্ প্রিণ্ট্এরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। প্রথমে মূল নেগেটিভ হ'তে একটী পজেটিভ্এর সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। অবশ্য ইহা করা হয়ে থাকে তাম্র প্লেটের উপর ইহার সংযোজক রূপ ছাপা হ'তে। এরপর কপার-প্লেট-প্রেসের প্রণালী অনুযায়ী ঐ প্লেট হতে সরাসরি ছাপ নিয়ে নোটগুলি জাল করা হয়। এরপর প্লেটের নামাল অংশে ঘসে ঘসে কালি লাগানো হয়ে থাকে এবং উহার উচ্চাংশ হ'তে ঐ কালি স্থূল খসখসে বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে পুঁছে ফেলা হয়ে

থাকে। এরপর এই প্লেট ছাপার প্রেসে সংযুক্ত করে উহার উপর এক খণ্ড স্যাঁতস্যেঁতে নোটের সাইজে কাটা কাগজ রেখে ঐ প্রেসে চাপা দেওয়া হয়। এই অতীব চাপের ফলে ঐ কাগজ ঐ প্লেটের নামালাংশ প্রোথিত হয়ে প্রয়োজনীয় ছাপ গ্রহণ করে। এইরূপ পন্থায় ছাপার কারণে ছাপার কালি কিছুটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করে এবং এইজন্য চতুর অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাকে জাল বলে বুঝে নিতে পারে।

(৭) হেড্‌-এন্‌গ্রেভড্‌ ব্লক—এই পন্থায় কাঠের ব্লকের উপর হস্ত দ্বারা নরুণের সাহায্যে একটী নোটের প্রতিকৃতি তৈরী করা হয়ে থাকে। একমাত্র ধুরন্ধর ব্যক্তি এবং এই ব্যাপারে গুণিগণ এইরূপ ব্লক তৈরী করতে সক্ষম। এইরূপ ব্লক হ'তে প্রস্তুত নোট প্রায়শঃ ক্ষেত্রে নিখুঁত এবং সুস্পষ্ট হয় নি এবং ছাপার মধ্যে কর্ত্তন-যন্ত্রের [যে যন্ত্রের দ্বারা ঐ ব্লক তৈরী হয়েছে] দাগও দেখা গিয়েছে।

এইরূপে নোট সকল জাল করার পর দুর্ব্বৃত্তরা মোম, গ্লিসারিন, প্যারাফিন প্রভৃতির সাহায্যে উহার উপর জল-দাগ (water-mark) আরোপ করে থাকে। কখনও কখনও জল-দাগ আরোপ করার জন্য এই সকল পদার্থ ছাপার ব্লকের উপর নিক্ষেপ করে উহাকে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করাও হয়ে থাকে, এবং এরপর ত্বরিত গতিতে ঐ নোটের একটী কাগজ উহার উপর ন্যস্ত করে উহাতে চাপ দেওয়া হ'তে থাকে। কখনও কখনও এই জল দাগ সৃষ্টি করার জন্য নোটের কাগজটীকে এমোনিয়া সলিউসন সিক্ত ওয়ার-গজের উপরও রেখে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ঐ সলিউসনের উপর ঐ কাগজ টেনে নিয়েও জল-দাগের সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু এই পন্থায় জল-দাগ সৃষ্টি হলেও

উহা বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট ঐ জাল নোট জালরূপে ধরা পড়ে যায়। *

মুদ্রা এবং নোট-জাল সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার লেখা বা দলিল জাল সম্বন্ধে বলবো।

খত, পত্র, দলিল ও চেক জাল প্রভৃতিকে সাধারণ ভাষায় আমরা জালিয়াতি বা ফোরজারী বলে থাকি। এই জালিয়াতি কার্য্য দুই প্রকারে হয়ে থাকে, যথা—(১) ট্রেসিং হস্তলিপি এবং হস্তলিখন বা ফ্রি হাণ্ডরাইটীং।

প্রথমোক্ত পন্থায় একটী স্বচ্ছ কাগজ কোনও লিপিকার উপর ন্যস্ত করা হয়। এই অবস্থায় নিম্নের লিপিকা উপরের ঐ কাগজ ভেদ করে পরিদৃষ্ট হতে থাকে। এই সুযোগে পেন্সিল বুলিয়ে নিম্নের লিপিকার অনুরূপ একটী লিপিকা ঐ স্বচ্ছ কাগজে তুলে নেওয়া হয়ে থাকে। এর পর ঐ স্বচ্ছ কাগজ একটী স্থূল কাগজের উপর ন্যস্ত করে ঐ বুলানো লেখার উপর পেন্সিল বা শক্ত কাঠি দ্বারা চেপে লিখলে নিম্নের কাগজেও অনুরূপ একটী লিপিকার প্রতিকৃতি ফুটে উঠবে। এর পর ঐ লিপিকার দাগে দাগে পেন্সিল বা কলম চালালে পূর্ব্বেকার লেখার অনুরূপ একটী নকল লিপিকার সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে না। এই পন্থায় লেখা জাল করাকে বলা হয় ট্রেসিং বা বুলানো পন্থা।

দ্বিতীয়োক্ত প্রথায় সাধারণ ভাবে হস্ত লিখনের সাহায্যে হুবহু নকল লিপিকার সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। সহজ হস্ত লিখন বা নকল

* একই ব্লক হ'তে বহু জাল-নোট তৈরী করা হয়। এইজন্য প্রত্যেকটী নোটের নম্বরও থাকে একই। এজন্য একই নম্বরের বহু জাল-নোট নানা স্থানে আমরা পেয়ে থাকি।

সম্বন্ধে বিশেষরূপ পারদর্শী ব্যক্তিরাই এইরূপে জাল করতে সক্ষম। এমন বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি দেখা যায়, যারা মাত্র এই একটী বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেছে। এদের কেহ কেহ লেখাপড়া পর্য্যন্ত জানে না। কিন্তু কোনও কিছু নকল করতে এরা অতীব ওস্তাদ। যে সকল ভাষার অক্ষর তারা আদপেই জানে না, সেই সকল ভাষার অক্ষরও তারা হুবহু নকল করে দিতে পারে।

এই উভয় প্রথার মধ্যবর্ত্তী একটী প্রথাও অধুনাকালে প্রচলিত হচ্ছে। এই প্রথায় একটী কাঁচের উপর প্রথমে লিপিকা যুক্ত কাগজ এবং তার উপর একটী অনুরূপ সাদা কাগজ ন্যস্ত করা হয় এবং তার পর ঐ কাঁচের নিম্নে অতীব তীব্র আলোক রাখা হয়। এই তীব্র আলোক উভয় কাগজকেই স্বচ্ছ করে তুলে। এই অবস্থায় হস্তদ্বারা নিম্নের কাগজের লেখার রেখার উপর পেনসিল বা কলম বুলিয়ে উপরের কাগজে ঐ লিপিকার হুবহু প্রতিকৃতি নকল করা হয়ে থাকে। নিম্নের আলো যাতে উপরে তীব্ররূপে প্রকট হ'তে পারে—এই উদ্দেশে একটী কাঠের বাক্সের মধ্যে বিজলী আলো রেখে উহার উপরিভাগে ঐ কাঁচ রাখা হয়ে থাকে, এবং ঐ কাঁচের উপর রাখা হয়ে থাকে ঐ কাগজদ্বয়। পল্লীগ্রামের লোকেরা কিন্তু এই প্রথা সম্বন্ধে বহুকাল পূর্ব্ব হতেই অবহিত ছিল। বিজলী বাতির অভাবে তারা এই উদ্দেশ্যে হ্যারিকেনের আলো ব্যবহার করতো। এই হ্যারিকেনের চিমনির পাশে এই লেখা এবং অলেখা কাগজ একত্রে ন্যস্ত করে ঐরূপে বহু লোক দলিল বা উইল জাল কার্য্য সমাধা করেছে।

পুরানো দলীল বা উইল জাল করার উদ্দেশ্যে জালিয়াতরা পুরানো যুগের কাগজ এবং রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প বহু অর্থ ব্যয়ে যোগাড় করে থাকে। কখনও পল্লী অঞ্চলের সাবরেজিষ্টারী অফিস এইরূপ জাল করার উদ্দেশ্যে

পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সাবরেজিষ্টারী অফিস পুড়ে যাবার পর ঐ সাবরেজিষ্টারী অফিসে রক্ষিত, [কিন্তু পরে দগ্ধীকৃত] এমন বহু দলিল পত্র নকল বা জাল করার মরসুম পড়ে গিয়ে থাকে। প্রায়শক্ষেত্রেইলোক ঠকানোর উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির দস্তখতই অধিক সংখ্যায় জাল করা হয়েছে।

এই মুদ্রা, নোট এবং খত, উইল, দলীল-পত্র প্রভৃতি জাল করা হয়েছে কি'না তা জানবার বহু পদ্ধতি, রীতি এবং যন্ত্রপাতি আছে। এই পদ্ধতি, রীতিনীতি এবং যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে আলোচনা করা হবে। এই সম্পর্কে চেক এবং পত্র জাল সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে। চেক জাল সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে 'ব্যাঙ্কফ্রড্ কেস' এবং 'ব্যবসায় সংক্রান্ত অপরাধ' সম্পর্কীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে। উহা পাঠ করলে কিরূপে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা চেকের সংখ্যা পুঁছে ফেলে 'বর্দ্ধিত সংখ্যা' লেখা সম্ভব তা জানা যাবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। চিঠি পত্র প্রায়শক্ষেত্রে টাইপ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র দস্তখৎ জাল করার প্রয়োজন হয়। অফিসসমুহের বড় সাহেবরা টেবিলের ব্লাটিং প্যাডের উপর কাগজ রেখে সই করে থাকেন। এইভাবে পুনঃ পুনঃ সই করার সময় অলক্ষ্যে ঐ প্যাডের উপরও দস্তখতের সুস্পষ্ট দাগ পড়ে। জালিয়াতগণ এই প্যাডের উপরকার ব্লাটিং পেপারের সাহায্যে বহু ব্যক্তির সই জাল করতে পেরেছে।

ঔষধ, তৈল, খাদ্য এবং পেটেণ্ট দ্রব্যাদির নকলও এই জালিয়াতি অপরাধের অন্তর্গত। ঔষধ-জাল এদেশের এক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধকে সাধারণতঃ ভেজাল বলা হয়ে থাকে। নামকরা ঔষধ, তৈল, এয়ারেটেড্ ওয়াটার প্রভৃতির পুরাতন বোতল-

সমূহ খরিদ্দাররা পরে বাজারে বিক্রয় করে দেয়। জালিয়াতগণ এই সকল কোম্পানির নাম লেখা বহু বোতল বাজার হ'তে সংগ্রহ করে এবং ঐ বোতলের কাগজের লেবেলের অনুরূপ লেবেল কোনও এক প্রেস হ'তে ছাপিয়ে আনে। এর পর তারা বাজে মাল মসলার সাহায্যে ঐ ঔষধ নকল করে উহা ঐ বোতলে পূরে লেবেল এঁটে বাজারে বিক্রয় করতে থাকে। যে সকল ঔষধ বা তৈল আদি বাজারে নাম করেছে এবং যাহার বিক্রয় অধিক সেই সকল ঔষধ বা তৈলই নকল করা হয়ে থাকে। এই প্রকার নকল ঔষধকে ইংরাজীতে বলা হয় Spurious drug, বাংলায় বলা হয় নকল বা ঝুটা বা জাল। খাদ্যাদিতে ভেজাল দেওয়াও জালিয়াতি অপরাধের সামিল। বহুক্ষেত্রে গব্য ঘৃতের সঙ্গে ভেজিটেবেল ঘৃত মিশিয়ে উহাতে ঘৃতের কৃত্রিম গন্ধ প্রদান করে উহাকে খাঁটি ঘৃত বলে চালানো হয়েছে। গ্রীষ্মকালে নারিকেল তৈল জমে না। এই সুযোগে উহার সহিত হোয়াইট অয়েল বা রিফাইন কেরোসিন তৈল প্রয়োগ করে উহাকে খাঁটি নারিকেল তৈল রূপে চালানো হয়েছে। কিন্তু শীতকালে এই জাল তৈল ছাড় ছাড় ভাবে সামান্য মাত্র জমে। এইজন্য শীতকালে নারিকেল তৈল কম ক্ষেত্রেই জাল করা হয়ে থাকে। হোয়াইট অয়েল থাকায় এই তৈল বহুদিন ব্যবহার করলে মাথার কেশ ধীরে ধীরে উঠে যায়। এইজন্য এই অপরাধের গুরুত্ব অসামান্য। খাদ্য এবং তৈলের অনুরূপ বহু বর্ণ বা গন্ধ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এই গন্ধ এবং বর্ণের সাহায্যে অপরাধীরা ভেজাল এবং বাজে মাল দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে খাঁটি মালের অনুরূপ খাদ্য বা দ্রব্যাদি জাল করতে সক্ষম। বহুক্ষেত্রে খাঁটি গো দুগ্ধ হ'তে অসাধু ব্যবসায়ীরা যন্ত্রের সাহায্যে নবনীর (Cream) কিছু অংশ তুলে নিয়ে উহা খাঁটি গোদুগ্ধ বলে বিক্রয় করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। বহু ব্যবসায়ী আটা বা ময়দার

সহিত শ্বেত পাথরের গুঁড়া এবং সরিষার তৈলের সহিত অব্যবহার্য্য তৈল মিশিয়ে বাজারে তা বিক্রয় করে নাগরিকদের স্বাস্থ্যহানিও ঘটিয়েছেন।

অপর ব্যক্তির আবিষ্কৃত পেটেণ্ট দ্রব্যাদি নকল করে বাজারে বিক্রয় করাও এক জঘন্যতম অপরাধ। এইরূপে বেপরোয়া নকল * প্রতিরোধ করতে না পেরে বহু অকৃত্রিম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে উহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিনষ্টও হয়েছে। এই বিষয়ে জনসাধারণ এবং সরকার বাহাদুর, উভয় পক্ষেরই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

মুদ্রা ও নোট জালকে সাধারণ লোক "জাল", খাদ্য-ভেজাল ও দ্রব্য-জালকে জালিয়াতি এবং প্রবঞ্চনাকে জুয়াচুরি বলে থাকে। এই 'জাল, জালিয়াতি ও জুয়াচুরি' সমপর্য্যায়ের অপরাধ। পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রবঞ্চনা-অপরাধ কদাচিৎ সংঘটিত হতো। এমন কি উহার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত কারো জানা ছিল না। তবে চুরি এবং দ্যূতক্রীড়া বা জুয়ার সমধিক প্রচলন ছিল। এই জুয়ার সময় ঘুঁটী পাল্টিয়ে বা উহা চুরি করে লোককে অবৈধভাবে হারিয়ে দেওয়াও হতো। জুয়ায় এই চুরিকে বলা হতো জুয়াচুরি। এই জুয়াচুরি প্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র। এই

* এ'ছাড়া বিদেশী পুস্তক বা ঔষধাদি জাল করার সুবিধা আছে। এর কারণ দূর দেশ হ'তে খবরাখবর নেওয়া সম্ভব হয় না। মহাযুদ্ধের সময় এইরূপ জাল বা নকল করার মরসুম পড়ে যায়। কখনও কখনও যে নকল আসলের চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়নি তা'ও নয়। বাজে নকল দ্বারা বিদেশী দ্রব্য বাজারে অচল করে দিয়ে অনুরূপ এক দেশীয় শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় করারও নজীর আছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভেজাল কার্য্য বাজে দ্রব্য দ্বারাই সমাধা হয়েছে। এই সব ভেজালের মধ্যে খাদ্য ও ঔষধ ভেজালই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। ইহা সমগ্র জাতিকে একেবারে পঙ্গু ও ক্লীব করে তুলে।

জুয়াচুরি হ'তেই জুচ্চুরি শব্দের প্রচলন হয় এবং এই অপঃপদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হ'তে থাকে।

[ছাপাখানাসমূহ প্রেসের নাম না দিয়ে কোনও প্রকার পত্র বা অন্য কিছু ছাপলে উহা বে-আইনী হয়। এমন বহু অসাধু প্রেস আছে যেখানে এমন বহু নিষিদ্ধ প্রচার পত্র বা আপত্তিকর প্রচার পত্র ছাপা হয়েছে। কোনও প্রেস খরিদ্দারদের দেওয়া কাগজও নানা অছিলায় চুরি করে থাকে।]

অপরাধ—রাস্তাবন্দী

রাস্তাবন্দী অপরাধ বহু প্রকারের হয়ে থাকে। রাজপথে অবৈধ ভাবে দোকান-পাট বসানো রাস্তাবন্দী অপরাধ। অপরাধীরা নিজেদের ফিরিওয়ালা রূপে পরিচয় দিলেও কদাচ ফিরি করে দ্রব্য বিক্রয় করে। এদের কেহ কেহ ফুটের উপর ছোট বড় বিপণিও বসিয়েছে। এইরূপ বিপণিকে তারা সাময়িক বিপণি বলে থাকে। এরা এতদ্বারা পথ অবরোধ করে এবং ফলের খোসা ছড়িয়ে পথচারীর মৃত্যুও ঘটায়। খোসায় পা পিছলে আছাড় খাওয়া বহু পথচারীর ভাগ্যে ঘটেছে। এতদ্ব্যতীত এরা বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ক্ষতি করে। এরা রাজপথে বড় বড় ছাউনি ফেলে বিনা ভাড়ায় দোকান করে। বিক্রয়কর, পথকর, আয়কর প্রভৃতি হ'তে এরা অব্যাহতি পায়। এইজন্য কথঞ্চিত সুলভ মূল্যে এরা দ্রব্য বিক্রয়ে সক্ষম। অপর দিকে স্থায়ী ব্যবসায়ীরা শত শত টাকা বাড়ী-ভাড়া, বিক্রয়কর এবং আয়কর দিয়ে থাকে। এই কারণে এদের পক্ষে ফুটপাত দখলকারীদের সহিত প্রতি-

যোগিতা করা সম্ভব হয় না। এইজন্য এরা কেউ কেউ নিজেদের বেতনভুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ফুটপাতেরও কিছুটা দখল রাখে। তাদের দোকানের দ্রব্যাদি এই সাময়িক বিপণিসমূহে ছদ্মনামে বিক্রীত হয়। পুলিশের হামলা হ'লে এরা ত্বরিত গতিতে তাদের স্থায়ী দোকানে আশ্রয় নেয়।

কোনও কোনও ফিরিওয়ালা ক্রেতাদের উপর বহুবিধ জুলুম করেছে। এজন্য জনসাধারণের সহানুভূতি এদের কাহারও কাহারও প্রতি কম। কোনও একটী দ্রব্য বা বস্ত্র ক্রেতারা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করলে এরা তাদের উহা ক্রয় করতে বাধ্য করে এই অজুহাতে যে দ্রব্যটী নাড়াচাড়ার ফলে অপর খরিদ্দাররা উহা নিবে না। এই ব্যাপারে বচসা, মারপিঠ এবং খুনখারাপিও হয়ে থাকে। কলহের কারণে খরিদ্দারদের বিরুদ্ধে মিথ্যা চুরির অভিযোগও করা হয়েছে। কখনও কখনও ভাল দ্রব্য দেখিয়ে নিকৃষ্ট দ্রব্যও গছিয়ে দেওয়া হয়। অপরাধ এরা সহজেই এড়িয়ে যেতে পারে। বহুক্ষেত্রে পুলিশ পৌঁছবার পূর্ব্বেই এরা সরে পড়তে সক্ষম। এই সুবিধা স্থায়ী দোকানীদের নাই। এইজন্য তারা অপরাধও করে কম।

গরু মহিষ আদি জীবদের রাজপথে পালন করা একপ্রকার রাস্তাবন্দী অপরাধ। এই অপরাধ দেশবালী ব্যক্তিদের দ্বারা অধিক কৃত হয়েছে। খাটাল ভাড়া, আয়কর, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রভৃতি হ'তে এরা সর্ব্বদাই মুক্ত। যারা খাটাল আদি ভাড়া করে গরু রাখে সেই সব দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা এদের সহিত প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম। বহুক্ষেত্রে মহিষাদিকে রাজপথের জলকলে স্নান করানো হয়। এই ভাবে এরা সহরের স্বাস্থ্যও বিপন্ন করছে। বহু ব্যক্তি জমি কিনলেও অর্থের অভাবে বাটী নির্ম্মাণ করতে পারেন নি। এই গোয়ালারা অবৈধ ভাবে

এই উন্মুক্ত জমিতে গরু মহিষ রেখে প্রতিবেশীর স্বাস্থ্যের হানি ঘটিয়েছে।

রাস্তাবন্দী অপরাধে অপরাধী গো-মহিষাদি জীবকে রাজপথে পেলে তাদের ধরে পাউণ্ডে দেবার রীতি আছে। পালিত জীবদের ছাড়িয়ে নিতে হ'লে উহাদের মালিকদের খোরাকী এবং পাউণ্ড 'ফি' বাবদ কিছু অর্থ গচ্ছা দিতে হয়। বার বার অর্থ দণ্ডের কারণে গরু রাস্তায় আর না রাখাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নয়। কারণ ঐরূপ অর্থ দণ্ড রাস্তা ভাড়া রূপে তারা ধরে নেয়। প্রতিমাসে যে পরিমাণ অর্থ তারা দণ্ড দেয় তার চেয়ে বহু অর্থের প্রয়োজন খাটাল ভাড়া ও ঘাসের জমি জমা নিতে। শহরাঞ্চলে বিশেষ আইনের সাহায্যে এদের উপর রাস্তাবন্দী মামলাও দায়ের করা হয়। কিন্তু পাউণ্ড চার্জ্জ, খোরাকী এবং আদালতের জরিমানা প্রদান করেও এরা রাস্তায় গরু রাখা লাভজনক মনে করে। এইজন্য আইনের ভয়ে গোয়াল বা জমি ভাড়া নিতে এরা সকল সময়েই নারাজ।

ফিরিওয়ালারাও রাস্তাবন্দী অপরাধে জরিমানা দেওয়াকে ফুটপাত ভাড়ার সামিল মনে করে। আইন দ্বারা গরু এবং দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হলে তবে এই অপরাধ বন্ধ হবে। মোটর, হাত-গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতির মালিকরাও রাস্তাবন্দী ক'রে তাদের শকট রক্ষা করে। কারণ তারা এতদ্বারা গ্যারেজ ভাড়া হ'তে অব্যাহতি পায়।

পাউণ্ড বা খোঁয়াড় দুই প্রকারের হয়। যথা—সরকারী এবং বেসরকারী। শহরাঞ্চলে খোঁয়াড়গুলি পুলিশের রক্ষণাধীন থাকে। কিন্তু শহরতলী এবং পল্লী অঞ্চলে এইগুলি বেসরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। জিলা হাকিম এইগুলি অনুমোদন করেন এবং বাৎসরিক ডাকে এইগুলি সাধারণ ব্যক্তিগণ এক বৎসরের জন্য ক্রয়

করে। গরু পিছু কমিশন বাবদ এই খোঁয়াড় হ'তে নিলাম ক্রেতারা বহু অর্থ উপায় করে থাকে।

খোঁয়াড়ী পশুদের মালিকগণ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে উহাদের দাবী না করলে ঐ পশুগুলিকে খোঁয়াড়-রক্ষকগণ নিলামে বিক্রয় করে দেয়। এবং এই বিক্রয় লব্ধ অর্থ হ'তে হেপাজতি, খোরাকী এবং খোঁয়াড়-কর কেটে নিয়ে বাকি অর্থ সরকারী ধনাগারে তারা জমা দেয়। এই খোঁয়াড় সম্পর্কেও বহুবিধ অপরাধের কথা শুনা গিয়েছে। প্রথমতঃ, নির্দ্ধারিত পর্য্যাপ্ত যা খাদ্য এই বন্দীকৃত পশুদের জন্য বরাদ্দ থাকে তা তাদের দেওয়া হয় না। এর ফলে কয়েকদিনের মধ্যে পশুগুলি জীবন্মৃত হয়ে যায় এবং তার ফলে অচিরে ঐগুলি অকেজো হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, দুগ্ধবতী গাভীদের দুগ্ধ দুয়ে নেওয়া হয়, সরকারী দপ্তরে তার কোনও উল্লেখ না করে। তৃতীয়তঃ, ভালো গরুকে রুগ্ন বলে কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়। কারণ নিয়ম মত নির্দ্দিষ্ট মূল্যের নিম্নে নীলাম করার রীতি নেই। পাছে কেহ প্রশ্ন করে, যে মহিষ বা গরু বাজারে ৫০০৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না, তাহা ৫০৲ টাকায় কিরূপে বিক্রয় হয়? এইজন্য ভালো গরুকে রুগ্ন গরু কিংবা বাছুর বলে বিক্রয় করা হয়েছে।

হারানো পশুদের এমন মালিক আছে যারা এখানে ওখানে খোঁজা-খুঁজির পর—বহুদিন পরে খোঁয়াড়ে এসে ঐ পশুর সন্ধান করে। ইতিমধ্যে খোঁয়াড়ী খোরাকী এবং কর বাবদ দেয় অর্থ এত বেশী হয়ে পড়ে যে ঐ দাবী মিটিয়ে ওদের ফেরত নিলে তাদের লোকসান হয়। এরকারণ বহু-ক্ষেত্রে খোঁয়াড়ী করের দাবী পশুদের প্রকৃত মূল্যের বহু উর্দ্ধে উঠে পড়ে। এই অবস্থায় তারা খোঁয়াড়-রক্ষকদের বা তাদের কর্ম্মচারীদের সহিত অবৈধ বন্দোবস্ত করে নীলামে উহা কম মূল্যে কিনে নেয়। সরকারী খোঁয়াড়ে এই অপরাধ কৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এর কারণ এখানে

ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। এতে যদি কারো লোকসান হয় তা রাজসরকারের। এতদ্ব্যতীত নীলাম রীতিমত ইস্তাহার জারী করে প্রকাশ্যে করার নিয়ম। বহুক্ষেত্রে ইহা মাত্র কাগজে কলমে জারী করা হয় এবং লোক জানা-জানি না করে নীলাম গোপনে সাধিত হয়। এই নিলামে বন্ধু-বান্ধবদের খবর দিয়ে এনে মাত্র তাদের নিকট কম মূল্যে উহাদের বিক্রয় করা হয়েছে। কাগজে কলমে উহাকে প্রকাশ্য নীলাম বলা হলেও ক্ষেত্র বিশেষে এই সকল বন্ধুদের মারফত পাউণ্ড কর্ম্মচারীরাও সস্তায় এই সকল নীলাম খরিদ করেছেন। এইরূপে বকলমে নিলাম ক্রয় না করলে তাঁদের পক্ষে এই নীলামে কিছু ক্রয় করা বিভাগীয় অপরাধরূপে গণ্য হয়। এমন বহু অপরাধী আছে যারা মূল্যবান গো-মহিষাদি চুরি করে এনে চুরির দায় এড়ানোর জন্যে এই খোঁয়াড়সমূহে উহাদের জমা দেয় এবং পরে খোঁয়াড় রক্ষকদের সহিত যোগ-সাজসে উপরোক্ত উপায়ে সস্তায় নামমাত্র মূল্যে ঐগুলি ক্রয় করে। সরকারী নীলামে উহাদের ক্রয় করার কারণে উহাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করাও সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে এই অপরাধীরা অপহৃত গো-মহিষদের বহু দূরাঞ্চলের কোনও এক খোঁয়াড়ে জমা দিয়ে আসে। এইরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে মালিকরা এদের সহজে খুঁজে বার করতে পারবে না।

পল্লী অঞ্চলে সামাজিক কারণেও রাস্তাবন্দীর প্রথা আছে। কোনও গৃহস্থের কন্যার বিবাহের পর বরকর্ত্তা বর-কনে সহ যাত্রা করার সময় পল্লীর বারোয়ারী হ'তে তাঁর নিকট চাঁদা চাওয়া হয়। এই সময়ে বলা হয় বর-পণ স্বরূপ যে অর্থ এ গাঁ থেকে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন তা থেকে কিছু তাদের চাঁদা দিতে হবে। অস্বীকৃত হ'লে পল্লী যুবকরা রাস্তায় খানা কেটে বা কাঁটা দিয়ে তা বন্ধ করে দিয়েছে। প্রাপ্য অর্থ চাঁদা দিলে তবে এই রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব্বকালে পল্লী অঞ্চলে রেষারেষীর কারণেও রাস্তাবন্দী করা হতো। ওপাড়ার দুর্গা ঠাকুর এপাড়ার ঠাকুর অপেক্ষা দুই হাত উঁচু করা হলো। ওপাড়ার লোকের ধারণা হলো, এই ব্যবস্থা তাদের পূজাকে হেয় করার জন্যে। এর প্রতিবাদে এপাড়ার বাসিন্দারা রাস্তার উপর এতো ছোট করে গেট বানালো যাতে ঐ উঁচু প্রতিমার মাথা ঐ গেটে আটকায়। এইরূপে রাস্তাবন্দী করায় ওপাড়ার লোক ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ গেট ভাঙতে ছুটে এবং এপাড়ার লোক তাতে বাধা দেয়। এইরূপ রাস্তাবন্দীর কারণে পূর্ব্বে বহু দাঙ্গা খুনোখুনিও হয়ে গিয়েছে।

রাস্তা বা জমি মেরে নেওয়া বা বেদখল করা (Encroachment) রাস্তাবন্দীর সামিল অপরাধ। অপরের জমির সীমানার কিনারায় অবস্থিত আপন পুকুর বা সীমানির্দ্দেশক খানার মাটি প্রতিবৎসর সংস্কারের অছিলায় এমন সরল ভাবে কাটা হয় যাতে বর্ষার ধোয়াটে জল অপরের জমি ভেঙে তাদের স্ব স্ব পুকুর বা খানার পরিধি বাড়িয়ে দেয়। ঐ খানা বা পুকুরের উল্টা দিকে অবস্থিত অপরাধীদের জমি ঢালু ভাবে কাটা হয় যাতে ঐ দিকের জমি বর্ষায় না ধষে পড়ে। যে সকল জমির মালিক বিদেশে বাস করে তাদের জমি এই ভাবে একটু একটু করে এরা দখল করে নিয়েছে। পূর্ব্বকালে পল্লীবাসিগণ ইহাকে জঘন্যতম অপরাধ মনে করতো। 'ভূমিহরণ হচ্ছে মাতৃহরণ' এই প্রবাদটী ইহা প্রমাণ করবে। প্রতিবৎসর বেড়া দেবার সময়ও পল্লীবাসিগণ রাজ-পথ একটু একটু করে মেরে নিয়ে থাকে। এই অপরাধ অত্যল্প ভাবে সাধিত হয়। এইজন্য সহসা উহা কাহারও চোখে ধরা পড়েনি।

"কোনও কাজ করার" ন্যায় "কোনও কাজ না করাও" এক প্রকার অপরাধ। কেহ যদি বাড়ী করার জন্য সুগভীর ভিত কাটে এবং উহা যদি নিরাপত্তার কারণে ঘিরে না রাখে তা'হলে শিশুরা

দৈবাৎ ঐ খাদের ভিতরে পড়ে আহত হ'তে পারে। বহু ক্রীড়ারত বালক বা শিশুর এইভাবে মৃত্যুও ঘটেছে। এই "করা বা না করা" এক প্রকার অপরাধ। অনুরূপ ভাবে হিংস্র জন্তু বা কুকুরাদি সাবধানতায় সহিত রক্ষা না করাও অপরাধ। বহু ক্ষেত্রে এই হিংস্র জন্তু দৈবাৎ মুক্তি পেয়ে মানুষের প্রাণ নাশ ঘটিয়াছে। অট্টালিকাদি ভাঙবার সময়ও নিম্নের চারিদিকে ঘিরে রাখার রীতি আছে যাতে নিক্ষিপ্ত ইষ্টক দ্বারা কেহ আহত না হয়। নিশ্চিত বিপদ সম্বন্ধে অবগত হয়ে অপরকে সাবধান না করাও অপরাধ। মানুষের এমন কোনও কাজ করা বা না করা উচিত নয়, যাতে এদেশে ব্যাধির প্রকোপ, লোক শিক্ষার বিঘ্ন, শস্যের হানি হয় বা চলাচলের কোনও ক্ষতি হবে বা তা হতে পারে। দেশ, সমাজ, ধর্ম্ম, এবং রাষ্ট্রকে ভালো না বাসা, এবং এর জন্য যে কোনও স্বার্থ ত্যাগ না করা বা তা করতে ইতস্ততঃ করাও অন্যতম অপরাধ। যারা বনভূমি স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করে বা নদী বা নালার মুখ আপন স্বার্থে বন্ধ করে তারা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করে। এমন বহু খাল আছে যা নদীর জল বিলে বা মাঠে এনে ধান্য বাড়ায়। এমন বহু জমিদার আছে যারা মৎস্যের জন্য এই খালের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার ফলে শত শত বিঘা ভূমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ দেশে ধান্যের মূল্য বেড়ে গিয়েছে বা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। এইজন্য লোভ দমন না করা এবং অতিলাভ করার ইচ্ছাকেও আমরা অপরাধ বলি।

জনসাধারণ ব্যবহৃত পুষ্করিণীতে কলেরা প্রভৃতি রোগীর মলমূত্র সহ বস্ত্রাদি ধৌত করা অপর এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এতদ্বারা এরা সমগ্র পল্লীবাসীদের জীবন সংশয় করেছে। রাজপথে আবর্জ্জনা নিক্ষেপকেও অপরাধ বলা হয়। এদেশের লোক এই অপরাধ প্রায়ই করে থাকে।

কিন্তু য়ুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের জনসাধারণ এই অপরাধ কদাচ করেছে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটী উল্লেখযোগ্য।

"একদিন চৌরঙ্গী রাস্তায় আমি যাচ্ছিলাম। দেখলাম একজন য়ুরোপীয় সাহেব লিচু খেতে খেতে চলেছে। কিন্তু তার খোসা এবং আঁটি রাস্তায় না ফেলে তার দামী স্যুটের পকেটে রেখে দিচ্ছে। আমার কৌতূহল হওয়ায় সাহেবের পিছন পিছন কিছুটা দূর গিয়ে এবং তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, সাহেব! এ তুমি কি করছো? উত্তরে বিদেশী ভদ্রলোক বললে, কি করবো? নিকটে কোনও ডাষ্টাবিন খুঁজে পেলাম না যে! আরও কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে সাহেব চৌরঙ্গীর মোড়ের একটা ডাষ্টবিনে খোসা ও আঁটীগুলি ফেলে দিলে।"

এ সম্বন্ধে অপর একটী বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। এই বিবৃতিটী বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। শুধু তাই নয়। ইহা অনুকরণীয়ও বটে।

"আমি একজন ভারতীয়। ঐদিন য়ুরোপের অমুক শহরে আমি ছিলাম। বাস থেকে নেমে বাসের টিকিটটা আমি রাস্তায় ফেলি। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে এক পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে নিকটের পুলিশ গুমটীতে নিয়ে যায়, এবং এই অপরাধের অন্য আমাকে তারা ফাইন করে। ফাইনের অর্থ আদায় করে তারা আমাকে একটা রসিদও দেয়। অভ্যাসমত ঐ রসিদটীও আমি রাজপথে নিক্ষেপ করি। পুলিশ পুনরায় আমাকে এজন্য পাকড়াও করে এবং আমাকে ফাইন দিতে বাধ্য করে। কিন্তু এবার রসিদ তারা কাটলেও ঐ রসিদ আমার হাতে আর দেয় নি। বোধহয় তাদের ধারণা হয়েছিল যে পুনরায় আমি ঐভাবে রাস্তা নোঙরা করবো।"

অপরাধ—আবগারী

নিষিদ্ধ দ্রব্য বা ফলের প্রতি মানুষ মাত্রেরই লোভ থাকে। আদাম ও ইভের গল্প হতে তা প্রমাণিত হবে। বাধা নিষেধকে উপলক্ষ্য করে এই আবগারী অপরাধ গড়ে উঠেছে। পরন্তু এই বাধা নিষেধ শাসনতান্ত্রিক অপরাধ। ইহা কোনও এক বৈজ্ঞানিক অপরাধ নয়। এই অপরাধকে সকল ক্ষেত্রে অসামাজিকও বলা চলে না। নিষিদ্ধ পণ্য দুই প্রকারের; যথা, (১) আবগারী, যথা অহিফেন আদি নেশার দ্রব্য, যাহার উপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার আছে। (২) অপরাপর, যথা, দ্রব্যাদি যাহা রাষ্ট্রের উপকারার্থে বা জনস্বার্থের কারণে চিরকালের জন্য বা সাময়িক ভাবে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত (Controlled) করা হয়। অর্থাৎ যার হেপাজতি (Possession) এবং ক্রয়-বিক্রয়ের বা মূল্য নির্দ্ধারণের উপর উপরোক্তরূপ বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। প্রথমতঃ আবগারী অপরাধের কথা বলা যাক। এ দেশে প্রধান আবগারী দ্রব্য (১) অহিফেন, (২) কোকেন, (৩) মদ্য—পচাই, ধেনো ও বিদেশী, (৪) তাড়ী, (৫) চরস, (৬) গাঁজা ইত্যাদি নেশা মানুষের ক্ষতিকর একথা সকলেই জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ আবহমান কাল হ'তে এই নেশার দাসত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু সকল সময়ই যে এইগুলি অপকার করে তা নয়, বরং বহু উৎকৃষ্ট ঔষধাদিও এই দ্রব্যসমূহ হ'তে সৃষ্ট হয়েছে। দৈহিক যন্ত্রণায় লাঘব করতে ইহা এক অমোঘ ঔষধ। কোকেন ইন্‌জেক্‌সনের উপকারিতা শল্যতান্ত্রিক মাত্রেরই জানা আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে এই দ্রব্য নিচয়ের সেবন মানুষকে কর্ম্মঠ রাখে। এই কারণে না'কি পুরাকালীন ঋষিরা দর্শনা-লোচনার পূর্ব্বে কারণ-সলিল পান করতেন। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে,

স্বল্প পরিমাণ মাদক দ্রব্য সেবন বার্দ্ধক্যে বা শীতের দিনে মানুষকে সতেজ রাখে। বর্ত্তমানকালীন যুদ্ধে মানুষের স্নায়ুর বিকার ঘটা স্বাভাবিক। এই সময় যোদ্ধাগণ সামান্য মদ্যপান করলে স্নায়ুর শক্তি ফিরে পায়। কেহ কেহ বলেন যে আহারের পূর্ব্বে মাদক পান বিষ তুল্য। কিন্তু আহারের পর উহা সেবন করলে টনিকের কার্য্য করে। বস্তুতঃ বহু টনিক-ঔষধে এই কারণে মদ্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিদিন অপরিমিত মাদক দ্রব্য সেবন মানুষকে আর মানুষ রাখে না। উহা তাকে পশুরও অধম করে তুলে। তার স্নায়ুর শক্তি সে হারিয়ে ফেলে, তার মস্তিষ্ক স্তিমিত হয়ে পড়ে, এবং তার ফুস্‌ফুস্‌ এবং হৃদপিণ্ডের অবনতি ঘটে। শুধু তাই নয় আখেরে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমন কি অতি মাত্রায় মাদকতার দোষ বহু-পুরুষ স্থায়ী হয়েছে। পূর্ব্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে পরবর্ত্তী বংশধরেরা। এই সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা দেখেছি কিরূপে দুর্দান্ত ব্যাঘ্রকে অহিফেন সেবন দ্বারা মেষশাবকে পরিণত করা হয়েছে, আমরা দেখেছি কিরূপে কোকেন সেবন দ্বারা অপরিণত বালকগণ অপরাধীতে এবং বালিকারা বেশ্যায় পরিণত হয়েছে। (পুস্তকের প্রথম খণ্ড দেখুন) একদিন চীনাবাসীদের অহিফেন নেশায় ডুবিয়ে বিদেশীরা ঐ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিল। কারণ তারা জানতো এই নেশার সর্ব্বনাশী পরিণাম। জুয়ার ন্যায় এই নেশাও এদেশের বহু পরিবারের সর্ব্বনাশ সাধন করেছে। বহু পরিবারের সুখ শান্তি এইজন্য চিরদিনের মত অপসৃত হয়েছে। নেশাখোর এবং জুয়াড়ী স্বামীর স্ত্রীগণ এদেশে নিজেদের ভাগ্যহীনা মনে করে। এই নেশার এবং জুয়ার কারণে এদেশের বহু ধনী পরিবার আজ নিঃস্ব পথের ভিখারী।

যারা মনে করেন "মদ খাওয়া ভালো, মদে না খেলেই হলো" তাদের ধারণা ভুল। নেশা এমন এক অভ্যাস যা একটু একটু করে খেলেও পরে অভ্যাসের সামিল হয়ে যায়। বেশী না খেলে আর তাতে কারো মন বসে না। এইজন্য ঔষধের কারণ ব্যতীত মাদক দ্রব্য বিষবৎ পরিত্যজ্য।

অভ্যাস বা নেশা এমন এক জিনিস যা মানুষ ইচ্ছা করলেও ত্যাগ করতে পারে নি। ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় নেশার সন্ধানে এরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করেছে। কারাগারসমূহে নেশার উপাদান সরবরাহ করা হয় না, এইজন্য এদের অনেকে রুগ্ন হয়ে পড়ে। কেহ উৎকোচের বিনিময়ে উহা সংগ্রহ করে। মানুষের এই অত্যুগ্র প্রয়োজন মিটানোর বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির কারণে এই আবগারী অপরাধের সৃষ্টি।

আবগারী অপরাধীরা ইহাকে এক প্রকার বে-আইনী ব্যবসায় মনে করে। উহাকে তারা অপরাধ রূপে স্বীকার করে না। এই বে-আইনী ব্যবসায় উপলক্ষ করে পৃথিবী ব্যাপী বহু অপরাধ গড়ে উঠেছে। এই অপদলকে বলা হয় স্মাগলার বা অপবাহক। অপবাহকের কার্য্য কোনও ব্যক্তির একার দ্বারা সাধিত হয় না। এইজন্য এই অপবহন কার্য্য দলবদ্ধভাবে করা হয়ে থাকে।

এরূপ প্রতিটী দলের একজন নেতা আছে এবং এই নেতার নির্দ্দেশ মত দলের প্রতিটী কার্য্য সাধিত হয়। এই নেতাদের কেউ কেউ শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে পরিচিত। কয়েকদিন পূর্ব্বে যারা মাত্র সাধারণ গুণ্ডারূপে পরিচিত ছিল—পরবর্ত্তী কালে তাদের কাউকে কাউকে এই ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি রূপে দেখা গিয়েছে। এই ব্যবসায় দ্বারা অচিরে তারা প্রচুর ধন দৌলত গাড়ী এবং বাড়ীর মালিক হয়ে উঠে। এরা বহু অর্থ সরকারী তহবিলে দান ধ্যান ও অন্যান্য

সৎকর্ম্মের জন্য দান করে প্রথমে নামার্জ্জন করে। অর্থাদি বা দান ধ্যানের ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এদের যাতায়াত সুগম হয়। শহরের বড় বড় অফিসারের সহিত এদের এই ভাবে মেলামেশার সুযোগ ঘটে। এই উদ্দেশ্যে শহরের বড় বড় ক্লাব এবং সমিতির এরা সভ্যও হয়েছে। বড় বড় অফিসারদের সহিত মেলামেশা করায় ছোট অফিসাররা এদের ভয় করে চলে। এইভাবে এরা শহরের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। এরা সাক্ষাৎ ভাবে এই অপবহন বা স্মাগলিঙএর ব্যাপারে কদাচ লিপ্ত থেকেছে। এদের অধীনে যে সকল গুণ্ডা শ্রেণীর উপনেতা থাকে তারা তাদের হয়ে এই ব্যবসায় চালিয়ে যায়। এই কালো ব্যবসায়ের পিছনে থাকে ঐ সকল প্রধান নেতাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং অর্থ।

এই সকল দলের বেতন-ভূক বহু উকিল থাকে। দলের কেউ ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ এরা তাদের জামিনের বন্দোবস্ত করে। দৈবাৎ কেহ জেলে গেলে দলপতিরা জেলে থাকাকালীন তাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করে থাকেন। এদের জামীন হবার জন্যও একদল মানী বা ধনী লোক সর্ব্বদা মজুত থাকে। এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া এদের অধীনে একদল লোক আছে যারা জেলে যাবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এরা দাগী বা পুরাণো চোর বা নিকর্ম্মা হয়। এদের জেল ভীতি আদপেই নেই। দৈবাৎ কোনও নেতৃস্থানীয় বা দক্ষ কর্ম্মীর বাটীতে যদি বামাল ধরা পড়ে, তাহলে যে ঘরে উহা পাওয়া যায় সেই ঘর তার বলে সে দাবী করে। এই সময় পিছনের তারিখ লিখে কয়েকটী ভাড়ার রসীদও ঐ ব্যক্তির নামে কেটে দেওয়া হয়েছে। এ রসীদ হ'তে ঐ ঘরটী যে ঐ ব্যক্তির এবং উহা যে বাড়ীর মালিকের নয় তা সহজে প্রমাণিত হয়। এর ফলে বাড়ীর মালিকের বদলে ঐ

ব্যক্তিই জেল খেটে আসে এবং ঐ বাড়ীর মালিক ধরা পড়লেও সে অব্যাহতি পায়।

এইরূপ বিপদে পড়ে বহুক্ষেত্রে মনিব চাকর এবং চাকর মনিব সেজেছে —মনিব নিরীহ চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করে অব্যাহতি পেয়েছে এবং চাকর মনিবের ভূমিকায় দোষ কবুল করে জেলে গিয়েছে। সুদক্ষ অপবাহকদের রক্ষার জন্য দলের লোকেরা এইরূপে বহু অর্থ ব্যয় করে থাকে। কারণ দক্ষ লোক জেলে আটকা থাকলে ব্যবসায়ের ক্ষতি অসীম।

আবগারী দ্রব্য মূলতঃ দুই প্রকারের। (১) বিদেশ হ'তে আমদানী দ্রব্য, (২) এবং এই দেশে যাহা জাত। অপবাহকরা আমদানী ও রপ্তানী এই দুই প্রকার দ্রব্যেরই ব্যবসা করে থাকে। এইজন্য এরা বহু আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃপ্রাদেশিক দলও তৈরী করেছে। আমদানী প্রধানতঃ বিদেশী নাবিকদের সাহায্যে কৃত হয়েছে। এই অবৈধ আমদানী রপ্তানী বন্ধ করবার জন্যে বিশেষ পুলিশ এবং কাষ্টমস্ বাহিনী সদা সচেতন, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচুর অবৈধ আমদানী সকল দেশে সমান। এই অপকার্য্যের জন্য অসৎ নাবিকরা জাহাজে বহু গহ্বর ও চোরা কুঠ্রীও বানিয়েছে।

রেলওয়ে কাষ্টমস্ এবং পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যে সকল দ্রব্য গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়, সেইগুলি শহর এবং পল্লীর বিভিন্ন অপবাহঘাঁটীতে শকট যোগে, হাঁটা পথে বা নৌকা যোগে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়।

এই অপঘাঁটী সকল অধিক সংখ্যায় শহরের বস্তী অঞ্চলে এবং ব্যবসায় কেন্দ্রে দেখা গিয়েছে। কলিকাতা এবং বোম্বাই শহরে পূর্ব্বে এইরূপ বহু ঘাঁটীর সন্ধান মিল্‌তো। এই সকল ঘাঁটী অতি সতর্কতার সহিত নির্ম্মিত হতো এবং বিক্রয়ের সময় প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করা হতো। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টী সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"শুনতে পেলাম অমুক আড্ডায় অবৈধ ভাবে কোকেন বিক্রয় হচ্ছে। একজন কোকেন খরিদ্দারকে ইতিমধ্যেই আমি হাত করে ফেলেছি। লোকটী আমাকে এ-গলি ও-গলি দিয়ে একটী বস্তীর অভ্যন্তরে এক দ্বিতল মাঠ কোঠার সমুখে আনলো। লোকটী অকুস্থলে এসে শিস দেওয়া মাত্র দ্বিতলের জানালা হ'তে একটা মালা (পাত্র) দড়ির সাহায্যে নীচে নামিয়ে দেওয়া হলো। কে যে উপর হ'তে ঐ দড়ী বাঁধা মালা নীচে নামালো তা আমরা জানতে পারি নি। আমার পথ প্রদর্শক একটী আধুলি ঐ মালায় রাখা মাত্র ঐ মালাটী উপরে উঠে গেল এবং কিছু পরে ঐ পাত্র করে নেমে এলো এক পুরিয়া কোকেন।

এইরূপ সাবধানতার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আইনকে ফাঁকি দেওয়া। এতে সুবিধে এই যে বিক্রেতা কে? তা কোনও ক্রেতা বলতে পারে নি। এইজন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত করাও যায় নি।"

এই সকল গৃহের মেঝেতে টালির তলায় কিংবা দেওয়ালের গায় বহু গুপ্ত ফোঁকর থাকে। ফোঁকরে দ্রব্যাদি রেখে তা বাহির হতে গেঁথে দেওয়া হয়। রাত্রি যোগে ঐ গুলি ভেঙে দ্রব্যাদি বাহির করা হয়ে থাকে। এজন্য সুদক্ষ রাজ এবং ছুতার মিস্ত্রী এরা মাহিনা করে রাখে। চীনা অপবাহকগণ এইরূপ কক্ষ নির্ম্মাণে সর্ব্বাপেক্ষা পটু।

এই সকল গৃহের অভ্যন্তরে কিংবা প্রাচীর বেষ্টিত ভূমি বা প্রাঙ্গণে বহিঃড্রেনের সহিত সংযুক্ত বড় বড় গহ্বর থাকে এবং এই গহ্বরের পার্শ্বে থাকে জলের ট্যাঙ্ক। কলের জল ট্যাঙ্কে এসে জমা হয় এবং ট্যাঙ্কের উপকল হ'তে অবিরল ধারায় জল এই গহ্বরের পথে প্রবাহিত হয়। এর কারণ এই যে সকল সময় কলের জল স্থায়ী হয় না। এই জন্য এই জলপূর্ণ ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যতক্ষণ ক্রয়-বিক্রয় চলে বা দ্রব্যাদি গৃহে মজুত থাকে ততক্ষণ এই জলের পতন ধারাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

পুলিশ তল্লাসীর কারণে এই গৃহ ঘেরাও করা মাত্র দ্রব্যাদি এই জলের তোড়ে নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ গৃহে এসে এর চিহ্ন মাত্রও দেখবে না। সকল সময় দ্রব্যাদি যে এই ভাবে নষ্ট করা হয় তা নয়। এই জন্য বহু বহির্দরজা এবং চোরাকুঠুরী নির্ম্মাণ করা হয়। বহু ক্ষেত্রে মেয়েরা এই দ্রব্য পাচারের ব্যাপারে পুরুষদের সহায়ক হয়েছে। পুলিশ ঘরে আসা মাত্র এই মেয়েরা ছুতায় নাতায় পুলিশের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে আঁচড়াতে কামড়াতে সুরু করে। তবে প্রথমে তারা বাক-বিতণ্ডা এবং পথ অবরোধ করে পুলিশকে যতক্ষণ পারে ততক্ষণ আটকে রাখে। এই সুযোগে পুরুষ অপবাহকগণ বামাল সহ গোপন পথে সরে পড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকগণ বস্ত্রাভ্যন্তরে কটীদেশে এমন কি যৌনদেশাভ্যন্তরেও বামাল লুকিয়ে ফেলেছে। এই স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের সহকর্ম্মী, কেহ কেহ উপপত্নীও বটে। এই অপবাহকের ব্যাপারে বহু নারীও নেতৃত্ব করেছে। এদের কেউ কেউ পুংশ্চলী নারী। কেহ কেহ পুরুষ অপেক্ষাও দুর্দ্দান্তা। পূর্ব্বে মধ্য কলিকাতায় এইরূপ এক দুর্দ্দান্তা অপবাহিকা ছিল। অপবহনের কার্য্যদ্বারা সে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেছে। সহরে এর বহু ত্রিতল বাড়ী এবং কয়েক খানি গাড়ী আমি সেদিনও দেখেছি। এই স্ত্রীলোকটী পুরুষের বেশে ঘোরাফিরা করতো। কোনও এক সময় সে পুরুষের বেশে ধরা পড়ে থানায় এক রাত্রি আটকও থাকে, কিন্তু জামীন হওয়ার সময় পর্য্যন্ত তাকে কোতোয়ালি লোকগণ পুরুষ মনে করেছিল। খাতা-পত্রে তার পুংনাম লিখে তারা তাকে পুরুষের হাজতে রেখেছিল। এই স্ত্রীলোকটী মাসিক মাহিনায় চার জন উপপতিও নিজের জন্য বাহাল রেখেছিল। এরা দিন রাত্রি পয়সার বিনিময়ে স্ত্রীলোকটীর মনোরঞ্জন করতো। মধ্যে মধ্যে এদের দুই একজনকে তাড়িয়ে স্ত্রীলোকটী নূতন

উপপতিও গ্রহণ করেছে। এই উপপতিগণের একজন তার গাড়ী চালাতো এবং অপর কয়জন তার ফাইফরমাস খাটতো এবং বাজারও করতো, স্ত্রীলোকটী এখন বৃদ্ধা এবং সে আজও বেঁচে আছে, তার উপপতিরাও।

এই অপবাহক নেতারা পুলিশকে উৎকোচে বশীভূত করতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। শুনা গিয়েছে এই জন্য তারা বহু অর্থ গোপনে খরচ করেছে, কিন্তু পুলিশ বিভাগে সৎ অফিসারের প্রাচুর্য্যের কারণে অধুনা কালে এই অপবাহ ব্যবসায় প্রায় উঠে গিয়েছে।

যে সকল শকটে নিষিদ্ধ বামাল সরবরাহ করা হতো, সে শকটের চতুর্দ্দিক ঘিরে দুর্ব্বৃত্তদের বহু ট্যাক্সিও ছুটতো। এই ট্যাক্সিতে বে-লাইসেন্সী পিস্তল এবং ছোরা সহ বহু গুণ্ডা বসে থাকতো। প্রয়োজন মাত্র এরা তাদের কষ্টার্জ্জিত বহু মূল্যের দ্রব্য রক্ষার জন্য জীবনও তুচ্ছ করেছে। এই সম্বন্ধে বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার এক ঘটনার কথা উল্লেখ করবো। এই অপবাহকরা যে কিরূপ দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির তা নিম্নের বিবৃতি হ'তে বুঝা যাবে।

"কলিকাতা এবং আবগারী পুলিশ একত্রে এই দিন ঐ বাড়ীটী ঘেরোয়া করে ফেলে। এই অভিযাত্রী দলে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সময় তখন মধ্য রাত্রি হবে। বহুবার দ্বারে করাঘাত করা সত্ত্বেও কেহ উহা খুলে দিলে না। অথচ ভিতরে মানুষের দ্রুত চলা ফেরার শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি। আর দেরী করাও সম্ভব নয়। বুটের লাথির ঘায়ে আমরা বহু চেষ্টায় সদর দরজা ভেঙে ফেললাম। সম্মুখেই একটী লোহার সিঁড়ি ছিল। আমাদের কয়েকজন এই সিঁড়ির হাতল স্পর্শ করা মাত্র অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় মাটির উপর ছিটকে পড়লো। তাদের কাতর আর্ত্তনাদে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। পরে বুঝা গেল সিঁড়ির লৌহদণ্ড

বা হাতল উন্মুক্ত লৌহতার দিয়ে ইলেকট্রিক বক্সের সহিত সংযুক্ত। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। সহসা বারটী ডাল কুত্তা অলক্ষ্য নির্দ্দেশে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এইদিন আমাদের অনেকেই আহত হয়ে পড়ি। সকল বিপদ কাটিয়ে আমরা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আশানুযায়ী ফললাভ করি নি। এই ব্যাপারে বাড়ীর মালিক আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে যে বাহিরের চোরের ভয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা সে বাড়ী সুরক্ষিত করে রেখেছে। ঐ বাটীতে প্রবেশ করার পূর্ব্বে পুলিশ তাকে ডাক দিয়ে আসে নি। এইজন্য তার নাকি ধারণা হয়েছিল যে আমরা পুলিশ নই, চোর বা ডাকাত। এইজন্য আত্মরক্ষার্থে সে কুকুরগুলি ছেড়ে দিয়েছিল।"

জুয়াড়ীদের ন্যায় অপবাহকরাও পুলিশের অপেক্ষায় তাদের ডেরার আশে-পাশে বহু দূর পর্য্যন্ত গুপ্তচরদের মোতায়েন রাখে। এমন কি এদের অনেকে থানার গেটের নিকটও সাইকেল সহ অপেক্ষা করে। পুলিশের গতিবিধির উপর নজর রাখার ফন্দি ফিকির এদের অসামান্য। দ্রুত খবর পাওয়ার জন্য এদের ডেরায় টেলিফোনেরও ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া এদের প্রধান ডেরার সহিত দূরবর্ত্তী দোকান এবং উপ-ডেরার সহিত এদের ব্যক্তিগত সংবাদবাহী বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ থাকে। দূরে পুলিশ পরিলক্ষ্য হওয়া মাত্র চরেরা ঐ উপ-ডেরা হ'তে প্রধান ডেরায় বিপদসূচক বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন।

অপবাহকরা অপবহনের নিরাপত্তার কারণে বহুবিধ কলা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কেহ কেহ মোটরকারের সীটের তলায়, ইঞ্জিনে বা দেওয়ালে বহু গুপ্ত গহ্বর নির্ম্মাণ করেছে। চশমার খাপের তলায় কিংবা বাক্সাদির নিম্নে এজন্য এরা উপ-গহ্বর তৈরী করেছে। বহু ক্ষেত্রে বাঁশের অভ্যন্তরে অহিফেন রেখে—ঐ বাঁশের মুখে ত্রিশূল লাগিয়ে

সাধুর বেশে এরা দেশ হ'তে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। জুতার স্থকতলার তলেও আবগারী দ্রব্য রেখে এরা ঘোরাফিরা করেছে। চীনাগণ এই সকল কলা কৌশলে অতীব দক্ষ। এদের শিল্পজ্ঞান এমনি যে বোতাম টিপে ঘরের একদিককার দেওয়ালও এরা অপর দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। বহুদিন পূর্ব্বে এইরূপ এক চীনা রমণীকে একটি সুন্দর শিশু সহ জাহাজ হ'তে নামতে দেখা যায়। এই শিশুটি শিল্পকলার এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। মোম দিয়া ইহা তৈরী করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষ উহাকে ঐ স্ত্রীলোকের জীবন্ত সন্তানরূপে ভ্রম করে। শান্ত্রী দলের নিকট এই সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই গুপ্তচরের মারফৎ পৌঁছে না গেলে তারাও ঐ বস্ত্রাবৃত শিশুকে জীবন্ত শিশুরূপে ভ্রম করতো। শান্ত্রীদল স্ত্রীলোকটির নিকট হ'তে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলে সহযাত্রীরা ঐ স্ত্রীলোকটির পক্ষ সমর্থন করে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। পরে অবশ্য বুঝা যায় শিশুটি মোমের এবং উহার উদরে বহুমূল্যের কোকেন মজুত রয়েছে। সকলেই জানেন উটের বহু পাকস্থলী আছে। অপবাহকরা এই উটের পেট-চিরে আবগারী দ্রব্য রেখে উহা সিলাই করে দিয়েছে। পরে ঐ উট গন্তব্যস্থলে এলে উহাকে বধ করে আবগারী দ্রব্য বার করে নিয়েছে। কারণ উহা বার করবার সময় ঐ উট বধ না করে তাহা করা যায় না।

অহিফেন আদি আবগারী গাছ-গাছড়ার চাষ একমাত্র গভর্ণমেণ্টেরই অধিকারভুক্ত। সাধারণ লোকের পক্ষে উহা চাষ করা অপরাধ। অপবাহক দল নিরালা জায়গায় অন্যান্য শস্যের ভিতরে ভিতরে ঐ গাছের চাষ করেও লাভবান হয়েছে।

মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় সরকারের একচেটিয়া—উহা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, এবং উহার ক্রয়-বিক্রয়ও সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ইচ্ছামত যে

কোনও ব্যক্তি যে কোনও সময়ে যে কোনও পরিমাণে উহা লাভ করতে পারে না। বিশেষ দোকান হ'তে নির্দ্ধারিত সময়ে বিশেষ পরিমাণে উহা বিক্রয় করা হয়। কিন্তু যে নেশাখোর সে ইহা ইচ্ছামত যে কোনও সময় অপরিমিত পরিমাণে উহা সংগ্রহ করতে উন্মুখ। এই কারণে অপবাহকরা এই মাদক দ্রব্য গোপনে প্রস্তুত করে নিয়ে থাকে। গোপন ঘাঁটিতে এরা এই জন্য মদ চোলাই প্রভৃতি যন্ত্রাদি স্থাপন করেছে। এই সকল গোপন ঘাঁটিতে প্রধানতঃ ধান্য—চাউল হ'তে ধেনো মদ তৈরী হয়। ইহার প্রস্তুত পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি এবং নিদান সকল যাহা এই অপকার্য্য প্রমাণ করবার জন্য প্রয়োজন, অর্থাৎ যে গুলি তল্লাসীর সময় শান্তিরক্ষকদের আটক করা উচিত, সেই সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে অপরাধ তদন্ত শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করবো। এদেশে তাড়ী একপ্রকার মাদক দ্রব্য। উহা তাল গাছের রস হ'তে প্রস্তুত হয়। পল্লী অঞ্চলে প্রতিটী তাল গাছ এই জন্য সরকার বাহাদুর নম্বরী করে রেখেছেন, কিন্তু এতো সাবধানতা সত্ত্বেও এই তাড়ীর প্রচলন পল্লী অঞ্চলে সমধিক।

এদেশে বহুবিধ আবগারী দ্রব্যের মধ্যে মদ্য, অহিফেন, চণ্ডু, গাঁজা চরস এবং কোকেন প্রধান। মদ্য এবং তাড়ী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এই মদ চাটের সঙ্গে পাঞ্চ করে পান করা হয়ে থাকে। চণ্ডু অহিফেন হ'তে তৈরী করা হয় এবং ইহার ধূম পাইপের সাহায্যে পান করা হয়। অহিফেন বা অফিমের আভিধানিক অর্থ 'সর্পের বিষ বা গরল'। সুলেখক ডি কুইনসি, 'কুবলা খান', লেখক কবি কোজরিজ, অহিফেনসেবী ছিলেন। অনুরূপ বিষ নির্য্যাস পান করে কবি কীটসও নাইটেঙ্গল কবিতা লিখেছিলেন। এই একই কারণে ঋষি বঙ্কিম কমলাকান্তের মুখে অহিফেনের পাত্র তুলে ধরেছিলেন। পারসিক কবিগণও ইহার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ ছিলেন। এই অহিফেন হ'তে বহু

প্রয়োজনীয় আয়ুর্ব্বেদীয় এবং এলোপ্যাথি ঔষধও তৈয়ারী করা হয়েছে। অপর দিকে এই অহিফেনের সর্ব্বনাশী নেশা মানুষকে অমানুষ এবং অকেজোও করে তুলেছে। এই অহিফেন পোস্ত দানার ঢেঁড়ি হইতে উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে এই অহিফেন এদেশে যুক্ত প্রদেশের গাজীপুর অঞ্চলে উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত মধ্য ভারত, মালব, গোয়ালিয়র প্রদেশেও অহিফেন উদ্ভিদের সরকারী চাষ করা হয়ে থাকে। এই অহিফেন ব্যতীত সরকার নিয়ন্ত্রিত গাঁজার চাষও এই দেশে হয়ে থাকে। চরস গাঁজার আটা জাতীয় নিদান। ইহা মধ্য এসিয়ার ইরাকন্দ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। কোকেন এদেশে তৈরী হয় না, উহা বিদেশ হ'তে আমদানী করা হয়। ইহা 'কোকা' নামক গুল্মের পাতা হ'তে উৎপন্ন হয়। এই জন্য ইহার নাম কোকেন হইয়াছে। এই সাদা গুঁড়া পানের সহিত ভক্ষণ করা হয়ে থাকে। এই সর্ব্বনাশী নেশার অপকারিতা সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। পুরানো চোর এবং বেশ্যাগণের মধ্যে ইহার প্রচলন অত্যধিক। কোকেন ভক্ষণ করলে নাকি স্বর্গ সুখ অনুভূত হয়—কোকেন গ্রাহকরা বলেন একটি মাত্র পুরিয়া সেবন করার পর তাদের মনে হয় যে তারা সপ্তম স্বর্গে উঠে যাচ্ছে। চণ্ডুখোরেরা বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা রেখে চণ্ডুর পাইপ টানে—এই অবস্থায় তাদেরও না'কি মনে হয় ধাপে ধাপে সপ্তম স্বর্গে উঠে যাচ্ছে। মদ্য—পচানো-ভাত প্রভৃতি হ'তে মূল্যবান যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

এই সকল নেশা করার দ্রব্যের কোনটী এদেশে কোনটী বা বিদেশে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এমন কি এদেশে এবং বিদেশে প্রস্তুত একই মাদক দ্রব্যের দরের এবং গুণাগুণের তারতম্য থাকে। এই সকল আবগারী দ্রব্য মাত্রেই গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া অধিকার। এই ব্যবসা

দ্বারা সরকার বাহাদুর বহু অর্থ প্রতি বৎসর উপার্জ্জন করে থাকে। অপবাহক বা স্মাগ্‌লাররা এই ব্যবসায় গোপনে ভাগ বসিয়ে থাকে। পৃথিবীর বহুলোক একত্রে এই অপব্যবসায়ের জন্য বিভিন্ন দেশীয় নাবিকদের সাহায্যে দেশে বিদেশে এই নিষিদ্ধ দ্রব্য রপ্তানি এবং আমদানী করে থাকে। কলিকাতা শহরে তিন শ্রেণীর ব্যক্তি অপবাহক-রূপে কার্য্য করে থাকে, যথা—(১) পেশোয়ারী, (২) পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমান এবং (৩) চীন দেশীয় লোক।

বিদেশের সহিত রপ্তানী ও আমদানী জাহাজে করে এবং উহার স্বদেশীয় চলাচল পোষ্ট অফিস এবং রেলযোগে কৃত হয়ে থাকে। এই সকল অহিফেন আদি বহু ক্ষেত্রে পোষ্টাল এবং রেলওয়ে পার্শ্বেল করে এখানে ওখানে পাঠানো হায়ছে—ঐ সকল পার্শ্বেলে অন্য কোনও নির্দ্দোষ দ্রব্যাদি আছে এই কথা লিখে বা বলে। মধ্যে মধ্যে এই সকল পার্শ্বেল দৈবাৎ ভেঙ্গে গিয়ে ঐ সকল দ্রব্য বার হয়েও পড়েছে।

বে-আইনী ভাবে বা বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষা ও বিক্রয় বা বহনও এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। অপবাহকগণ এই সকল অবৈধ অস্ত্র-শস্ত্রের আমদানি এবং সঞ্চালন কার্য্যেও আত্মনিয়োগ করে থাকে। দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বস্ত্র, সূতা, চিনি, লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য সময়ে সময়ে সরকার বাহাদুর নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। এই সময় বিনা পারমিট বা ছাড়পত্রে এইগুলির ক্রয় বিক্রয় বা অধিকার নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে। অপবাহকগণ এই সুযোগে এই সকল দ্রব্যের চোরা কারবার সুরু করতে একটুও দেরী করে নি। এই দ্রব্যসমূহের নিয়ন্ত্রণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) মূল্য নিয়ন্ত্রণ, (২) অধিকার নিয়ন্ত্রণ এবং (৩) ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রন। এই সর্ব্ববিধ বাধা নিষেধ এবং নিয়ন্ত্রণের সুযোগ স্মাগ্‌লারগণ সকল সময়ই গ্রহণ করেছে।

অপরাধ—হত্যা বা খুন

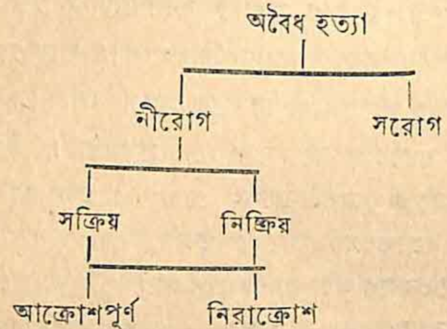
হত্যা বা খুন পৃথিবীর এক আদিমতম অপরাধ। আদিম কাল হ'তে আপন স্বার্থ-সিদ্ধি বা প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে মানুষ মানুষকে হত্যা করেছে। প্রবল কেবল মাত্র দুর্ব্বলকে হত্যা করে ক্ষান্ত হয় নি, তারা প্রবলতর হবার ইচ্ছায় প্রবলকেও তারা হত্যা করেছে। সভ্যতার সহিত মানুষ প্রকাশ্যে নর হত্যারূপ অপকার্য্য পরিহার করেছে। এক্ষণে ক্রোধে উন্মাদ না হলে তারা প্রকাশ্যে কাহাকেও খুন করে না। অধুনাকালে কাহারও পক্ষে প্রকাশ্যে খুন করা সম্ভবপরও হয় না। এর কারণ এজন্য রাজদ্বারে তাদের অভিযুক্ত হ'তে হয়েছে। রাষ্ট্রমাত্রই হত্যাকে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ মনে করে অপরাধীকে চরম শাস্তি প্রদান করে থাকে। বহু রাষ্ট্রে হত্যার শাস্তি হত্যা। অর্থাৎ ফাঁসী বা অন্য কোনও উপায়ে নিধন। মানুষ মাত্রেরই কাছে জীবন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এইজন্য হত্যার পর হত্যাকারীরও জীবনের আশঙ্কা থাকায় সহজে কেহ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হ'তে চায় না। এই জন্য সর্ব্ব দেশেই এই হত্যা অপরাধের সংখ্যা অত্যল্প।

হত্যা মূলতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—বৈধ এবং অবৈধ। যুদ্ধের কারণে বা রাষ্ট্রীয় আদেশে মানুষ মানুষকে হত্যা করলে ঐরূপ হত্যাকে বৈধ হত্যা বলা হয়। কিন্তু মানুষ রাষ্ট্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করে কোনও মানুষকে হত্যা করলে ঐরূপ হত্যাকে বলা হয় অবৈধ হত্যা। কারণ এইরূপ হত্যা অসামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিধির পরিপন্থী। প্রথমে অবৈধ অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

হত্যা অপরাধ কেবলমাত্র মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কোনও

পশু বা পক্ষীকে মানুষ হত্যা করলে উহাকে হত্যা বলা হয় না। যদিও ভারতীয় ধর্ম্মসমূহে জীব হত্যাকে মহাপাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম্মে পশুহত্যার মধ্যে গো-হত্যাকে অধিকতর অপরাধ বলা হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ দুগ্ধের উপকারিতার কারণে গো রক্ষার প্রয়োজন বিধায় গো হত্যাকে অপরাধের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল। কোনও কোনও হিন্দু রাষ্ট্রে গো হত্যাকে মনুষ্য হত্যার সমপর্য্যায় ভুক্তও করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র-বিধির সহিত ধর্ম্মীয় বিধির আজ আর কোনও সম্পর্ক নেই। এইজন্য জন্তু হত্যাকে অধুনাকালে হত্যা বলা হয় না। বহু প্রাচীন হিন্দু রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ হত্যাকে বলা হতো ব্রহ্মহত্যা। এইরূপ হত্যার জন্য দায়ী অপরাধীকে কোনও রূপেই রেহাই দেওয়া হয় নি। এর কারণ পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ তাদের ত্যাগ, সম, দান, চরিত্র, নির্লোভ এবং সমাজ-হিতৈষণার জন্য জনসাধারণ দ্বারা পূজিত হ'তেন। এইজন্য তাদের প্রিয় ব্রাহ্মণদের প্রতি তারা কোনরূপ অত্যাচার সহ্য করে নি, যদিও এই সময় ভারতের অধিকাংশ রাষ্ট্র অব্রাহ্মণ শাসকগণ দ্বারাই শাসিত হতো। বোধ হয় এই কারণে তৎকালীন রাষ্ট্রও তাদের বহুবিধ সুবিধা দান করেছিল। এই ব্রাহ্মণগণ জীবনভোর জ্ঞানের প্রদীপ নিয়ে এই পুণ্য ভূমিতে বিচরণ করেছে। এইজন্য তৎকালীন জনসাধারণ সুবিধা পাওয়া মাত্র ব্রাহ্মণ পরিবারসমূহকে আপন আপন গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের ধন্য মনে করেছে। জন-সাধারণের শিক্ষার ভার এই সময় রাষ্ট্রের উপর ছিল না। তৎকালীন রাষ্ট্রের উহা কোনও এক করণীয় কার্য্যও ছিল না। ব্রাহ্মণগণকেই এই মহাদেশের প্রতিটি গ্রামে জ্ঞানের আলোক বিতরণ করতে হতো। এইজন্য জনসাধারণ আপন হিতার্থে গো এবং ব্রাহ্মণকে রক্ষার জন্য বিশেষ আইনের প্রচলন করেছিল।

অবৈধ হত্যা দুই প্রকারে হয়ে থাকে, যথা,—নীরোগ এবং সরোগ অবস্থায়। এই নীরোগ হত্যাকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; যথা,—সক্রিয় হত্যা এবং নিষ্ক্রিয় হত্যা। শেষোক্ত দ্বিবিধ হত্যাকেও একই রূপে 'দুই ভাগে' বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা আক্রোশপূর্ণ এবং নিরাক্রোশী। নিম্নে তালিকা হ'তে বক্তব্য বিষয়টী বুঝা যাবে।



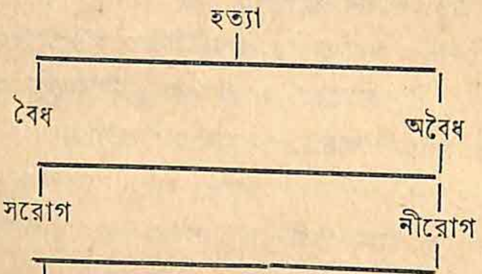
ভগ্নী, স্ত্রী প্রভৃতি প্রিয়জনের উপর অত্যাচার বা কলহের কারণে সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে মানুষ মানুষকে খুন করলে, উহাকে বলা হয় বিকৃত মস্তিষ্কপ্রসূত হত্যা। এইরূপ হত্যা অবৈধ হত্যা রূপে বিবেচিত হলেও রাষ্ট্র শাস্তিদানের সময় ইহাদের সম্পর্ক বিবেচনা করে থাকে। ইহা ছাড়া উন্মাদ অবস্থায় বা মানসিক রোগের কারণেও মানুষ মানুষকে হত্যা করেছে। এই সকল হত্যাকে বলা হয় সরোগ হত্যা। এইরূপ অপরাধ সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মানুষ যখন সুস্থ অবস্থায় আপন স্বার্থসিদ্ধি বা প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে মানুষকে হত্যা করে, তখন ঐরূপ হত্যাকে বলা হয় নীরোগ বা প্রকৃত হত্যা। এই স্থলে অবৈধ হত্যা বলতে আমরা এই নীরোগ

হত্যা সম্বন্ধেই বুঝবো। এই বিশেষ অবৈধ হত্যা দুই প্রকারে হয়ে থাকে, যথা—(১) নিরাক্রোশ এবং (২) আক্রোশপূর্ণ। প্রথমে আক্রোশজনিত খুনের কথা বলা যাক। মানুষ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মানুষকে খুন করলে ঐরূপ হত্যাকে আমরা বলি আক্রোশজনিত খুন বা 'মার্ডার ফর্ গ্রাজ্'। কেহ কাহাকেও অপমান করলে বা কেহ কাহারও সহিত কলহে লিপ্ত হ'লে বা কেহ কাহারও বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিলে, কিংবা কেহ কাহারও স্ত্রীর সহিত গোপনে উপগত হ'লে কিংবা কেহ কাহারও বিরুদ্ধাচরণ বা ক্ষতি করলে বা তা করবার উপক্রম করলে, ঐ ব্যক্তিকে স্বকীয় প্রচেষ্টায় বা লোক মারফৎ গোপনে বা প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছে। কোনও কোনও প্রদেশে এই আক্রোশজনিত খুন পুরুষানুক্রমে সংঘটিত হয়ে এসেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কথা বলা যেতে পারে। এই প্রদেশে কেহ কোনও আততায়ীর দ্বারা নিহত হ'লে, নিহত ব্যক্তির পুত্র বা পরিজন ঐ আততায়ীর পুত্র বা পরিজনকে হত্যা করে পিতৃপুরুষের ঋণশোধ দিয়েছে। বহুস্থলে বংশপরম্পরায় এইরূপ হত্যা-কাণ্ড দুই বিরোধী বংশের সন্তানগণ দ্বারা সাধিত হয়ে এসেছে। পিতৃপুরুষের দুষ্কৃতির বোঝা এরা আজও পর্য্যন্ত আপন আপন প্রাণের বিনিময়েও বহন করে আসছে।

আক্রোশজনিত খুনের কথা বলা হলো। এইবার নিরাক্রোশ খুনের কথা বলা যাক্। নিরাক্রোশ খুন প্রায়শঃ ক্ষেত্রে সুস্থমনা অপরাধীদের দ্বারা কৃত হয়েছে। এইরূপ খুনকে ইংরাজীতে বলা হয় 'মার্ডার ফর গেইন্'। অর্থ প্রাপ্তির কারণে মানুষ মানুষকে খুন করলে ঐরূপ হত্যাকে বলা হয় নিরাক্রোশ খুন। ডাকাতি বা রাহাজানি করবার সময় বা চৌর্য্য কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হ'লে অপরাধীগণ এইরূপ হত্যা প্রায়ই সমাধা করেছে। এমন

অনেক অপরাধীদল আছে যারা অর্থাপহরণের সুবিধার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই দ্রব্যাদি বা অর্থের বাহক বা ধারকদের হত্যা করেছে। অন্যান্য অপরাধী দল এইরূপ ক্ষেত্রে অর্থাপহরণের সময় বাধা না পেলে কদাচ হত্যা কার্য্যে লিপ্ত হয় নি। এইরূপ বিবিধ কার্য্যকরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পুস্তকের প্রথম খণ্ডে করা হয়েছে। সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়, শোণিতাত্বক, সাম্পত্তিক প্রভৃতি শব্দের সংজ্ঞা দেখুন। এই স্থানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নিরাক্রোশ খুনের ব্যাপারে কোনও রূপ ব্যক্তিগত আক্রোশের প্রশ্ন থাকে না। এই ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিদের একমাত্র অপরাধ থাকে অর্থ বা দ্রব্য ত্যাগের অনিচ্ছা বা ঐ সকল অর্থ বা দ্রব্যের মালিক হওয়া। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে আততায়ীদের সহিত নিহত ব্যক্তিদের পূর্ব্বপরিচয়ও থাকে নি।



এই বিবিধ হত্যা ব্যতীত আরও বহু প্রকারের হত্যার কথা শুনা গিয়েছে। উহাদের যথাক্রমে রাজনৈতিক, যৌনজ এবং সামাজিক বা ধর্ম্মীয় খুন বলা যেতে পারে। এই সকল-প্রকার খুনই দুই প্রকারে সমাধিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ কেহ খুন করে সক্রিয়ভাবে, কেহ বা তা করে নিষ্ক্রিয়ভাবে।

বিষ-প্রয়োগ প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ রূপ খুন যাহা নিহত ব্যক্তির অজ্ঞাতে বিনা আঘাতে সংঘটিত হয়ে থাকে কিংবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে সকল হত্যা সাধিত হয়, সেই সকল খুনকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় খুন। অপর দিকে যে সকল খুন অস্ত্রাঘাত দ্বারা প্রত্যক্ষ রূপে সংঘটিত হয়, উহাদের বলা হয় সক্রিয় খুন।

এক্ষণে এই সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়—অবৈধ হত্যাকার্য্যের অন্তর্গত এই উভয়বিধ হত্যা বা খুনকে আমরা নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করতে পারি। এই সকল বিভাগীয় খুনই নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় উপায়ে সাধিত হয় বা হ'তে পারে। উপরন্তু এই প্রতিটী হত্যা যৌনজ বা অযৌনজ—এই উভয় কারণে সংঘটিত হয় বা হ'তে পারে।

অবৈধ হত্যা

রাজনৈতিক | ধর্ম্মীয় বা সামাজিক | আক্রোশ | নিরাক্রোশ | যৌনজ

অপরাধ—রাজনৈতিক হত্যা

রাজনৈতিক হত্যা নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় এই উভয় উপায়ে সংঘটিত হয়েছে। পৃথিবীতে রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার দিন হ'তে আজও পর্য্যন্ত এইরূপ হানাহানির বিরাম নেই। সাধারণতঃ গুপ্ত হত্যার দ্বারা রাজ্যের কর্ণধার-দের নিহত করা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে রাজার বা রাজ্যের কর্ণধারদের বিশ্বস্ত অনুচরগণ দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে নৃপতি-গণের বিশ্বস্ত অনুচরগণকে প্রভূত উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করে এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। গুপ্ত ঘাতকদের উদ্যত খড়্গ হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য নৃপতিগণ পূর্ব্বকালে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতেন।

রাজার আত্মীয়বর্গ বা ভ্রাতাগণের মধ্যে যাঁরা উত্তরাধিকারী সূত্রে রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসন পেতে পারতেন, তাঁরাই অধিক ক্ষেত্রে এই সকল হত্যা কার্য্যের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। এ ছাড়া রাজ্যের রাজার স্বাভাবিক মৃত্যুর পরও সিংহাসন প্রাপ্তির আশায় উত্তরাধিকারিদের মধ্যে হানাহানির অন্ত ছিল না। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিগণকেই সর্ব্বপ্রথমে নিহত হ'তে হয়েছে। এইরূপ হত্যাকাণ্ড প্রকৃতিপুঞ্জের অগোচরে গোপনে সাধিত না হলে প্রজা-বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকতো, এইজন্য অধিক ক্ষেত্রে বিষ-প্রযোগ দ্বারা এই সকল হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে।

এই সকল কারণে নৃপতিগণ পূর্ব্বকালে বহু প্রকারের পশু-পক্ষী প্রাসাদে রক্ষা করতেন। এই সকল পশু-পক্ষীকে আহার্য্য বস্তু প্রথমে প্রদান করে উহাদের উপর ঐ আহার্য্যের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষ্য করে তবে তাঁরা উহা গ্রহণ করেছেন। এই সকল কারণে আপন খুল্লতাতের হস্ত হ'তেও রাজমাতা বা রাজরাণীগণ সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী শিশু সন্তানদের আহার্য্য গ্রহণ করা আজও পর্য্যন্ত পছন্দ করেন না।

পারিবারিক ষড়যন্ত্র ব্যতীত রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রেরও অন্ত ছিল না। আপন পারিষদ, মন্ত্রী, সামন্ত এবং সেনাপতিদেরও এঁরা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করতে পারেন নি। এই আন্তঃষড়যন্ত্র ব্যতীত বহিঃষড়যন্ত্র দ্বারাও নৃপতিগণ নিহত হয়েছেন। পুরাকালে পরাক্রমশালী নৃপতিগণকে অসৎ উপায়ে নিহত করবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের নৃপতিগণ বহুবিধ উপায় অবলম্বন করতেন। এই সকল উপায়ের অন্যতম উপায় ছিল বিষকন্যা প্রদান। উপহার বা যৌতুক রূপে এই সকল সুন্দরী বিষকন্যাকে প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিগণের নিকট প্রেরণ করা হতো। এই বিষকন্যার স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, শৈশব কাল হ'তে এই সকল

কন্যাকে অল্প অল্প করে বিষ পরিপাক করতে অভ্যাস করানো হতো। এই সব কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত এই বিষের মাত্রা বা হারও বর্দ্ধিত করা হতো। পরিশেষে এই সকল কন্যার ঘর্ম্ম এবং নিশ্বাসও বিষময় হয়ে উঠতো। কিছু দিন এদের সংস্পর্শে থাকলে মানুষ মাত্রকেই ধীরে ধীরে পীড়িত হয়ে প্রাণত্যাগ করতে হতো। এই সকল নারীরা বিষময় হয়ে উঠায় নিজেরা বিষ পান করলেও মৃত্যুমুখে পতিত হতো না। এই কারণে বিষ-মিশ্রিত সুধা পাত্র হ'তে কিছুটা বিষ নিজেরা গলাধঃকরণ করে বাকিটুকু প্রেমাস্পদ নৃপতিকে পান করতে দিলে ঐ সকল নৃপতিগণ নিঃসঙ্কোচে তা পান করে মৃত্যু বরণ করে নিয়েছেন।

বিষকন্যা সৃষ্টির মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য কতটুকু আছে, তা বলা বড় শক্ত। কেহ কেহ বলেন, অভিনয় দ্বারা বশীভূত করে বিষপ্রদানে নিপুণা কন্যাগণকেই বিষকন্যা বলা হতো। অধুনা যুগে এমন বহু ব্যক্তি দেখা গিয়েছে, যারা ধীরে ধীরে মাত্রা বর্দ্ধিত করে বহুল পরিমাণ অহিফেন সেবন করতে সক্ষম। সাধারণ মানুষ ঐ অহিফেনের দশভাগের এক ভাগ গ্রহণ করলেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে। এইরূপ অহিফেন বিলাসী ব্যক্তিদের সর্প দংশন করলে ঐ সর্প মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে কিন্তু অহিফেনসেবী ব্যক্তির উপর সর্প-বিষের সামান্য মাত্র ক্রিয়াও দর্শায় না। বহু হাকিমী চিকিৎসক আছেন, যাঁরা মোরগসমূহকে ধীরে ধীরে অধিক পরিমাণ আরসিনিক আহারে অভ্যস্ত করান। এইরূপ আরসিনিক বিষ আহারে অভ্যস্ত মোরগের মাংস রন্ধন করে আহার করিয়ে এঁরা বহু বৃদ্ধেরও যৌবন শক্তি ফিরিয়ে এনেছেন। অবশ্য এই প্রথার বৈজ্ঞানিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

পুরাকালে সমর অভিযানের সময় বা দিগ্বিজয়ে যাত্রাকালে রাজ-চক্রবর্ত্তীগণ বীজাণু বিশারদ জ্ঞানী বৈদ্যদের সঙ্গে নিতেন। এঁরা পানীয়

জলের পুষ্করিণীসমূহ পরীক্ষা করে মতামত প্রকাশ করার পরে ঐ পুকুরের পানীয় জল সৈন্যগণকে পান করতে দেওয়া হতো। এই-ভাবে এদেশে রাজকীয় পোষকতায় আয়ুর্ব্বেদীয় বীজাণু বিজ্ঞানের প্রসারলাভ হয়েছিল। পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের বহু পুরাতন শ্লোকে এইরূপ ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বিপক্ষ পক্ষীয় চরগণ সৈন্যবাহিনীর গমন পথের বহু পুষ্করিণীতে রোগ বীজাণুসমূহ নিক্ষেপ করতো যাতে ঐ পানীয় পান করে তারা রোগাক্রান্ত হয়ে সহজে নির্ম্মূল হ'তে পারে।

বর্ত্তমানকালে স্বৈরতন্ত্র বা রাজতন্ত্র বহু দেশ হ'তে লুপ্ত হয়েছে। আজিকার এই গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের যুগে সিংহাসন অধিকারের প্রশ্ন উঠে না। এইখানে আজ প্রশ্ন উঠে থাকে ক্ষমতা অধিকারের। এইজন্য এই যুগে রাজনৈতিক কারণে শাসকদের এবং রাজকর্ম্মচারীদের হত্যা করা হ'লেও ঐ সকল ব্যক্তিদের পুত্র পরিজনদের কোনও ক্ষতি করা হয় না। কিন্তু যে সকল দেশে বংশগত শাসনব্যবস্থার প্রচলন আছে সেই সকল দেশে শাসকদের উত্তরাধিকারীদের আজও হত্যা করা হয়ে থাকে।

রাজকর্ম্মচারী এবং শাসকদের অধিকক্ষেত্রে কর্ত্তব্যরত অবস্থায় বা পথে-ঘাটে যাতায়াতের রাস্তায় হত্যা করা হয়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দর্শনপ্রার্থিগণ দ্বারাও হত্যা কার্য্য সমাধা হয়েছে। এই যুগে দর্শনপ্রার্থী মাত্রকেই বিরূপ করা সম্ভব নয়। এতদ্বারা শাসকদের জন-প্রিয়তাক্ষুণ্ণ হ'তে পারে। আজিকার এই গণতন্ত্রের যুগে শাসকদের গৃহদ্বার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি কখন কোন উদ্দেশ্যে দর্শনপ্রার্থী হবে তা বলা বড় শক্ত। এইজন্য পৃথিবীর ক্ষমতাশালী অধিনায়কগণ নিজেদের আকৃতির অনুরূপ এক ব্যক্তিকে দোনাখেল বা ডুপ্লিকেট রূপে নিয়োগ করে থাকেন। অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তিদের প্রথমে এই সকল নকল অধিনায়কদের নিকট আনয়ন করা

হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনবোধে প্রকৃত অধিনায়কের নিকট তাদের পেশ করা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে আত্ম-রক্ষার্থে সেক্রেটারীকে মনিব এবং মনিবকে ভৃত্যরূপেও প্রচার করা হয়েছে।

রাজনৈতিক মতবাদের বা আদর্শের এবং নীতিগত পার্থক্যের কারণেও বহু হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়ে থাকে। এমন বহু রাজনৈতিক দল আছে যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। তারা হত্যা কার্য্যাদি দ্বারা ত্রাসের সৃষ্টি করে শাসনযন্ত্র অধিকার করতে প্রয়াস পেয়ে থাকে ।

রাজনৈতিক কারণে অধুনাকালে পিস্তল এবং বোমার সহযোগেই হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে "রাজনৈতিক অপরাধ" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বলা হ'লো। এইবার ধর্ম্মীয় বা সামাজিক হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বলা যাউক।

ধর্ম্মের কারণে বহু হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে। সাধারণতঃ মহিষ, ছাগ প্রভৃতি জীবকে শাক্তধর্ম্মাবলম্বীরা দেবীর পাদপীঠে বলি দিয়ে থাকে কিন্তু ছাগবলির ন্যায় নর-বলির কথাও শুনা গিয়েছে। ধর্ম্মসমূহের ভুল ব্যাখ্যাই ইহার কারণ। পুরাকালে প্রচলিত নর-বলি ইহার প্রকৃত উদাহরণ। কাপালিক নামক সাধকগণ বলির উদ্দেশ্যে মানুষকে ছলে-বলে ভুলিয়ে দেবীর পাদপীটে এনে উহাদের খড়্গের সাহায্যে বলি দিত। গহন অরণ্যসমূহে গভীর নিশীথে এইরূপ বহু হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে।

কোনও কোনও অজ্ঞ মানুষকে বুঝানো হতো যে তাকে বলি দিলে তার স্বর্গ প্রাপ্তি হবে। এই অলীক ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বহু অজ্ঞ মানুষ স্বেচ্ছায় বলির যূপকাষ্ঠে নিজের গলা গলিয়ে দিয়েছে। প্রাচীনকালে কোনও কোনও উন্মাদ সাধক আপন শিশুপুত্রকেও ধর্ম্মের কারণে দেবীর

পাদপীঠে বলি দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। এইরূপ বলিদান হত্যার নামান্তর মাত্র।

ধর্ম্মের নামে নরহত্যা এদেশে নূতন নয়। বিধর্ম্মীদের হত্যা করার রীতি সকল দেশেই ছিল। সাধারণত মানুষ আপন ধর্ম্মকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। এই কারণে কেহ তাদের ধর্ম্ম বিনষ্ট করতে চাইলে তারা তাদের বিনষ্ট করতে ইতস্ততঃ করে নি। তবে অন্য কোনও ধর্ম্মীয় ব্যক্তিগণ এইরূপ অন্যায় এবং কু-ইচ্ছা প্রকাশ না করলে তারা তাদের ভালবেসেছে। শুধু তাই নয় তাদের ধর্ম্মের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীলও থেকেছে। এই অবস্থায় ধর্ম্মীয় হত্যাকাণ্ড উভয় পক্ষের ব্যক্তিগণ দ্বারাই সাধিত হয়ে থাকে। কোনও দেশে বা প্রদেশে এইরূপ হত্যাকাণ্ড প্রশ্রয় পেলে সেই দেশকে অভিশপ্ত দেশ বলা চলে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নির্ব্বিরোধী জাতিসমূহ এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ঐ সকল জাতিকে বহুদিন পর্য্যন্ত পদানত রাখতে সক্ষম।

মধ্যযুগে বাংলা দেশে শিশু-মানত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই শিশু-মানত শিশু-বিসর্জ্জনের নামান্তর মাত্র। ঐ সময়ে বহু মাতা কুসংস্কারের কারণে সাগর-সঙ্গমে আপন শিশুদের স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়েছে। বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলা যাক। কোনও কোনও বন্ধ্যা বা নিঃসন্তান স্ত্রীগণ ঈশ্বরের নিকট মানত করতেন যে তারা সন্তান প্রসবে সক্ষম হলে তাদের উদর জাত প্রথম সন্তানটীকে সাগর-সঙ্গমে বিসর্জ্জন দেবেন। অপুত্রক মাতাদের ধারণা ছিল এই যে একটি সন্তানের বিনিময়ে তারা বহু সন্তানের জননী হ'তে পারবেন। বলা বাহুল্য, ইহা একান্তরূপ কুসংস্কার মাত্র। সৌভাগ্যের বিষয় এই প্রথায় বাঙ্গালী মাত্রেই বিশ্বাসী ছিল না। ইহার ব্যাপকতাও খুব বেশী ছিল না। মাত্র কয়েকটি পরিবারের মধ্যে এই বিশ্বাস সীমাবদ্ধ ছিল। তৎকালীন শাসনকর্ত্তা লর্ড বেন্টিক এবং বাঙ্গালী সমাজ সেবীদের চেষ্টায় এই প্রথা এদেশ হ'তে লুপ্ত হয়েছে।

[মধ্যযুগে আফ্রিকার কোনও কোনও প্রদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে নর-মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হতো। গণ্ডগ্রামসমূহের বাজারে এই সময়



মনুষ্য মাংসের দোকান,'আনজিকিউস্ আননো, ১৫৯৮-১৮৬৩ সালে শেষ প্রকাশিত থমাস হেনরী হাকস্‌লে প্রণীত 'ম্যানস্ প্লেস ইন্ নেচার' হইতে।

বহু নরমাংস বিক্রয়ের দোকান দেখা গিয়েছে। সাধারণতঃ যুদ্ধবন্দীদের, অপরাধীদের এবং শত্রুপক্ষীয়দের নিহত করে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত করা হয়েছে। কখনও কখনও রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ বহু প্রজাও রাজার খাদ্যরূপে নিজেদের দেহ উৎসর্গ করেছে। উপরে ঐরূপ একটি দোকানের প্রতিকৃতি উদ্ধৃত করা হলো। যদি বুঝা যেতো যে ক্রীতদাসগণকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হবে না তাহ'লে তাদের মাংস খাদ্যের জন্য বিক্রয় করা হতো।]

ধর্ম্মীয় হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার সামাজিক হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বলা যাক। সামাজিক হত্যা মাত্রই কুসংস্কার জাত হয়ে থাকে। পূর্ব্বকালে পাঞ্জাব প্রদেশের কোনও কোনও পরিবারে কন্যাসন্তানকে জন্মের পরমুহূর্ত্তেই হত্যা করা হতো। এই কন্যাগণের পিতাদের কেহ 'শ্বশুরা' বলে সম্বোধন করবে তা তারা পছন্দ করতেন না। এই অহমিকার কারণে তারা তাদের ঔরসজাত কন্যাদের জন্মের পরই হত্যা করে ফেলতো। লর্ড বেণ্টিক আইন প্রণয়ন করে এই কুপ্রথা ঐ প্রদেশ হ'তে তিরোহিত করেছিলেন।

পুরাকালে এমন বহু অজ্ঞ গণৎকার ছিল যারা কোনও কোনও শিশু পরবর্ত্তীকালে রাজ্যের, পিতার, পরিবারের, দেশের বা দশের এবং ধনসম্পত্তির ধ্বংসের কারণ হবে—অবিবেচকের ন্যায় এইরূপ অভিমত গণনার দ্বারা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত ছিল। এইরূপ অলীক গণনার ফলাফলে বিশ্বাসী সংস্কারাচ্ছন্ন কোনও কোনও মানুষ ভবিষ্যৎ আপদ হ'তে উদ্ধার পাবার জন্য এই সকল নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করে নি।

বহুক্ষেত্রে এই সকল শিশুকে মাতা বা অন্য কোনও এক শুভাকাঙ্ক্ষী গণনার ফলাফল ঘোষণার পর গোপনে কোনও এক নিরাপদ স্থানে

সরিয়ে দিয়েছে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর এই শিশুকে তাদের সম্ভাব্য বিপদ হ'তে সাবধান করে দেওয়া হতো। সম্ভাব্য শত্রু সম্বন্ধে আশৈশব বাক্-প্রয়োগ তাকে প্রকৃতই ঐ ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করে তুলতো। বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঐ সকল শিশু বহু ক্ষেত্রে তাদের শত্রুদের নিধন করে প্রমাণ করেও দিয়েছে যে ঐ গণৎকার ঠিকই বলেছিলেন।

বহু অজ্ঞ শাশুড়ী বা মাতা আছে যারা পুত্র বা জামাতাকে বশে রাখবার জন্য ঔষধাদি গোপনে তাদের সেবন করিয়ে থাকেন। ঔষধের প্রকৃত গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকায় তারা তাদের প্রিয় পুত্র বা জামাতাকে হত্যা বা পাগল করেছেন। সামাজিক কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার জন্য ইহা সম্ভব হয়ে থাকে।

কাউকে হত্যা করার ইচ্ছাকে হত্যারূপে ধরা হয় না। কিন্তু তা সত্বেও এই ইচ্ছার উপর হত্যার স্বরূপ নির্ভর করে। এছাড়া প্রবল ইচ্ছা মনস্তাত্বিক কারণে নিজেকে হত্যা করতেও সক্ষম। এইজন্য এই ইচ্ছাগত হত্যা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। নিহত ব্যক্তিরা সংস্কার জাত বিশ্বাসের কারণে নিহত হয়ে থাকে। কিরূপ ভাবে উহা সম্ভব সেই সম্বন্ধে এইবার আমি আলোচনা করবো।

এদেশে বহুলোক তুক্ করা বা বাণ মারা প্রভৃতি অলীক কার্য্যকরণ এবং মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করে। এই সকল তুক্তাক্ কারুর উপর প্রযুক্ত হয়েছে জ্ঞাত হ'লে ঐ অজ্ঞ লোক ভয়ে এমনিই আধমরা হয়ে যায়। আতঙ্কে এবং ভাবনায় বা পুনঃ পুনঃ চিন্তার কারণে কাহিল হয়ে পড়ায় যে কোনও এক রোগ তার মধ্যে এসে গিয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে ঐ রোগের বীজাণু তার মধ্যে পূর্ব্ব হ'তে এসে গিয়েছে, কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে সে উহা প্রতিরোধ করে নিরাময় থাকতে পারতো। কিন্তু কোনও অবিশ্বাস বা বিশ্বাস মানুষের মনে আতঙ্ক এনে তার

প্রতিরোধ শক্তি বিনষ্ট করে দিয়েছে। এই একই কারণে কোনও ব্যক্তির দুরারোগ্য ব্যাধি হ'লে আত্মীয়-স্বজনরা বিশ্বাস করতো যে অলৌকিক ভাবে ঐ রোগ অপরের দেহে সংযুক্ত করে তাকে নিরাময় করা সম্ভব। এই কারণে এরূপ এক ব্যক্তির স্ত্রী প্রথামত উলঙ্গ অবস্থায় মাথায় ধুনোর মালসা নিয়ে গভীর রাত্রে প্রতিটী গৃহের দুয়ারে এসে ঐ সকল বাড়ীর (তাঁর স্বামীর সমবয়সী) যুবকদের নাম ধরে হাঁক দিয়ে যেতেন। একটী বাড়ীর এক যুবক হয়তো ঘুমের ঘোরে উত্তরও দিয়ে বসলো, 'কে বা কি ?' ব্যাস্, অমনই এ নারীর উদ্দেশ্য যেন সফল হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ চলন্ত মালসায় ধূনা নিক্ষেপ করে ত্বরিত গতিতে বাড়ী ফিরে উহা পীড়িত স্বামীর মাথার শিয়রে রেখে দিলেন। ঘটনাটী ঐ রাত্রেই তাঁর স্বামী অবগত হ'তেন এবং বিশ্বাসের কারণে তার মনোবল শত গুণ বর্দ্ধিত হতো এবং তৎজনিত তাঁর অন্তর্নিহিত প্রতিরোধ শক্তিও বৃদ্ধি হতো। এইভাবে প্রতিরোধ শক্তির বর্দ্ধন এবং ঔষধাদির গুণাগুণ একত্রে তাকে অচিরেই নিরাময় করে দিতে পেরেছে। অপর দিকে নিশির ডাকে বিশ্বাসী যে ব্যক্তি ঐ ডাকে সাড়া দিয়েছে সে এই বিষয় অবগত হলে পূর্ব্ব হতে তার দেহে প্রবিষ্ট অপরিস্ফুট কোনও রোগের তার প্রতিরোধ শক্তির অভাবে পরিস্ফুট হয়ে তাকে অচিরে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে। প্রতিদিন বহু রোগের বীজাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং প্রতিদিনই অন্তর্নিহিত প্রতিরোধ শক্তি দ্বারা আমরা উহাদের বিনষ্ট করি। কিন্তু অলীক বিশ্বাস দ্বারা প্রতিরোধ শক্তির নির্ম্মূল করে আমরা উহাদের যে কোনও একটী রোগ দ্বারা আক্রান্ত হলেও হতে পারি। বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এই সকল আতঙ্কগ্রস্তের উপর কার্য্যকরী হয়। এই কারণে প্রতিরোধ শক্তির অভাবে এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা ঘটা সম্ভব হয়েছে। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বক্তব্য বিষয়টী বুঝা যাবে।

"আমরা স্বকীয় জীবনে এইরূপ বহু অলৌকিক ঘটনা পরিলক্ষ্য করেছি। পূর্ব্বকালে পল্লী অঞ্চলে 'নিশির ডাক' নামে এক অন্ধপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কোনও ব্যক্তি এইসব ঘটনায় বিশ্বাসী হ'লে এবং পরদিন এই ব্যাপার জ্ঞাত হ'লে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠতো। আতঙ্ক এবং বিশ্বাস তার প্রতিরোধ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে পূর্ব্ব হ'তে কিংবা ঐ ঘটনার পরে তাহার দেহে প্রবিষ্ট রোগ বীজাণুকে ধ্বংস করতে অক্ষম হতো। এইভাবে ভাবনায় ভাবনায় অতিষ্ঠ হয়ে কোনও এক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং উহার কাছে পরাজয় স্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।"

এই নিশির ডাক ছাড়া 'বাণ মারা' এবং 'তুক্ তাক্' পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বক্তব্য বিষয়টী বুঝা যাবে।

"আমি এই দিন আপন মনে রাত্রে পথ চলছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি অর্দ্ধদগ্ধ কুশপুত্তলিকা আমার সম্মুখে ফেলে দিয়ে সরে পড়লো। আমি বুঝলাম যে এ সকল আমার শত্রু পক্ষের কার্য্য। কিন্তু আমি এই সকল তুক্-তাকে বিশ্বাসী ছিলাম না। আমি নির্ভয়ে ঐ পুত্তলিকা ডিঙিয়ে বাড়ীর পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। গন্ধক মিশ্রিত দগ্ধ পুত্তলিকার উগ্র আঘ্রাণ আমার নাসিকাতে প্রবেশ করেছিল। বাটী ফেরার পর আমার দেহটা ঝিম ঝিম করতে সুরু করলো এবং আমি অত্যন্ত ভীত এবং অসুস্থ হয়ে উঠলাম। আমি এইদিন বুঝলাম সংস্কারগত বিশ্বাস আমি বর্জ্জন করতে তখনও পারিনি। আশৈশব যা আমি শুনে এসেছি তা সংস্কারে পরিণত হয়ে আমার অবচেতন মনে আশ্রয় নিয়েছে। আমার চেতন মন ঐ সকল আজগুবীতে বিশ্বাসী না হলেও আমার অবচেতন মন উহাতে বিশ্বাস করে।"

অনেকে বলেন যে বাণ মারা সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। মন্ত্রপূত

ধূলা নিক্ষেপ করে এই বাণ মারা হয়ে থাকে। বাণাহত (victim) মন্ত্রেতন্ত্রে বিশ্বাসী হ'লে উহা তার উপর কথঞ্চিৎ কার্য্যকরী হওয়া অসম্ভব নয়। তবে সচরাচর পথে-ঘাটে বেদীয়া দল কর্ত্তৃক বাণ মারার যে অভিনয় দেখি, তা অলীক মাত্র। একজন মন্ত্রপূত ধূলা ছুঁড়ে এবং অপর জনের মুখ হ'তে গল গল করে রক্ত পড়ে বা তার মুখের বাঁশী গলায় আটকে যায়। এই সকল ঘটনাগুলি অবশ্য দুষ্ট লোকদের মিথ্যা অভিনয় ছাড়া অপর আর কিছুই নয়।

বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের শক্তি সম্বন্ধে য়ুরোপে বহু পরীক্ষা হয়েছে। কোনও এক য়ুরোপীয় আদালত দুই ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। কোনও এক ফরাসী পণ্ডিত এই সময় মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হ'তে এই দুই ব্যক্তিকে চেয়ে নেন। এদের একজনকে খড়িমাটি গুঁড়া মিশ্রিত এক কাপ জল প্রদান করে বলা হয়, তুমি এখন গিলটিনে খণ্ডিত হয়ে মরতে চাও, না এই উগ্র বিষ পান করে তুমি শান্তিতে মরবে ? অপরাধীটী এই শেষোক্ত পন্থাটিই বেছে নিয়ে উহা বিষজ্ঞানে গলাধঃকরণ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বিশ্বাসের কারণে হার্টফেল করে লোকটা মারা গিয়েছিল। সম্ভবতঃ উহা পান করার পর ভয় ও বিশ্বাস তার স্নায়ুর শক্তি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করে দিয়েছিল। আমার মতে দুর্ব্বলচিত্ত ও হৃদপিণ্ডের রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপরই মাত্র এইরূপ পরীক্ষা কার্য্যকরী হ'তে পারে। তবে এই সকল বিষয় সত্যরূপে বিশ্বাস করতে হ'লে ঐগুলির শতকরা কত ভাগ সত্য হয় তা'ও অবগত হওয়া দরকার। এই সম্বন্ধে আমি অপর একটী ঘটনা উল্লেখ করবো।

"কোনও এক গ্রাম্য ব্যক্তি পুকুরের মাছ ধরা পোলোর মধ্যে হাত সেঁধিয়ে দেয়। তার উদ্দেশ্য ছিল পোলোর জলে মাছ পড়েছে কি'না

তা জানা। কিন্তু হঠাৎ তার হাতে দারুণ যন্ত্রণা হওয়ায় সে ঐ স্থান ত্যাগ করে। তার বিশ্বাস হয়েছিল যে সিঙি মাছে তাকে হেনে নিয়েছে। এর পর সে খাওয়া-দাওয়া করে সহরের আফিসে কাজ করতে চলে যায়। সন্ধ্যার পর যন্ত্রণাহত অবস্থায় বাড়ী ফিরে সে শুনতে পেলো যে তার মা চিৎকার করে বলছেন, 'ওরে কেমন আছিস তুই রে? ওর মধ্যে সিঙি-মাছ ছিল না। যেখানে ছিল এক কাল সাপ। ঐ দেখ ঐখানে মারা হয়েছে।' তার মার এই কথা শুনে লোকটী কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে অচিরে মারা যায়। এই ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ তার বিশ্বাস এবং তৎজনিত অর্জ্জিত প্রতিরোধ শক্তি বিষের ক্রিয়া মন্থর করে রেখেছিল। এজন্যই ভদ্রলোক এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিনা চিকিৎসাতেও সুস্থ ছিলেন।"

তবে এই সকলের মধ্যে আদপেই কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে কি'না তা'ও বিবেচ্য। কার্য্যকরণ বা রোগের বীজ পূর্ব্ব হ'তেই জীবদেহে নিহিত থাকে। বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস তৎজনিত প্রতিরোধ শক্তির আবির্ভাব বা অন্তর্ধান উহাকে অঙ্কুরিত কিংবা সুপ্ত করে মাত্র। সামাজিক বা বৈজ্ঞানিক হত্যার প্রকৃত ব্যাখ্যা এইরূপে করা যেতে পারে। এই সম্বন্ধে অপর একটী ঘটনার বিষয় আমি উল্লেখ করবো। নিম্নের বিবৃতিটী হ'তে বিষয়টী সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি কলেজের ছুটীর পর বাড়ী ফিরে পল্লীর অমুক বাবুর বাটী বেড়াতে যাই। অমুক বাবু এই সময় নিদারুণ হাঁপানী ও কাশ রোগে ভুগছিলেন। ভদ্রলোক তাঁর ভুক্ত চা'য়ের কাপ ধৌত না করে ঐ কাপের চা আমাকে খেতে দিলেন। আমি লজ্জায় ও সঙ্কোচে আপত্তি করতে পারি নি। এর পর বাড়ী ফিরে এ কথা সকলকে জানালে আমার বড় দিদি ঐ ভদ্রলোককে গাল পাড়তে থাকলেন এবং আমি এই জন্য নিশ্চয়ই অচিরে রোগগ্রস্ত হব বলে তিনি আমার জন্য অত্যন্ত

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এর পরদিন হ'তে আমার সত্য সত্যই একটু একটু কাসি সুরু হলো। ভয়ে কাসতে কাসতে আমি থেকে থেকে হাঁপিয়েও উঠ্‌ছিলাম। পরিশেষে সত্য সত্যই আমি এক প্রকার কাস রোগে আক্রান্ত হই। পরিশেষে চিকিৎসকের বিপরীত বাক্‌-প্রয়োগের দ্বারা উৎসাহিত হ'য়ে গুরু বস্ত্রাবরণ হতে দেহকে মুক্ত করে আমি খালি গায়ে যত্রতত্র বেড়াতে সুরু করি এবং এইরূপে বেপরোয়া ভাবে ঘুরাফিরা করে কিছুদিন পর আমি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়ে উঠি।"

এইরূপ বিপদ আমার জীবনে এই প্রথম নয়। অপর একদিনের ঘটনা আপনাদের বলবো। কোনও এক ভদ্রলোক তাঁর তরুণী স্ত্রীর নামে উৎসাহিত করে আমাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণে রাজী করান। বহুক্ষণ ভদ্রলোকের বাটীতে বসে থাকার পর তাঁর শীর্ণকায়া স্ত্রী খাদ্যসম্ভার এনে আমাকে আপ্যায়িত করতে থাকেন। আমি একটি ব্যঞ্জন পাত্র মুখে তুলে তা গলাধঃকরণ করছিলাম। এমন সময় ভদ্রলোক বললেন যে উনি বেশী কিছু রাঁধতে পারেন নি। কিছুদিন হলো, ওঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ যাচ্ছে। এর কারণ এই যে তিনি গ্যালপিঙ্‌ থাইসিসে ভুগছিলেন ইত্যাদি। আমার হাতের গ্রাস হাতেই রয়ে গেল, মুখ হ'তে কোনও বাকস্ফুরণও হচ্ছিল না। এর পর দিন ভয়ে আতঙ্কে আমি সত্যসত্যই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।"

এই সম্বন্ধে অপর একটী ঘটনার উল্লেখ করবো। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টী বুঝা যাবে।

"প্রায় দুই বৎসর বেকার জীবনের পর অমুক বাবু একটী চাকুরী যোগাড় করলে আমরা তাকে একটী ভোজ দেবার জন্য অতিষ্ঠ করে তুললাম। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে আমাদের অগোচরে একটী হনুমান মেরে উহার মাংস রেঁধে আমাদের খাওয়ালেন। এই বিষয়ে যাঁরা

জ্ঞাত হন নি তাঁদের পরদিন সুন্দররূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যাঁরা বিষয়টী জ্ঞাত হলেন তাঁরা সকলেই এইজন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।”

যক্ বা যকের ধনের কাহিনী আমরা শুনেছি। অধুনা কালে উহা রূপকথার সামিল। কিন্তু কেহ কেহ বলে থাকেন যে একদিন এই প্রথা সত্য ছিল। কোনও কোনও এদেশীয় ব্যক্তির পুনর্জন্মের বিশ্বাস হ'তে এই প্রথা পরিকল্পিত হয়েছিল। ইহা এক প্রকার কুসংস্কারজাত হত্যা-কাণ্ড। মাত্র কৃপণ ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা এইরূপ হত্যাকাণ্ড পুরাকালে সাধিত হয়েছে। এই হত্যার নায়কগণ আজীবন ধন সম্পত্তি আহরণ করেছিলেন কিন্তু উহা ভোগ করার সময় পান নি। মৃত্যুর প্রাক্কালে ধনী বৃদ্ধেরা গোপনে মাটির তলায় একটী কক্ষে তাঁদের সমুদয় ধনদৌলত ন্যস্ত করে রাখতেন এবং তারপর পূজার্চ্চনাদির পর একটী বালককে ঐ ঘরে ভুলিয়ে এনে তাকে সেখানে ঐ ধনদৌলত আগলাবার জন্য রেখে হত্যাকারী সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ঐ ঘরের একমাত্র নির্গমন পথ ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দিয়ে বলতেন, “ওহে বালক! আজ হ'তে ‘যক’ হয়ে তুমি আমার এই কষ্টোপার্জ্জিত ধনদৌলত রক্ষা করবে। আমার মৃত্যুর পর আমি ফিরে এলে অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করলে ঐ রত্নাদি আমাকে কিংবা আমার বংশের কোনও উত্তরাধিকারীকে তুমি ইহা প্রদান করবে। বলা বাহুল্য, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে ঐ ঘনান্ধকার কক্ষে ঐ বালক অচিরে মৃত্যুবরণ করে নিতো।

ভূগর্ভ হ'তে এমন দুই একটী কক্ষ অধুনা কালে আবিষ্কার করা হয়েছে এবং এই কক্ষে একটী মনুষ্য কঙ্কালের নিকট ঘড়ায় বা বাক্সে রক্ষিত বহু ধনদৌলতও পাওয়া গিয়েছে। এইরূপ আবিষ্কার হ'তে ঐরূপ প্রথা একদিন প্রচলিত ছিল বলে কেহ কেহ বিশ্বাস করেন।

বহু প্রকার রোগ যেমন মনোবিকারের এবং বিশ্বাসের কারণে উপগত হয়, তেমনি বাক্-প্রয়োগ এবং মানসিক কারণে বহু রোগের উপশমও ঘটেছে। নিম্নে এই সম্বন্ধে দুইটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী উদ্ধৃত করা হলো। কাহিনী দুইটী কতদূর সত্য তা আমি জানি না। কিন্তু উহার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে তাতে আমি নিঃসন্দেহ।

"কোনও এক যুবতী নারীর মাত্র হাত দুটী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চেষ্টা সত্বেও ঐ নারী তার হাত দুটী কদাচ উঠাতে পারে নি। চিকিৎসার জন্য বহুদিন যাবৎ তাকে হাসপাতালে রাখা হয়, কিন্তু এই রোগ হতে সে কিছুতেই নিরাময় হয় না। এই দিন তাকে দাঁড় করিয়ে এক প্রবীণ চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করছিলেন। এমন সময় একজন অপরিচিত যুবক ডাক্তার সহসা তাকে আলিঙ্গন করে তার ওষ্ঠে একটী চুম্বন অঙ্কিত করে দিল। এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে ঐ যুবতী স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সহসা সে এই প্রথম ডান হাত তুলে ঐ যুবকের গালে সজোরে এক চপেটাঘাত করে দিলে। উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে দেখলে ঐ নারীর বহুদিনের দুরারোগ্য ব্যাধি একদিনেই নিরাময় হয়েছে। তার দুটি হাতই সহসা কার্য্যক্ষম হয়ে উঠ্‌তে দেখে ঐ নারী নিজেও কম আশ্চর্য্য হয় নি। এর পর অবশ্য ঐ যুবক ডাক্তারের সহিতই ঐ সুন্দরী যুবতীর বিবাহ হয়ে যায়।"

উপরের কাহিনী হ'তে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের অধিকাংশ রোগই থাকে মনের। উদরের, মস্তিষ্কের, চক্ষের, কর্ণের এবং হৃদপিণ্ডের রোগ সম্বন্ধে ইহা অতীব সত্য। তবে এর সত্যতা সম্বন্ধে পৃথিবীর নানা দেশের মনীষিগণ দ্বারা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনও হইতেছে।

"কোনও এক ব্যক্তির একদা মনের বিচ্ছিন্নতার কারণে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গিয়েছিল। তার জীবনের পূর্ব্ব দিনগুলির কথা

তার কিছুতেই মনে পড়তো না। এই ভাবে দশ বৎসর অতিবাহিত হবার পর সহসা এক বাল্য বন্ধুর সহিত দেখা হবা মাত্র সে 'হ্যালো জন্' বলে চিৎকার করে উঠে এবং তার বাপ মা ভাই বোন, জন্মস্থান প্রভৃতির কথা তার মনে পড়ে যায় এবং এই ভাবে সে তার পূর্ব্ব জীবন পুনরায় ফিরে পায়।"

"কোন এক ইতালীয় যুবক যুবতী গভীর ভাবে প্রণয়াসক্ত হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। পাঁচ-ছয় বৎসর তাদের জীবন-তরী অতীব সুখে বহে চলেছে, কিন্তু পরে একদিন এদের জীবন দরিয়ায় ভাঙন ধরে। এই সময় হ'তে ঐ যুবক আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ যুবতীকে বরদাস্ত করতে পারছিল না। পরিশেষে সে একদিন তার স্ত্রীকে সাফ্ বলে বসলো, 'দেখো আমি যখন তোমাকে আর ভালোবাসতে পারছি না, তখন আমাদের দু জনার পক্ষে আপোষে বিবাহ-বিচ্ছেদ গ্রহণ করা ভালো।' যুবতী স্ত্রী তার চোখের জল ফেলে তার প্রিয়তম স্বামীকে উত্তর দিয়েছিল, 'বেশ তা'হলে তা'ই হোক। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ তুমি রেখো। এখন তুমি যাকে ইচ্ছে বিবাহ করতে পারো। কেবল মাত্র তুমি আমার কনিষ্ঠা ভগিনী নিসাকে বাদ দিও। নৃত্যশিল্পী নিসা এক মাস পূর্ব্বে আমেরিকা হ'তে প্যারিসে ফিরে এসেছে। এক্ষণে সে ঐ সহরের অতো নম্বর, অমুক রাস্তায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বাস করছে। তাকে যদি তুমি বিয়ে করো তা'হলে আমাকে তুমি মর্ম্মান্তিক রূপ আঘাত দেবে।' বিবাহ বিচ্ছেদের পর এইরূপ এক সাজেস্‌ন ভূতপূর্ব্ব স্বামীর মনের মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়ে ঐ নারী ঐদিনই সকলের অজ্ঞাতে প্লেনে করে প্যারী নগরীতে উপনীত হয়ে ঐ শহরের এক বিখ্যাত 'মেক্‌আপ্ ম্যানের' সাহায্যে নূতন রূপ নিয়ে 'নিসা নাম নিয়ে পূর্ব্ব কথিত ফ্ল্যাটটী ভাড়া নিয়ে বসবাস সুরু

করে দিলে। এই দিকে যতই দিন যায় ততই ঐ সাজেসন্ ঐ যুবকের মনে কার্য্যকরী হ'তে থাকে এবং তার জিদ হয় যে সে ঐ মিস্ নিসাকেই বিবাহ করবে। এর পর সে প্রথম জাহাজেই রওনা হয়ে প্যারী নগরীতে এক হোটেলে এসে উঠলো। এর কয়েকদিন পরে সে এক নূতন বন্ধুর সাহায্যে 'নিসা' নামধারী তার পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিতই আলাপ জমাতে স্থরু করলো। কিন্তু সাজেসনের গুণ এমনিই যে সে তাকে চিনেও চিনতে পারলো না। কথোপকথনের মধ্যে তার পূর্ব্ব স্ত্রীর নাম যে না উঠতো, তা'ও নয়। এইরূপ অবস্থায় মিস্ নিসা অভিমান করে বলে উঠতো, সত্যি দিদিটার ওপর আমার বড় রাগ হয়। নিশ্চয়ই সব দোষ তারই। কক্ষনো আপনার কোনও দোষ ছিল না এই ব্যাপারে। আপনার মত এমন সুন্দর মানুষকে কি'না সে পেয়েও হারিয়ে ফেললে। এর পর একদিন তাদের উভয়ের বিবাহও পাকাপাকি হয়ে উঠলো। এর পর এইরূপ আলোচনার মধ্যে একদিন পুনরায় তাদের বিবাহও হয়ে গেল। বিবাহের পরদিনই অবশ্য ঐ যুবক জানতে পেরেছিল যে সে তার পূর্ব্ব স্ত্রীকেই ঐ রাত্রে বিবাহ করে বসেছে। এর পর হ'তে ঐ যুবককে প্রতি রাত্রেই তার এই দুইবার বিয়ে করা স্ত্রীর নিকট এই জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাইতে হতো।"

[কেহ কেহ বলেন যে কোনও এক স্থানে অপ্রত্যাশিত ভাবে কেহ যদি কাকেও দেখে, তা'হলে তাকে সে সহজে না চিনলেও চিনতে পারে। ধরুন, আপনি রুশ দেশে বেড়াতে গিয়েছেন। সেইখানে সহসা যদি আপনার পিতার সঙ্গে দেখা হয় তো আপনার মনে হবে যে উহা এক অসম্ভব ঘটনা। ঐ স্থানে যদি সত্য সত্যই আপনার পিতার সহিত দেখা হয় তা'হ'লে আপনার ধারণা হবে যে লোকটার চেহারা আপনার পিতার মত। কিন্তু তা সত্বেও আপনার মনে হবে তিনি আপনার পিতা কখনই নন।]

ধর্ম্মীয়ও মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক হত্যার কথা বলা হলো। এইবার আমি যৌনজ হত্যার কথা বলবো। নারীঘটিত হত্যাকে যৌনজ হত্যা বলা হয়ে থাকে। এইরূপ হত্যাকে আক্রোশ জনিত হত্যাও বলা হয়। উপপতির সহিত মিলিত হবার জন্যে বহু স্ত্রী আপন আপন পতি এবং পুত্রকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় নি। উগ্র যৌন-বোধ বহুক্ষেত্রে মানবী বা মানবকে দানবী বা দানবে পরিণত করেছে। অপর দিকে স্বামী বা পরিজনরাও কুলটা নারী কিংবা তাদের প্রেমাস্পদকে গোপনে ইহধাম হ'তে সরিয়ে দিয়েছে। ক্রোধে দিশেহারা হওয়ার কারণে বহু ক্ষেত্রে এইরূপ হত্যা প্রকাশ্যেই সাধিত হয়েছে। সাধারণ ভাবে উগ্র বা মন্থর বিষ প্রয়োগ দ্বারা এইরূপ হত্যা সমাধা হয়ে থাকে। ভৃত্যগণ মনিব-কন্যাদের সহিত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে ধরা পড়লে নিয়োগকর্ত্তাগণ বহু ক্ষেত্রে তাদের ছাদ হ'তে ঠেলে ফেলে দিয়ে পুলিশের নিকট এজাহার দিয়েছে যে কাপড় শুকোতে দেবার সময় অসাবধানতাবশতঃ লোকটা নিচে পড়ে গিয়েছে। কখনও কখনও এদের অস্ত্রাঘাতে হত্যা করেও মৃতদেহ মোটরে তুলে কোনও এক নির্জ্জন স্থানে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

নারীগণ এই যৌনজ হত্যা অধিক ক্ষেত্রে বিষ প্রয়োগ এবং পুরুষগণ অস্ত্রাঘাত দ্বারা সমাধা করে থাকে। সকল সময় যে এই কার্য্য ইহারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ ভাবে করে তা'ও নয়। বহু ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে অপর কোনও ব্যক্তির দ্বারা এইরূপ হত্যা কার্য্য সাধিত করা হয়। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এইরূপ হত্যার পর পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে নিপ্প্রয়োজনে সামান্য কিছু দ্রব্যাদিও গৃহ হ'তে অপহরণ করা হয়েছে, যাতে করে ঘর-দোরের অবস্থা এবং ভগ্নকৃত বাক্স বা আলমারি পরিদর্শনে পুলিশের ধারণা হবে যে এই হত্যা কোনও তস্কর দ্বারা সাধিত হয়েছে।

নিরাক্রোশ খুন

দ্রব্যাদি অপহরণের সুবিধার জন্য কিংবা দ্রব্য অপসরণ কালে আত্মরক্ষার্থে নিরাক্রোশ হত্যা সাধিত হয়। এই হত্যা সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়—এই উভয়বিধ উপায়ে সংঘটিত হয়েছে।

নিরাক্রোশ হত্যার কারণে অপরাধিগণ তিনটী বিশেষ স্থান বেছে নিয়ে থাকে, যথা—বেশ্যালয়, গৃহস্থ ভবন এবং রাজপথ বা প্রান্তর। বেশ্যাগণকে সাধারণতঃ দ্রব্যাপহরণের কারণে দুইটী উপায়ে হত্যা করা হয়ে থাকে, যথা—বিষ প্রয়োগ এবং গলা টিপে মারা। হত্যাকারিগণ উপভোগের অছিলায় দল বেঁধে বেশ্যা নারীর গৃহে মদ্য সহ আগমন করে এবং তাহার ঘরে দুয়ার বন্ধ করে গোপনে বিষ মিশ্রিত মদ ঐ নারীকে পান করায়। বেশ্যা নারী বিষের কারণে অচৈতন্য হওয়া মাত্র উহারা অলঙ্কার এবং অর্থাদি অপহরণ করে দুয়ার খুলে একে একে বা একত্রে তারা পলায়ন করে। অপরাধীদের স্থান ত্যাগের বহু পরে বেশ্যা-বাড়ীর অপরাপর নারীরা এই হত্যা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হয়েছে।

গলা টিপে মারার সময় মাত্র একজন অপরাধী উপস্থিত থাকে। অপরাধী রুদ্ধ দ্বার কক্ষে ঐ নারীর সহিত যৌন সঙ্গম অবস্থায় উহার কণ্ঠনলী টিপে ধরেছে। সঙ্গম অবস্থায় অসহায় থাকার কারণে বেশ্যা নারীগণ আত্মরক্ষা করতে সকল ক্ষেত্রেই অক্ষম হয়েছে।

গৃহস্থ গৃহ হ'তে দ্রব্যাপহরণের সময় ধারালো অস্ত্রাদি দ্বারা অপরাধিগণ হত্যাকার্য্য সমাধা করে থাকে। ডাকাতি এবং খুন এই দেশের এক সাধারণ অপরাধ। পথিমধ্যে পথিকের নিকট অর্থাপ-

হরণের সময় এই একই উপায়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে মুষ্টি ও যষ্টি দ্বারাও এই অপকার্য্য সাধিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বহু স্থান আজও এইজন্য 'ঠেঙাড়ে'র মাঠ নামে পরিচিত হয়ে আছে।

পরিচিত ব্যক্তির নিকট হ'তে অর্থ অপহরণ করার সময় প্রায়শঃ ক্ষেত্রে তাকে অকারণে হত্যা করা হয়েছে। সনাক্তকরণ হ'তে অব্যাহতি পাবার জন্য এইরূপ অকারণ হত্যা সংঘটিত হয়ে থাকে।

অধুনা কালে অর্থাপহরণের উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে এই সকল আগ্নেয়াস্ত্র অবৈধ ভাবে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

পূর্ব্বে চুরি ও ডাকাতি আদি অপরাধ নিম্নশ্রেণীর পেশাদার অপরাধী-দের দ্বারা সাধিত হতো। এই সকল পেশাদারী অপরাধীদের নিজস্ব অপরাধ দর্শন ছিল। এমন কি এরা পাপ, পুণ্য, স্বর্গ বা নরকও বিশ্বাস করেছে। ধর্ম্মাচরণ এবং লোকনকুত হ'তেও এরা মুক্ত ছিল না। এদের মন বহুবিধ সংস্কারে আবদ্ধ থাকৃত। এই কারণে অহেতুক ভাবে খুন-খারাপি এরা কোনও কালেই পছন্দ করে নি। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে বা বিপদে না পড়লে অর্থাপহরণের সময় এরা কাউকে খুন করে নি। এমন কি এজন্য এরা বহুবিধ বিপদও বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু আধুনিক অপরাধীদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। আধুনিক কালে ভদ্র এবং শিক্ষিত মানুষেরা এই সকল অপকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করেছে। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষার কারণে এদের মনে কোনও সংস্কার বা ধর্ম্মভয় নেই। এরা পাপ পুণ্যে অবিশ্বাসী বেপরোয়া দানব মানব মাত্র। অর্থাপহরণের সময় এরা অকারণে নরহত্যা করতে একটু মাত্রও কুণ্ঠা বোধ করে না।

নিষ্ক্রিয় নিরাক্রোশ অপরাধ সাধারণতঃ বিষ প্রয়োগ দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশ বিভুঁই'এ এসে অপরিচিত ব্যক্তিদের

নিকট হ'তে সরবত ও খাদ্যাদি গ্রহণ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা ভালো। অপরাধিগণ পরদেশী লোকদের সহিত সেধে আলাপ জমিয়ে পান বা সরবতে ধুতরার বিষ মিশিয়ে ঐ পান, সরবত বা হালুয়া তাদের খাইয়ে অজ্ঞান করে তাদের দ্রব্যাদি অপহরণ করে থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীতে ভিখারীদের এই ভাবে অচৈতন্য করে দুর্ব্বৃত্তরা তাদের ভিক্ষালব্ধ অর্থাদি অপহরণ করে নিতো। নিম্নে এইরূপ অপরাধের এক চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি আমাদের ঐ নিজ বাড়ীতে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী এবং একটি মাত্র পুত্রের সহিত বসবাস করতাম। মাত্র ১৫ দিন পূর্ব্বে ঐ দুই ব্যক্তি আমাদের বাহির দিককার একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল। পরশ্ব তারিখে তারা আমাদের নিকট একটি টেলিগ্রাম দাখিল করে জানালো যে, তাদের এক ভাইএর এক পুত্র তাদের দেশের বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেছে। এই অজুহাতে আমাদের উঠানে সত্যনারায়ণের পূজা করার জন্য তারা অনুমতি চেয়ে নিলে। এর পর এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তারা আমাদের বাটীর উঠানে পূজা হোম প্রভৃতি সমাপনও করেছিল। রাত্রি তিনটার সময় তারা আমাদের ঘরে এসে কিছু বাতাসা এবং এক ভাঁড় রাবড়ী পূজার প্রসাদরূপে প্রদান করলো। এদিকে আমার শাশুড়ী, আমার স্বামী ও পুত্রের প্রতি স্নেহ পরবশ হ'লেও আমাকে এই সুপেয় রাবড়ী প্রাণধরে খেতে দিতে পারেন নি। কিন্তু উহা তিনি সযত্নে আমার স্বামী, শ্বশুর এবং পুত্রকে খাইয়ে নিজেও উহার কিছুটা গোপনে খেয়ে নিয়েছিলেন। এই রাবড়ীতে ঐ দুর্ব্বৃত্তরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল আমরা বাড়ীশুদ্ধ ঐ রাবড়ী খেয়ে মারা যাবো এবং সেই সুযোগে তারা আমাদের গহনা ও অর্থাদি অপহরণ করে পলায়ন করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি একা ছাড়া

বাকি সকলেই ঐ রাবড়ীর বিষে অজ্ঞান হয়ে পড়ে মারা যায়। কেবল মাত্র আমিই বেঁচে থেকে চিৎকার করতে থাকি। এদিকে পাড়া পড়শী এসে পৌঁছবার পূর্ব্বেই ঐ দুর্ব্বৃত্তগণ অলক্ষ্যে বাড়ী ত্যাগ করে সরে পড়েছে।”

আক্রোশজনিত খুন

যে সকল উপায়ে যৌনজ, রাজনৈতিক এবং নিরাক্রোশ হত্যা সকল সাধিত হয়, আক্রোশজনিত হত্যাও ঐ একই উপায়ে সংঘটিত হয়ে থাকি। তবে নিরাক্রোশ হত্যার ব্যাপারে যেমন মানুষকে ছলে বলে বিভ্রান্ত করে খুন করা যেতে পারে, আক্রোশজনিত খুনের ব্যাপারে তা সকল সময় সম্ভব হয় না। এর কারণ এই যে কোনও মানুষ জেনেশুনে শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনও নির্জ্জন স্থানে যেতে চায় না। তবে নিরাক্রাশ হত্যার মামলায় বহুস্থলে হত্যাকারীরা নিহত ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করে বা ভুলিয়ে কোনও নির্জ্জন স্থানে এনে তাকে হত্যা করেছে। বলপূর্ব্বক অপহরণ করে হত্যা সাধারণতঃ আক্রোশজনিত খুনের ব্যাপারে দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রে হত্যার পূর্ব্বে অপহরণের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, নিহত ব্যক্তিকে কোনও নির্জ্জন স্থানে নিয়ে যাওয়া, যাতে করে এই খুনের ব্যাপারে ঘটনা স্থলে একটী মাত্রও সাক্ষী থাকতে না পারে।

যৌনজ বা অযৌনজ কলহ, ক্রোধ, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির কারণে মানুষ মানুষকে আবহমান কাল হ'তে পৃথিবী হ'তে চিরতরে অপসৃত

করতে প্রয়াস পেয়েছে। পারিবারিক বা সামাজিক কলহ এবং জমি-জমার উত্তরাধিকারী বা দখলী স্বত্ব বা মামলা মকর্দ্দমা প্রভৃতি এইরূপ খুনের অন্যতম কারণ।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশে এক পুরুষের কলহ ও বাদ-বিসংবাদ পরবর্ত্তী পুরুষরাও উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করে থাকে। এক ব্যক্তির স্বর্গগত পিতামহ যদি অপর এক ব্যক্তির স্বর্গগত পিতামহকে খুন করে থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তি তার পিতামহের হত্যাকারীর পৌত্রকে খুন করে তাদের পিতৃপিতামহের ঋণ পরিশোধ করে থাকে। এইরূপ অকারণ হানাহানি এরা বংশপরম্পরায় আজও জিইয়ে রেখেছে, তাই পিতামহ বা পিতার অপমানের প্রতিশোধ এদের পুত্র বা পৌত্ররা নিয়ে থাকে।

এই দেশে আক্রোশজনিত খুন নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় এই উভয়বিধ ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। বিষ প্রয়োগ দ্বারা এইরূপ খুন অপর কোনও ব্যক্তির সাহায্যে করা হয়ে থাকে, কিন্তু সক্রিয় হত্যাকাণ্ড দুর্ব্বৃত্তগণ নিজেরাই করে থাকে। কখনও কখনও লোক মারফৎ উহা যে করা হয় নি, তা'ও নয়। কিরূপ নির্ম্মম উপায়ে এইরূপ হত্যা এই দেশে সংঘটিত হয়েছে, তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।*

"আমি এই হত্যার সাত দিন পূর্ব্বে একটী প্রকাণ্ড বিষাক্ত গোখুরা সাপ জ্যান্ত ধরে একটা বাঁশের চোঙের মধ্যে পুরে রাখি। এই কয়দিন তাকে ক্ষুধার্ত্ত এবং ক্রুদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে একটুকুও কিছু খেতে দিই না। এর পর ঐ রাত্রে আমি তার শয়ন ঘরের জানালা দিয়ে তার বিছানার উপর ঐ সর্পকে ঐ বাঁশের চোঙার সাহায্যে নিক্ষিপ্ত করে দিই। সর্পটী

* পেশাদারী হত্যাকারিগণ প্রায়শঃ ক্ষেত্রে হত্যার পর নিহত ব্যক্তির পায়ের শিরা কর্ত্তন করে।

তৎক্ষণাৎ গুমরতে গুমরতে ঐ ব্যক্তিকে না কামড়ে পার্শ্বে শায়িত তার একমাত্র পুত্রকে কামড়ে নিহত করে। ঐ ব্যক্তি নিমিষে ব্যাপারটী বুঝে নিয়ে একটী লেজা হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমার প্রতি উহা বর্ষণ করে, কিন্তু উহা সৌভাগ্যক্রমে লক্ষভ্রষ্ট হয়ে আমার গাত্রে আর লাগেনি। ইতিমধ্যে ঐ ক্রুদ্ধ সর্প তার স্ত্রীকে এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্রকেও কামড়ে নিহত করে দিয়েছে।"

এদেশে দা'সড়কী, লেজা, ছুরিকা, আগ্নেয়াস্ত্রাদির এবং বিভিন্ন প্রকার বিষের সাহায্যে আক্রোশজনিত হত্যা সকল সংঘটিত হয়ে থাকে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র এবং বিষ সম্বন্ধে আমি এই পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করবো। পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে স্বভাব-দুর্ব্বৃত্তদল শীর্ষক প্রবন্ধে এই হত্যা অপরাধ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা হবে।

বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে হত্যা করার পর উহাকে জলে ডুবিয়ে বা উহার গলায় দড়ী দিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, উহারা আত্মহত্যা করেছে এইরূপ প্রমাণ করা। কখনও কখনও বিষ প্রয়োগে হত্যা করে মৃত দেহের উপর হলুদের রঙ ছিটিয়ে প্রমাণ করার চেষ্ট করা হয় যে, উহার মৃত্যু কলেরা রোগে ঘটেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম পরিদর্শন এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা উহা হত্যা বা আত্মহত্যা তা সহজে প্রমাণ করা সম্ভব।

এই দেশে ভ্রূণ হত্যাও একরূপ হত্যা। অবৈধরূপে জাত শিশুদের গলাটিপে বা গলায় দড়ী বেঁধে হত্যা করা হয়ে থাকে, এবং তার পর উহা পুঁটুলি বেঁধে পথে ঘাটে এবং নদীতে গোপনে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। আততায়িগণ হত্যাকাণ্ড সাধিত করার পর মৃতদেহ অন্যত্র পাচার করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব্বকালের জমিদারগণ নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ

উদ্যানের ভিতর রাতারাতি পুঁতে ফেলে মাটির উপর বৃক্ষাদি রোপণ করে দিতেন। এই অবস্থায় বহু ক্ষেত্রে মৃতদেহের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে শিয়ালগণ ঐ সকল মৃতদেহ খুঁড়ে বার করে আততায়ীদের বিপদ ঘটিয়েছে। কোনও কোনও ধনী জমিদার তাদের বিরাট দালান-বাটীর কোন গুপ্ত বা পাতাল-কক্ষে বা খিলানের তলায় ঐ মৃতদেহ ন্যস্ত করে ভিতের খিলান এবং ঐরূপ কক্ষের দুয়ার ইঁট দিয়ে চিরকালের মত গেঁথে দিয়েছে। অধুনাকালে বহু মিলের ম্যানেজার হত্যা করে মৃতদেহ ইঞ্জিনের বয়লারে ফেলে উহা নিমিষে ভস্মীভূত করে ফেলেছে। কেহ কেহ লাস নদীর স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে কিংবা পুকুরের বা জলার পাঁকে উহা পুঁতে ফেলেও পাচার করার চেষ্টা করেছে।

[নর-হত্যার ন্যায় এদেশে অপরের পশু চুরি না করে উহাদের মাত্র বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হয়ে থাকে। নির্জ্জন মাঠে-ঘাটে চরবার সময় খাদ্যের সহিত এইজন্যে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। কোনও কোনও স্থলে বিষ মিশ্রিত সলকা ফুটিয়েও এইরূপ অপকার্য্য সমাধা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ স্বভাবদুর্ব্বৃত্ত জাতীয় ব্যক্তি এবং স্থানীয় চামাররা এই সকল হত্যাকার্য্য করে থাকে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে মৃত পশুর গাত্র হ'তে ব্যবসার জন্য বিনামূল্যে চামড়া আহরণ করা।]

অবৈধ খুন সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার বৈধ খুন সম্বন্ধে বলা যাক। যুদ্ধে বিপক্ষ পক্ষীয়দের নিহত করা এবং রাষ্ট্রীয় নির্দ্দেশানুযায়ী খুনীকে বিচারের পর ফাঁসী দেওয়া প্রভৃতিকে বলা হয় বৈধ হত্যা। পূর্ব্বকালে এদেশে রাজাদেশে অপরাধীদের শূলে দেওয়ার রীতি ছিল। অপরাধীদের প্রত্যূষে এই শূল দণ্ডের উপর বসিয়ে দেওয়া হতো এবং সন্ধ্যার পর ঐ শূল উহাদের গুহ্যদেশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে উহাদের মস্তিষ্ক ফুঁড়ে বার হয়ে আসতো। বিলাত এবং আধুনিক ভারতে ফাঁসীর

দ্বারা এবং ফরাসীদেশে গিলটীন দ্বারা এই সকল বৈধ হত্যা সাধিত করা হয়ে থাকে। পুরাকালে গ্রীসদেশে বিষপাত্র মুখে প্রদান করে বৈধ হত্যা করা হয়েছে। অধুনাকালে কোনও এক দেশে এক অদ্ভুত উপায়ে বৈধ হত্যা করা হয়ে থাকে। সরকারের বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ বা আচরণ করার জন্য শত শত ব্যক্তিকে একত্রে এই দেশে নিহত করা হয়ে থাকে। একজন একজন করে এতগুলি ব্যক্তিকে নিহত করা সময় সাপেক্ষ। এই কারণে কয়েক শত ব্যক্তিকে একত্রে একটী এয়ারটাইট বৃহৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বাহির হ'তে ইলেকট্রিক পাম্পের সাহায্যে ঐ ঘর হ'তে সমুদয় বাতাস নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়। এইরূপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শত শত ব্যক্তি একত্রে প্রাণত্যাগ করে থাকে। ইয়ুরোপীয় অপর কয়েকটী প্রদেশে ইলেকট্রীক কারেণ্ট প্রয়োগ করে বৈধ হত্যা সাধিত করা হয়েছে। পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে 'বৈধ শাস্তি প্রদান' শীর্ষক অধ্যায়ে এই সকল হত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

অপরাপর অপরাধ

কাহাকেও গালিগালাজ করা, কাহারও প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করা, কাহারও মনে দুঃখ দেওয়া, কাহাকেও উত্যক্ত করা, কাহারও প্রতি অসদ্ব্যবহার করা প্রভৃতি কার্যকেও আমি অপরাধ বলবো। ঐ সকল অপরাধের গুরুত্ব সামান্য হ'লেও উহা অপরাধ। সাধারণতঃ মানুষ তাদের আশ্রিত ব্যক্তি এবং দুর্ব্বল ও দরিদ্র পাড়া প্রতিবেশী-দিগের উপর এই সকল অপরাধ সংঘটিত করেছে। এতদ্ব্যতীত অকারণে

কাহারও সম্মানহানি ঘটানও এই শ্রেণীর অপরাধ। লোক মুখে বা ছাপাখানার সাহায্যে মানুষ মানুষের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কুৎসা রটনা করে থাকে। এমন বহু পরিবার আছে যেখানে কোনও আশ্রিত বালক বা যুবককে নিষ্কর্ম্মা বা নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করবার জন্য অবিরত তার সম্বন্ধে নানারূপ অপবাক্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। পরিশেষে ঐরূপ এক ব্যক্তিকে অনুসরণ করে ঐ বাটীর বা পরিবারের সকল ব্যক্তিই তাহার উপর ঐ প্রকার বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে সুরু করে। এইভাবে যারা স্বামীকে তার স্ত্রীর, ভাইকে অপর ভাইয়ের, পড়শীকে অপর পড়শীর সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হন, তাঁরা স্বাভাবিক ভাবে মানুষ না মারলেও তার মনুষ্যত্বের বিনাশ ঘটিয়ে থাকেন। আমি এমন বহু বালককে জানি, যাদের পাড়াশুদ্ধ লোক 'পাগল পাগল' বলে সত্য সত্যই তাকে পাগলে পরিণত করে দিয়েছে। প্রতিভাশালী বালকদের ব্যবহার ও কার্য্যকরণ একটু স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। এইজন্য তাহাকে নির্ব্বোধ সহপাঠীদের দ্বারাই অধিক উত্ত্যক্ত হ'তে হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় তাহার প্রতিভা অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে অভিভাবকদের উচিত তাকে স্কুল হ'তে ছাড়িয়ে এনে কয়েক বছরের জন্য বাড়ীতে পড়াশুনা করার বন্দোবস্ত করে দেওয়া। বহু স্থলে প্রবীণ ব্যক্তিগণ অপর কোনও প্রবীণ ব্যক্তিকে উত্ত্যক্ত করার জন্য অপরিণত বয়স্ক বালকদের তার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছেন। কিরূপ পদ্ধতিতে এই সকল অপরাধ সংঘটিত হয় তা নিম্নের বিবৃতি হ'তে বুঝা যাবে।

"আমরা তখন অল্পবয়স্ক বালক। অমুক বাবু এই সময় আমাদের পাড়ার 'লাটুলাল চক্রবর্ত্তী' মহাশয়ের পিছনে আমাদের লাগিয়ে দিলেন। অমুক বাবুর শিক্ষামত আমরা ঐ ভদ্রলোককে পথে দেখামাত্র নিম্নোক্ত রূপ ছড়াটী আবৃত্তি করতে সুরু করে দিতাম।

'এক ছিল লাটু, তাতে পরাই লাল, হলো লাটুলাল। তাতে জড়াই লেত্তি, হলো লাটুলাল চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি।"

এতদ্ব্যতীত ছুটে গিয়ে কোনও পথচারীর মাথায় চাঁটি কসিয়ে ছুটে পালিয়ে আসা, গুরুমহাশয়ের মস্তকের শিখা কেটে নেওয়া বা তাঁর পিছনে এসে পায়রা ছেড়ে দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যও আমরা তাঁর ইঙ্গিত মত কতোবার করেছি। একদিন পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকট হ'তে মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরলাম। এমন সময় পথিমধ্যে অমুক বাবুর সঙ্গে দেখা হলো। অমুক বাবু সকল কথা শুনে আমাকে শিখিয়ে দিলেন, 'দেখ, এক কাজ করবি। কাল সকালে ঐ গুরুর বসবার চেয়ারের চারপায়ার তলায় চারটী সুপারী রেখে দিস। তার পর দেখিস তোদের ঐ গুরুর কিরূপ অবস্থা ঘটে।"

বলা বাহুল্য যে, এইভাবে ছোট ছোট বালকদের দুষ্টামী শিক্ষা দেওয়া এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এই প্রকার দাদার বা কাকার দল হ'তে বালকদের রক্ষা করার জন্য অভিভাবকদের উচিত এই সকল কাকা ও দাদাদের চিনে রাখা।

মাতাল হয়ে মাতলামী করাও একটি বিশেষ অপরাধ। মাতাল বহু প্রকারের আছে, যথা—মদো-মাতাল, স্ত্রীর প্রেমে মাতাল, হরিপ্রেমে মাতাল ইত্যাদি। কোনও এক ব্যক্তির দ্রব্য বা বিষয়ের প্রতি অত্যাধিক আকর্ষণ এবং তৎজনিত উহার বহিঃঅভিব্যক্তিকে বলা হয় মাতলামী। প্রথমে মদো-মাতালদের সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই সকল মাতালরা কেহ কেহ মদ্যপানজনিত বিসদৃশ ব্যবহার করে, কেহ কেহ মদের ঝোঁকে উচ্চাঙ্গের বুলি আউড়িয়ে থাকে। কোনও এক নাম করা সাহিত্যিক মাতাল ভদ্রলোক মত্ততা'র অবস্থায় আমাকে দেখা মাত্র বন্ধুবান্ধবদের সহিত আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'উঁহু উঁহু (ক্রন্দনের স্বরে)। ইনি হচ্ছেন

একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ইনি নিজে মদ না খেলেও মাতালকে শ্রদ্ধা করেন, ইত্যাদি। এই সকল মাতালদের আচারণও হয় অদ্ভুত। নিম্নের বিবৃতিটী হ'তে উহা বুঝা যাবে।

"বহু বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। কলিকাতা শহরে মাত্র এক সপ্তাহ হলো ঘোড়ার ট্রামের পরিবর্ত্তে ইলেকট্রীক ট্রাম চালু হয়েছে। এই দিন শহরে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল, কিন্তু তা সত্বেও আমি চৌরঙ্গীর হাঁটুভোর জল ভেঙে পথ চলছিলাম। এই সময় জন চার মাতাল যুবক একটা ঘোড়ার গাড়ী করে ধর্ম্মতলায় যাচ্ছিল। সহসা ঘোড়া দুটা বিগড়ে গিয়ে ছুটে পালালো। সহিস কোচোয়ান ঘোড়া দুটো ধরবার জন্য তাদের পিছন পিছন ছুটে চলেছে। এদিকে একজন বৃহৎ শিখা (টিকি) ধারী ব্রাহ্মণকে এই পথে দেখা গেল। শিখাসহ ব্রাহ্মণকে দেখামাত্র মাতাল কয়জন তাঁকে পাকড়াও করে ঘোড়ার গাড়ীর ছাদে তুলে তার শিখাটী ট্রামের উপরকার তারের সঙ্গে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকলো। বোধ হয় তাদের ধারণা হয়েছিল এইভাবে ঘোড়ার গাড়ীটী ঐ শিখার সাহায্যে চালানো সম্ভব হবে। ঐ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আমি অতি কষ্টে তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হই।"

আধুনিক কালেও পথে-ঘাটে মাতালগণ অনুরূপ বহু হাস্যকর কার্য্য করে থাকেন। কোনও এক নাম করা মাতাল-আর্টিষ্ট একদা রাত্রে একটী রিক্সা ভাড়া করে মদের ঝোঁকে বাড়ী ফিরছিলেন। সহসা তার খেয়াল হলো তিনি নিজেই ঐ রিক্সাটী টেনে নিয়ে যাবেন। এর পর তিনি রিক্সা চালকের হাতে একটী টাকা গুঁজে দিয়ে তাকে রিক্সায় বসিয়ে তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে নিজেই রিক্সা টানতে সুরু করে দিলেন। এর পর খেয়ালমত তিনি এক পেট্রোল পাম্পের দোকানে এসে হেঁকে উঠলেন, "এই পাম্পওয়ালা! দেও, পেট্রোল দেও, আভি দেও, নেহি তো, ইত্যাদি।"

অপর একদিন কোনও এক মাতাল-আর্টিষ্ট পুলিশের চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তরে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, "এই খবরদার! হাম আলামগীর হায়।" অপর এক মহিলা মাতাল-আর্টিষ্টকে আমি বলতে শুনেছিলাম, "চেনো না'কি মোরে? শোন নাই মোর নাম? অমুক অমুক যার দোরে রহিত দাঁড়ায়ে। আমি রিজিয়া সেজেছি। আমি আদেশ করিয়াছি। আদেশ কখনও শুনি নাই।" এই সম্বন্ধে নিয়ে অপর একটী চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"এই দিন আমি আমার ছয় ফুট লম্বা দেহের উপর পুরু বনাতের পুলিশ-অলেষ্টার চাপিয়ে একটী গ্যাসপোষ্টের ধারে রাত্রি দুইটার সময় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সহসা আমি উপলব্ধি করলাম যে, ফোঁটা ফোঁটা জল আমার হাতে এসে পড়ছে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে উপর হতে বৃষ্টি পড়েছে বুঝি? কিন্তু আকাশের প্রতি চেয়ে দেখলাম যে বৃষ্টি তো নয়। হয়তো দুতলার জানালা বা ছাদ থেকে কেউ জল ফেলছে! কিন্তু সেদিকেও কাউকে না দেখে নিয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখি এক মাতাল আমার ওভার-কোটের পিছনে মূত্র ত্যাগ করছে। ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তাকে বলে উঠলাম, 'বেটা বেল্লিক।' আমার কথার প্রত্যুত্তরে মাতাল লোকটী অবাক হয়ে বলেছিল, "কে বাবা? তুমি মানুষ? আমি তোমাকে মনে করেছিলাম যে তুমি একটি গ্যাসপোষ্ট।"

কোনও এক মাতালকে বেশ্যা পল্লীতে প্রাপ্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মাতলামীর আর জায়গা পাওনি?" প্রত্যুত্তরে মাতাল ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, "এখানে মাতলামী করবো না তো কোথায় করবো? কালীবাড়ীতে? মঠে না মন্দিরে?" এই সকল উক্তি হ'তে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি মদ্যপানজনিত অকারণে নিজেদের যে হারিয়ে ফেলে থাকে তা প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত এমন বহু মাতাল আছে

যারা উন্মত্ত হয়ে স্ত্রীকে মারধর এবং আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়াপড়শীদের গালিগালাজ করে থাকে।

মাতালদের মধ্যে মাতলামী যতটা থাকে, তার চেয়ে থাকে ন্যূনাধিক বদমায়েসী। এদের অনেকের কাছে অধিক মাতাল হওয়া একটু বাহাদুরীর বিষয়। মাতলামীর অন্তরালে ইচ্ছা করে তারা শ্লীলতাহানি প্রভৃতি অপকার্য্যেরও প্রশ্রয় দিয়েছে।

পশুপক্ষী জীবজন্তুকে অযথা কষ্ট দেওয়া বা তাদের অকারণে মারধর করা এবং তাদের পুষে খেতে না দেওয়া বা সহসা হত্যা না করে তাদের কষ্ট দিয়ে হত্যা করা বা অধিক ভার কোনও পশুকে টানতে বা বহন করতে বাধ্য করা কিম্বা রুগ্ন ক্ষতগ্রস্ত পশুকে খাটানো একপ্রকার অপরাধ। এইরূপ অপরাধের জন্য পশু-ক্লেশ-নিবারণী আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এই সকল অপরাধের মধ্যে 'ফুকা' এক অন্যতম জঘন্য অপরাধ। অসাধু গোয়ালারা অধিক দুগ্ধ প্রাপ্তির লোভে এই অপ-পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী অপরাধীরা শক্ত খড়ের দড়ি পাকিয়ে উহা গাভীর গুহ্যদেশের মধ্য দিয়ে উদর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। কখনও কখনও গো-মহিষাদির নিজেদের লেজই ঐ ভাবে তাদের গুহ্যদেশে জোর করে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইরূপে নির্গত অর্দ্ধ তৈরী দুগ্ধ মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও অতীব ক্ষতিকর। গো-মহিষাদি বিক্রয়ের সময়ও ইহারা নানা প্রকার অপ-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে কয়দিন যাবৎ গাভীদিগকে বাঁশের চোঙের সাহায্যে জোর করে অত্যধিক লবণ জল পান করানো হয়ে থাকে। এতদ্বারা উহারা অধিক পরিমাণে জোলো দুধ সাময়িকভাবে প্রদান করে। এই-ভাবে খরিদ্দারদের দেখানো হয়ে থাকে যে ঐ গাভী বহু সের দুগ্ধ প্রদান

করছে, কিন্তু দুইদিন পরই দেখা যায় যে ঐ গাভী উহার অর্দ্ধেক দুগ্ধও প্রদান করতে সক্ষম নয়।

দোল প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে এদেশে বহু অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কাহারও অনিচ্ছা সত্বেও তাহার বস্ত্রাদি রঙে রঞ্জিত করে দেওয়া অতীব অন্যায়। বস্ত্রের দুর্মূল্যের দিনে এই অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কখনও পথে-ঘাটে অপরিচিতা যুবতীদেরও জোর করে রঙ দেওয়া হয়ে থাকে। এই সময় স্বামী ও ভ্রাতারা সঙ্গে থাকা সত্বেও দুর্ব্বৃত্তদের হস্ত হ'তে তাদের রক্ষা করতে পারে নি। ইহা এদেশীয়দের পক্ষে এক কলঙ্কের কথা। এইরূপ এক মামলায় একদা আমি বিশজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবককে শ্লীলতা হানি করার অপরাধে গ্রেপ্তার করে থানায় এনে ছিলাম। ইতিমধ্যে উহাদের পদমর্য্যাদা সম্পন্ন বিত্তশালী অভিভাবকরা এই থানায় এসে অনুযোগ করে বললেন, "দেখুন, পূর্ব্বের দিন! ধর্ম্মের ব্যাপার! এতে আপনারা হস্তক্ষেপ করছেন।" উত্তরে আমি তাঁদের এইরূপ বলেছিলাম, "এ্যাঁ? তাই না'কি? বেশ তা'হলে আমি দুইজন জমাদার এবং থানার আটজন সিপাইকে আপনার সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এরাও সকলে হিন্দু। পরবে একটু রঙ খেলতে চায়। এদের আপনাদের বাড়ীতে দয়া করে নিয়ে যাবেন। আপনার স্ত্রী, বৌদি, কাকিমা এবং বোনদের মুখে এরা রঙ মাখিয়ে আসবে; ঠিক যেমন করে আপনাদের ছেলেরা ঐ অপরিচিতা ভদ্রললনাদের মুখে বাহুতে এবং পিঠে রঙ ও আবীর মাখিয়ে এসেছে।" কখনও কখনও এই সময় গুড়ের কলসীতে গোবর জল বা বিষ্ঠা রেখে তা নিরক্ষর কুলিদের মাথায় দিয়ে দুর্ব্বৃত্তগণ তাদের পিছু পিছু কিছুটা দূর অগ্রসর হয়েছে, এবং তারপর সুযোগ ও সুবিধামত লৌহ-দণ্ড দিয়ে ঐ কলসী পিছন হ'তে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কখনও কখনও এরা ডাক্তারদের 'কল' দিয়ে খালি বাড়ীতে ডেকে এনে তার কোট ও

প্যান্ট্‌লেন বাঁদুরে রঙে জোর করে চুবিয়ে দিয়েছে। এই সকল পরবের সময় দেশবালী লোকেরা চিৎকার করে খোল করতাল বাজিয়ে বহু রুগ্ন ব্যক্তিদেরও শান্তি ভঙ্গ করে। জন্মাষ্টমী পর্ব্ব উপলক্ষে এইরূপ গান, বাজনা ও নৃত্যের বহর দেখে কোনও এক য়ুরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ ভদ্রলোক বলেছিলেন, "এইবার বুঝতে পারছি। আপনাদের কৃষ্টো জন্মের পরই পালিয়ে ছিলেন কেন? বোধহয় এইরূপ জন্মোৎসবের দায় এড়ানোর জন্যই তাকে সরানো হয়েছিল তা না হ'লে এতটুকু শিশু দম আটকে (সাফোকেটেড্‌ হয়ে) এমনিই মারা পড়তো ইত্যাদি।"

শিশুদের ভূতের বা জুজুর ভয় দেখিয়ে ছোটবেলা হ'তে ভয়াতুর করে তোলা এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। অনুরূপ ভাবে শিশুদের জল-বায়ুতে এক্সপোসড (প্রদর্শন) করে ভিক্ষা করা এক প্রকার অপরাধ। অনুরূপ ভাবে অপরিণত বালক-বালিকাকে রাজনৈতিক শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য দল বিশেষকে ভাড়া দেওয়াও এক প্রকার অপরাধ। পুত্র কন্যাকে জন্মদান করে তাদের মানুষ না করা বা তাদের জন্য সংস্থান না করা বা তাদের অবহেলা করা প্রভৃতিও এক একটি অপরাধ। বালক-বালিকাদের দুর্ব্বুদ্ধি প্রদান করাও এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বিষয়টী বুঝা যাবে।

"আমি তখন নিতান্ত বালক। স্বগ্রামে গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়াশুনা করি। গুরুমশাই প্রায়ই দুটি বেত আমাদের উপর প্রয়োগ করতেন। একটির নাম ছিল 'হেঁড়ে-গলা' এবং অপরটির নাম ছিল 'রক্ত-চিন-চিনি'। গুরুমশাই প্রায়ই আমাদের দ্বারা তাঁর গা চুলকাইয়া নিতেন এবং আমাদের দ্বারা তামাকও সাজাইয়া নিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আমাদের পড়তে বলে নিজে ঘুমিয়ে পড়তেন। আমি এইগুলি কখনও

পছন্দ করতাম না। এই কারণে একদিন আমার উপর হেঁড়ে-গলার সদ্ব্যবহার হয়েছিল। আমি আমার এক যুবক মামার পরামর্শে প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করলাম। ভোর চারটার সময় উঠে চারিজন সহপাঠীর সহিত ঝুড়ি ও কোদাল সহ অলক্ষ্যে পাঠশালা ঘরে আমি উপস্থিত হলাম, এবং ইহার পর ঘরের যে খুঁটীটাতে হেলান দিয়ে টুলে বসে গুরুমশাই ঘুমিয়ে পড়তেন সেই খুঁটীর সম্মুখে চারি হস্ত পরিমিত গভীর চারচৌকা একটি গর্ত্ত আমরা খুঁড়ে ফেললাম। ইহার পর এই গর্ত্তের উপর পঁ্যাকাটি রেখে উহার উপর মাটী চাপা দিয়ে গোবর লেপে দিলাম। এই জন্য উহা স্বাভাবিক মাটির মেঝে রূপে প্রতীত হতে থাকে। এর পর গুরুমশায়ের টুলটি ঐ পঁ্যাকাটির ছাদের উপর রেখে আমি বেমালুম সরে পড়েছিলাম। এইদিন অপরাপর ছাত্রগণ পাঠশালায় এসে পৌঁছবার পূর্ব্বেই আমি ঐখানে এসে এক কলকে গণ-গণে আগুন দিয়ে তামাক সেজে গুরুমশাই- এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমার দুইজন সহপাঠী যাতে অন্যান্য বালকেরা ঐ গর্ত্তের মুখে পূর্ব্বাহ্ণেই গিয়ে না পড়ে তার জন্য পাহারা রত ছিল। ইতিমধ্যে গুরুমশাই এসে আমাকে তামাক হাতে প্রস্তুত দেখে খুসী হয়ে বললেন, 'আয় বাপ আমার! তুই তো সেইদিন মার খেয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলি। কিন্তু তুই জানিস না যে আমি বাড়ী ফিরে সারারাত এই জন্যে কেঁদেছি।' এর পর গুরুমশাই হুঁকা কলকে হাতে পিছু হটতে হটতে ঐ নির্দিষ্ট টুলে বসা মাত্র টুল সহ তার পিছনটা পঁ্যাকাটির তৈরী মেঝে ভেঙে ঐ গভীর গর্ত্তের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল এবং তাঁর হাত এবং পা' দুটো মাত্র উপর দিকে জেগে রইল। এদিকে গণ-গণে কলকের আগুন তাঁর দাড়ি এবং বুকের উপর পড়ে উহা পুড়িয়ে সেখানে গোটা চার পাঁচ ফোস্কাও পড়িয়ে

দিয়েছে। এই সময় গুরুমশাই এর করুণ আর্ত্তনাদ ছাপিয়ে আমরা চিৎকার করে নামতা পড়তে সুরু করে দিলাম, এক কড়া পোয়া গণ্ডা, দুই কড়া আধা গণ্ডা, ইত্যাদি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে বাহিরের লোক গুরুমশাইএর চিৎকার শুনে তাঁকে সাহায্য করতে না আসে।"

ছোট ছোট বালক-বালিকাদের অকারণে মারধর করা একপ্রকার অপরাধ। এতদ্বারা তাদের মগজ চমকিয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা এবং স্বাস্থ্যের বিনাশ ঘটে। এই বিষয় অভিভাবক মাত্রেরই অবহিত হওয়া উচিত। পথে-ঘাটে মলমূত্র ত্যাগ এবং থুথু ফেলা অপর একপ্রকার অপরাধ। স্ত্রীলোকরা যদি পথে মলমূত্র ত্যাগ না করে চলাফেরা করতে পারে তাহ'লে পুরুষরাই বা তা পারবে না কেন? এই বিষয়ে স্ত্রীলোকদের ন্যায় সংযমী হ'তে আমি পুরুষমাত্রকেই উপদেশ দিব। মিথ্যা বা ভুল পরিসংখ্যা তৈয়ারী ও প্রদান করা অপর এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এই সকল পরিসংখ্যার উপর ভিত্তি করে সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে উঠে। অথচ এই সকল পরিসংখ্যা জেলা হাকিমদের নামে প্রকাশিত হ'লেও উহা চৌকিদারদের দ্বারা সংগৃহীত হয়ে থাকে।

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।